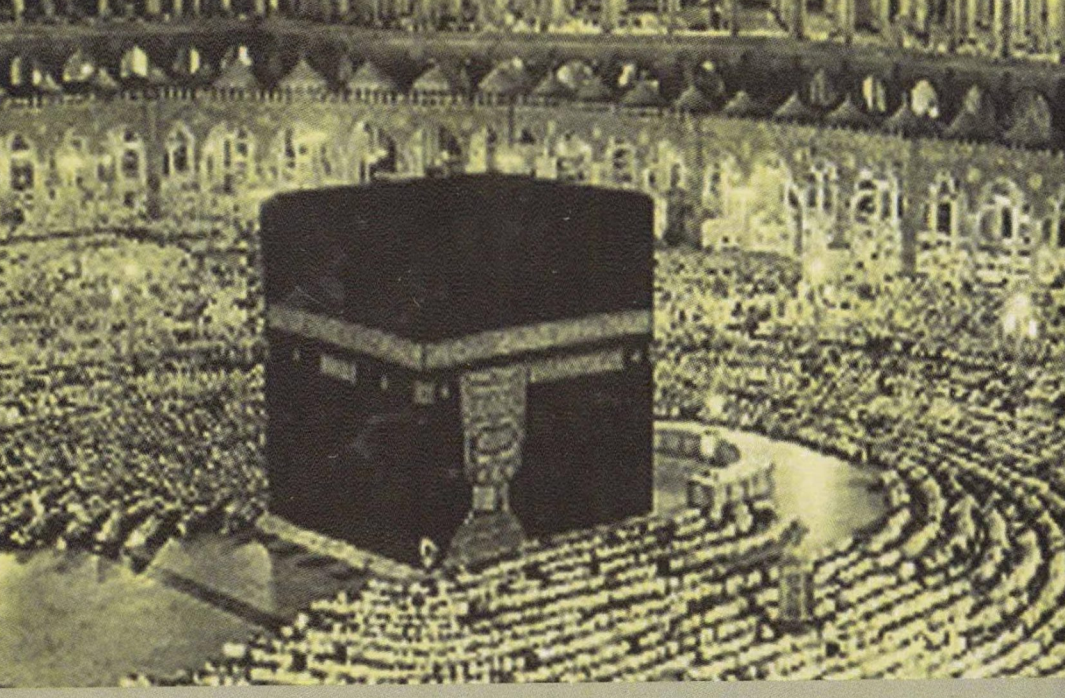

কুরআনের দেশে মাওলানা মওদূদী

মুহাম্মদ আসেম

কুরআনের দেশে মাওলানা মওদূদী

লেখক মুহাম্মদ আসেম

অনুবাদ গোলাম সোবহান সিদ্দিকী

সম্পাদনা আবদুস শহীদ নাসিম

শতাব্দী প্রকাশনী

www.pathagar.com

কুরআনের দেশে মাওলানা মওদূদী

মুহাম্মদ আসেম

সম্পাদনা : আবদুস শহীদ নাসিম

ISBN 984-645-049-1

শ প্র: ৫৭

© Sayyed Abul A'la Maudoodi Research Academy Dhaka

প্রকাশক
শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট, ঢাকা- ১২১৭
ফোন : ৮৩১১২৯২

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল ২০০৬

কম্পোজ ও মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩, বড় মগবাজার, ঢাকা- ১২১৭
ফোন : ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

দাম : ১০০.০০ টাকা মাত্র

QURANER DESHE MAULANA MAUDOODI By Muhammad Asem, Published by Shotabdi Prokashani, 491/1 Moghbazar Wireless Railgate, Dhaka- 1217, Sponsored by Sayyed Abul A'la Maudoodi Research Academy Dhaka, Bangladesh. Phone: 8311292. 1st Edition April 2006.

Price Tk. 100.00 Only

www.pathagar.com

আমাদের কথা

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ.) ১৯৫৯-'৬০ সালে আরব বিশ্ব সফর করেন। সফরের উদ্দেশ্য ছিলো কুরআনে বর্ণিত স্থানসমূহ পরিদর্শন। তাঁর সফরসংগি ছিলেন জনাব মুহাম্মদ আসেম। এটি ছিলো একটি ঐতিহাসিক সফর। জনাব মুহাম্মদ আসেম মাওলানার সফরের পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। এ গ্রন্থটি মাওলানার সেই সফরেরই দলিল। সফর ব্যাপদেশে এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করায় এ গ্রন্থটি চোখে দেখা ও কানে শোনার মতোই জীবন্ত হয়ে ওঠে।

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ.) তাঁর বিশ্ববিখ্যাত তফসীর তাফহীমুল কুরআন রচনাকালে কুরআনে বর্ণিত স্থানসমূহ পরিদর্শন করার এবং সচক্ষে দেখার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। এ সফর ব্যাপদেশে তিনি রসূলে পাক সা.-এর জীবন ও আন্দোলনের সাথে জড়িত স্থানসমূহও পরিদর্শন করেন। এই সফরনামা কুরআনের পাঠকদের জন্যে কুরআন উপলব্ধির একটি কার্যকর পাথেয় হিসেবে ভূমিকা রাখবে।

যারা এ গ্রন্থটি পাঠ করবেন কুরআন পড়ার সময় তারা উপলব্ধি করবেন, তারা যেনো কুরআনে বর্ণিত ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সচোক্ষে দেখছেন। তারা উপলব্ধি করবেন কুরআনের বাহক মুহাম্মদ সা.-এর কুরআন বাস্তবায়ন আন্দোলনের স্থান ও অধ্যায়সমূহ নিজেরাই যেনো অতিক্রম করছেন। এযুগে আরব দেশসমূহে যারা কুরআনী সমাজ গড়ার আন্দোলন করছেন এ গ্রন্থের পাঠকগণ তাদের কর্মনীতি ও কর্মতৎপরতা সম্পর্কেও অবহিত হবেন।

www.pathagar.com

এ গ্রন্থটি পাঠ করার মাধ্যমে আপনি জানতে পারবেন, পঞ্চাশ (১৯৫০)-এর দশকে সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যে বড় বড় আলেম কারা ছিলেন? সেসব দেশে জ্ঞানচর্চার অবস্থা কেমন ছিলো? সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থা কেমন ছিলো? যাতায়াত ব্যবস্থা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং সরকার ও জনগণের মানসিক অবস্থা কেমন ছিলো? আর বর্তমানে সেসব অবস্থার কতোটা পরিবর্তন হয়েছে?

এ গ্রন্থ পাঠে সহজেই জানা যাবে, সেই পঞ্চাশের দশকেই গোটা আরব বিশ্বের ওলামায়ে কিরাম এবং ইসলামী আন্দোলনের লোকদের কাছে মাওলানা মওদূদী কতো বেশি প্রিয় এবং শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন! মূলত তারা মাওলানাকে 'আল উস্তায' মনে করেন।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী এই গ্রন্থ অনুবাদ ও প্রকাশের ব্যবস্থা করতে পারায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। আমরা আশা করি এই গ্রন্থ জ্ঞানান্বেষী পাঠকগণকে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দিবে।

আবদুস শহীদ নাসিম
পরিচালক
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী ঢাকা
তারিখ : সেপ্টেম্বর ১২, ২০০৬

www.pathagar.com

সূচিপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
১.	কেন এ সফর?	১১
২.	লাহোর থেকে করাচি	১৪
	♦ করাচিতে অবস্থান	১৪
৩.	করাচি থেকে বাহরাইন	১৭
	♦ গোয়াদির বন্দর	১৮
	♦ মাস্কাট-দুবাই ও উম্মে সাঈদ	১৯
	♦ বাহরাইন (৮-১০ নভেম্বর ১৯৫৯)	২১
	♦ বাহরাইনের সাধারণ অবস্থা	২৭
৪.	যাহরান-খোবার-দাম্মাম (১০-১৮ নভেম্বর ১৯৫৯)	২৯
	♦ বাহরাইন থেকে খোবার	২৯
	♦ রাস তান্নুরা	৩৩
	♦ বুকাইক	৩৫
	♦ যাহরান	৩৮
	♦ দাম্মাম	৩৯
	♦ গভর্নরের সাথে সাক্ষাত এবং রাজকীয় মেহমানদারী	৪০
	♦ খোবারের বাজার	৪২
	♦ আরামকোর লাইব্রেরি	৪৩
	♦ আরামকো সদর দফতর	৪৩
৫.	রিয়াদ সফর	৪৪
	♦ রিয়াদ (১৯-২৮ নভেম্বর ১৯৫৯)	৪৬
	♦ রিয়াদের শান-শওকত	৪৭
	♦ শেখ আবদুল আযীয ইবনে বায্	৪৯
	♦ প্রাচীন রিয়াদ	৫০
	♦ নাজদীদের আতিথেয়তা	৫১
	♦ শাহ্ সউদের নাসেরিয়া প্রাসাদ	৫২
	♦ পর্দানশীন মহিলাদের বাজার	৫৩
	♦ আরব জাতীয়তাবাদের পরিণাম	৫৩
	♦ শরীয়া কলেজের ছাত্রদের সমাবেশ	৫৪
	♦ প্রধান মুফতির সাথে সাক্ষাত	৫৪
	♦ শেখ উমার ইবনে হাসান	৫৫
	♦ বাদশাহ সউদ বিশ্ববিদ্যালয় এবং রিয়াদের শরীয়া কলেজ	৫৬
	♦ ওস্তাদ আহমদ আল জাসের	৫৭
	♦ আলিমদের সরলতা	৫৭
	♦ আমীর আব্দুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান	৫৮

www.pathagar.com

- ওস্তাদ হামদুল জাসেরের লাইব্রেরি ৫৯
- আমীর মুসায়েদ ইবনে আবদুর রহমান ৬০
- শেখ আবদুল্লাহ ইবনে খামীস ৬১
- দেরইয়া ৬২
- ওয়াদিয়ে হানিফা এবং মুসাইলামা কায্‌যাবের জন্মস্থান ৬২
- দেরইয়ার ঐতিহাসিক নিদর্শন ৬২
- আরব জাতীয়তাবাদের ফিতনা ৬৩
- মূল্যবান বই উপহার ৬৪
- সৌদি সরকারের উদারতা ৬৫
- ফিলবীর সাথে সাক্ষাত ৬৫
- সৌদী আরবের অর্থনৈতিক সমস্যা ৬৭
- আদর্শিক দ্বন্দ্ব ৬৮
- ফিলবীর সাথে আবার সাক্ষাত ৬৯
- আরবি খাবার ৭০
- দাসদাসী ক্রয়-বিক্রয় ৭১
- সরকারি অফিসে নামাযের ব্যবস্থা ৭২
- নাজদের স্থানীয় ভাষা ৭২
- শেখ আবদুল্লাহ আল মিসআরী ৭৩
- বাদশাহ সউদের আতিথেয়তা ৭৩
- রিয়াদে ইখওয়ানের পরিমণ্ডল ৭৩
- রিয়াদ এবং মক্কার মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থা ৭৪
- রিয়াদের সালাফী বন্ধু বান্ধব ৭৫
- জেদ্দার উদ্দেশ্যে রওয়ানা ৭৫
- পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতের টেলিফোন ৭৬

৬. **জেদ্দায়** ৭৭
- জেদ্দায় পৌছা ৭৭
- পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতের ভোজ ৭৭
- মিশরীয় দূতাবাস ৭৮
- শেখ মুহাম্মদ নাসীফ ৭৯
- শেখ মুস্তফা আলম ৮০
- জেদ্দা থেকে মক্কা মুয়ায্‌যামা ৮০
- পথে ঐতিহাসিক নিদর্শন ৮১

৭. **মক্কা মুয়ায্‌যামা (৩০ নভেম্বর-৪ ডিসেম্বর ১৯৫৯)** ৮২
- মসজিদুল হারামের খতীবের সাক্ষাত ৮২
- ওমরা ৮৩
- হারাম শরীফে নামায ৮৩
- পাকিস্তানি হাসপাতাল ৮৪

www.pathagar.com

- ♦ স্বরাষ্ট্র দফতর ৮৪
- ♦ ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহ দর্শন ৮৪
- ♦ দারুল আরকাম ৮৫
- ♦ জাবালে আবু কুবাইস ৮৬
- ♦ মসজিদুর রায়াহ ও মসজিদুল জিন ৮৭
- ♦ আল মা'লা গোরস্তান ৮৭
- ♦ কুদার রাস্তা ৮৮
- ♦ জাবালে নূর ৮৮
- ♦ মিনা থেকে আরাফাত ৮৯
- ♦ ওস্তাদ আহমদ মুহাম্মদ জামাল ৯১
- ♦ অন্যান্য নিদর্শন ৯১
- ♦ মসজিদে মুহাস্সাব ও মসজিদুল কাবাশ ৯২
- ♦ জাবালে সাওর ৯২
- ♦ শেখ আকীল আত্তাসের দাওয়াত ৯৩
- ♦ মক্কা মুয়ায্যামার ইখওয়ান যুবক ৯৪
- ♦ শেখ আবদুল মালেক বিন ইবরাহিম ৯৪
- ♦ শেখ আবদুল ওয়াহহাব দেহলবী ৯৪
- ♦ হেরেম শরীফের নির্মাণ কার্য ৯৫
- ♦ মক্কা শরীফের আবহাওয়া ৯৫
- ♦ মক্কা থেকে তায়েফ ৯৫

৮. তায়েফ (৪-৬ ডিসেম্বর ১৯৫৯) ৯৮

- ♦ তুর্কী মুহাজির ৯৮
- ♦ তায়েফের আবহাওয়া ৯৯
- ♦ তায়েফের নিদর্শন ৯৯
- ♦ তুর্কী বন্ধুদের দাওয়াত ১০২
- ♦ তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তন ১০৩
- ♦ ওকায ১০৩
- ♦ হোনাইন ১০৩

৯. মক্কা মুয়ায্যামায় দ্বিতীয়বার (৬-৮ ডিসেম্বর ১৯৫৯) ১০৪

- ♦ হোদায়বিয়া ১০৪
- ♦ ওস্তাদ আহমদ আলী ও ওস্তাদ সাঈদ আল আমুদী ১০৫
- ♦ জেদ্দায় রওয়ানা ১০৫

১০. আবার জেদ্দায় (৮-১৩ ডিসেম্বর ১৯৫৯) ১০৬

- ♦ মিসরীয় দূতাবাস ১০৬
- ♦ শেখ নাসীফের দাওয়াত ১০৬
- ♦ জেদ্দা বেতারের সাথে সাক্ষাতকার ১০৬
- ♦ শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য ১০৯

www.pathagar.com

- ♦ জেদ্দার ইসলাম প্রিয় যুবকদের সমাবেশ ১১৩
- ♦ জেদ্দার জামে মসজিদে মাওলানার আরবি ভাষণ ১১৪
- ♦ সৌদী আরবের পরিস্থিতির উপর মাওলানার ভাষণ ১১৪
- ♦ আরব জাতীয়তাবাদ ও পাকিস্তান ১১৮
- ♦ জেদ্দা থেকে মদীনা মুনাওয়ারা ১১৯
- ♦ বদর ১২০

১১. মদীনা মুনাওয়ারায় (১৩-১৯ ডিসেম্বর ১৯৫৯) ১২১

- ♦ মসজিদে নববী ১২১
- ♦ মদীনার আবহাওয়া ১২১
- ♦ মদীনার আমীরের সাথে সাক্ষাত ১২১
- ♦ সাক্ষাতের পালা ১২২
- ♦ মদীনা মুনাওয়ারার নিদর্শন ১২৩
- ♦ ওহোদ ১২৩
- ♦ কুবা পল্লী ১২৫
- ♦ মসজিদুল জুম'আ ১২৫
- ♦ দারে কুলসুম ও দারে সা'দ ১২৬
- ♦ বিরে রীস বা বিরে খাতাম ১২৬
- ♦ মসজিদে যিরার ১২৬
- ♦ বিরে রুমা বা বিরে উসমান ১২৮
- ♦ মসজিদুল কিবলাতাইন ১২৮
- ♦ আকীক উপত্যকা ১২৯
- ♦ খন্দক ও জাবালে সিলা ১২৯
- ♦ মসজিদে যুবাব ১২৯
- ♦ মসজিদুল ফাতাহ ১২৯
- ♦ মাসাজিদে খামসা বা পাঁচ মসজিদ ১২৯
- ♦ বনূ হারাম গুহা ১৩০
- ♦ মসজিদে শাম্‌স ১৩০
- ♦ কা'ব ইবনে আশরাফ দুর্গ ১৩০
- ♦ দেখা সাক্ষাত ১৩০
- ♦ মদীনা মুনাওয়ারার অভ্যন্তরের নিদর্শন ১৩১
- ♦ মসজিদুল মুসাল্লা বা মসজিদুল গামামা ১৩১
- ♦ বিরে বুদা'আ ১৩১
- ♦ সাকীফায়ে বনূ সায়েদাহ ১৩১
- ♦ জাফর সাদিক ও আবূ আইউব আনছারীর গৃহ ১৩১
- ♦ তুর্কীস্তানীদের পাঠের আসর ১৩২
- ♦ তুর্কী বন্ধুদের দাওয়াত ১৩২
- ♦ আল বাকী কবরস্তান ১৩২

www.pathagar.com

১২. মদীনা মুনাওয়ারা থেকে আকাবা (১৯-৩০ ডিসেম্বর ১৯৫৯) ১৩৩
♦ মদীনা থেকে আল-আলা ১৩৪
♦ আল-আলা ১৩৫
♦ মাদায়েনে সালেহ ১৩৬
♦ মাদায়েনে সালেহ থেকে খয়বর ১৩৮
♦ খয়বর ১৩৯
♦ খয়বর থেকে তাইমা ১৪২
♦ তাইমা ১৪৩
♦ তাইমা থেকে তবুক ১৪৩
♦ তবুক ১৪৪
♦ তবুক থেকে মাগায়েরে শুয়াইব ১৪৬
♦ মাগায়েরে শুয়াইব ১৪৭
♦ আল হাকাল ১৪৮
১৩. জর্দান ও ফিলিস্তিন (৩০ ডিসেম্বর ১৯৫৯ থেকে ১১ জানুয়ারি ১৯৬০) ১৪৯
♦ আকাবা ১৪৯
♦ মায়ান ১৫১
♦ ওয়াদীয়ে মুসা ১৫১
♦ বাতরা ১৫২
♦ আল কারাক ১৫৪
♦ লূত জাতির নিবাস ১৫৪
♦ মূতা ১৫৪
♦ আম্মান ১৫৫
♦ আম্মান রেডিওর সাথে সাক্ষাৎকার ১৫৬
♦ বাদশা হোসাইনের সাথে সাক্ষাৎ ১৫৮
♦ বায়তুল মাকদেসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা ১৫৮
♦ ওয়াদীয়ে শুয়াইব ১৫৮
♦ জর্দান নদী ১৫৯
♦ আরীহা ১৬০
♦ ইখওয়ানের মাদরাসা ১৬০
♦ ইখওয়ানের প্রশিক্ষণ শিবির ১৬১
♦ আল-কুদসে মুতামারে ইসলামীর সম্বর্ধনা সভা ১৬১
♦ কুদসবাসীদের ধর্মীয় এবং নৈতিক অবস্থা ১৬২
♦ বায়তুল লাহম ১৬২
♦ আল খালীল ১৬৩
♦ মাকামে লূত (আ) ১৬৪
♦ বিবিসি'র জন্য সাক্ষাতকার ১৬৪
♦ বাইতুল মাকদাসের নিদর্শন ১৬৫

www.pathagar.com

- ফিলিস্তিন জাদুঘর ১৬৭
- আম্মান প্রত্যাবর্তন ১৬৭
- আম্মানের ইসলামিক কলেজ ১৬৭
- ওস্তাদ ইউসুফ আল আযম ১৬৮
- ইখওয়ানের সাপ্তাহিক বৈঠক ১৬৯
- আল-যারকায় দাওয়াত ১৬৯
- সরকারি দাওয়াত ১৭০
- আসহাবে কাহাফ-এর গুহা ১৭০
- ইরবাদ ১৭০
- সাহাবীদের কবর যিয়ারত ১৭১
- ইয়ারমুক ময়দান ১৭১

১৪. সিরিয়া ও মিসর (১১-২৮ জানুয়ারি ১৯৬০) ১৭৩

- দামেস্ক ১৭৩
- কায়রোর পথে রওয়ানা ১৭৪
- কায়রোয় ১৭৫
- সাক্ষাত ও ভাববিনিময় ১৭৫
- পাকিস্তানি রাষ্ট্র দূতের দাওয়াত ১৭৬
- আল্লামা বশীর ইবরাহিমীর দাওয়াত ১৭৬
- আলজিরিয়া সরকারের কর্মচারিদের সাথে সাক্ষাত ১৭৬
- পিরামিড এবং কায়রো মিউজিয়াম ১৭৭
- আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় ১৭৭
- আনসারুস সুন্নাহ ১৭৭
- কায়রো রেডিও প্রতিনিধির সাথে সাক্ষাতকার ১৭৮
- আরো কয়েকজনের সাথে দেখা-সাক্ষাত ১৭৯
- মিশর : পাশ্চাত্য ও ফিরাউনী সংস্কৃতির লীলাভূমি ১৮১
- সিনাইর উদ্দেশ্যে যাত্রা ১৮৩
- সিনাই উপত্যকায় ১৮৪
- ফারানের খেজুর বাগান ১৮৫
- সেন্ট ক্যাট্রীন গির্জা ১৮৫
- শাইনিং বুশ ১৮৬
- লাইব্রেরি ও মিউজিয়াম ১৮৬
- নরকংকাল ও মাথার খুলী ১৮৭
- জাবালে মুসায় ১৮৭
- সামেরীর গোবাছুর ১৮৮
- পুনরায় কায়রোয় ১৮৮
- আবার দামেস্ক ১৮৯

১৫. কুয়েত (২৮ জানুয়ারি থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬০) ১৯০

www.pathagar.com

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

১

কেন এই সফর ?

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রহ.) ১৯৫৬ সালে প্রথমবারের মতো আরব দেশসমূহ সফর করেন এবং হজ ও জিয়ারত সমাপন করেন। এ সফরে হজ ও জিয়ারত ছাড়াও মক্কা মুয়ায্‌যামা এবং মদীনা মুনাওয়ারার ঐতিহাসিক স্থানসমূহ দেখারও ইচ্ছা ছিলো মাওলানা মরহুমের। কিন্তু প্রথমত, ভীষণ গ্রীষ্মকাল, দ্বিতীয়ত সময় স্বল্পতা এবং তৃতীয়ত শারীরিক অসুস্থতা ইত্যাদি কারণে মাওলানার মনের এ আকূল আকাঙ্ক্ষা এবারের মতো অপূর্ণ থেকে যায়। এমনিতে হজের আয়োজন এবং প্রচণ্ড ভীড়ের মধ্যে এ ধরণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা তেমন সহজ ব্যাপার নয়। বিশেষ করে কোনো মানুষ যখন প্রথমবারের মতো হজে যায় তখন হজের জরুরী ব্যস্ততা থেকে সময় বের করে কোনো একাডেমিক কর্মসূচী কিভাবে হাতে নেবে আর কিভাবে সম্পন্ন করবে, অনেক চেষ্টা করেও একথা তার পক্ষে বুঝা কষ্টকর। মনে অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সে হিজাযের পুণ্য ভূমিতে পা রাখে এবং সেখানে পৌঁছে তা পূরণ করার চেষ্টাও করে। কিন্তু সেখান থেকে ফেরার পর তার মনে বার বার এ অনুভূতি জাগ্রত হয় যে, নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী তেমন কোনো কর্মসূচীই সে সম্পন্ন করতে পারেনি। হজের সফর শেষে মাওলানার অনুভূতিও ছিলো অনেকটা তাই। মক্কা মুয়ায্‌যামা এবং মদীনা মুনাওওয়ারায় অবস্থানকালে তিনি সেখানকার ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহ দেখার জন্য বেরও হয়েছিলেন, কিন্তু তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য অতোটা সময় এবং স্বস্তি তাঁর কোথায়? তাই সফর থেকে ফিরেই মাওলানা সিদ্ধান্ত নেন, আগামীতে কোনো এক শীত মৌসুমে উমরা করা হবে এবং আরবের পুণ্য ভূমির সমস্ত ঐতিহাসিক স্থান এবং নিদর্শনসমূহ গভীরভাবে নিরীক্ষণ করা হবে। আসল কথা হচ্ছে হজ আর উমরার উপকারিতা এক নয়। হজের যেসব উপকারিতা, উমরার দ্বারা তা অর্জিত হয় না বলেই তো হজ ফরয করা হয়েছে। কিন্তু উমরাকে একটা নফল ইবাদত করে তাতে আল্লাহ্ তা'আলা যেসব কল্যাণ নিহিত

www.pathagar.com

রেখেছেন, তাও এমন যে, হজের মৌসুমে হজের সাথে নিছক আনুষঙ্গিকভাবে তা অর্জন করা সম্ভব নয়।

কিন্তু ক্রমাগত স্বাস্থ্যের অবনতি এবং একাদিক্রমে কাজের চাপ তিন বৎসরেও মাওলানাকে এ সুযোগ দেয়নি। ফলে আরব দেশ সফরের জন্য তাঁর আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থেকে যায়। দেশে সামরিক শাসন জারী হলে (১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে প্রথম সামরিক শাসন) মাওলানা ক্রমাগত ব্যস্ততা থেকে কিছুটা অব্যাহতি পান। তখন একাডেমিক কাজগুলি সম্পন্ন করার কথা তাঁর মনে চেপে বসে। কয়েক মাসের চিকিৎসার পর স্বাস্থ্য সম্পর্কেও মাওলানা এতোটা আশ্বস্ত হন যে, এখন তিনি অন্তত সফরের কষ্ট সইতে পারেন।

এ সময় মাওলানা মনে মনে আরব দেশসমূহ সফরের এক ব্যাপক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। তিনি সিদ্ধান্ত নেন, কেবল হারামাইন শরীফাইন জিয়ারত করাই হবে না, বরং নজ্‌দ্‌, হিজায, জর্দান, ফিলিস্তিন, সিরিয়া এবং মিসরের সে সব ঐতিহাসিক স্থান এবং নিদর্শনও দেখা হবে, কুরআন মজীদ এবং সীরাত গ্রন্থে যে সবের উল্লেখ রয়েছে। কুরআন মজীদ, সীরাত এবং ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কিত নিদর্শনের অভাব যদিও ইরাকে নেই, কিন্তু সে সময় একজন পাকিস্তানীর, বিশেষ করে মাওলানা মওদূদীর পক্ষে ইরাক সফর করা কিছুতেই সম্ভব ছিলোনা। তাই মাওলানা বলতেন, যার গুলী খাওয়ার সখ হয়, কেবল সে-ই ইরাক সফরে যেতে পারে। আর কাউকে যদি গুলীই খেতে হয় তবে সেজন্য ইরাক যাওয়ারই বা কি দরকার রয়েছে!

১৯৫৯ সালের মধ্যভাগে মাওলানা সৌদি আরব, জর্দান এবং সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের করাচিস্থ দূতাবাসগুলোকে তাঁর এ আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে অবহিত করেন। এ ধরণের শিক্ষামূলক সফরে তাঁকে কতোটুকু সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যায়, নিজ নিজ দেশের সরকারের নিকট পত্র মারফত তা জানানোর জন্যও তিনি দূতাবাসসমূহকে অনুরোধ করেন। কারণ সরকারের সহযোগিতা বা কমপক্ষে সর্বত্র গমনাগমনের অনুমতি ছাড়া সেসব দেশের ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহ দেখা সম্ভব নয়। তাছাড়া তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সরকারের নিকট জেনে নেয়াই ছিলো সমীচীন।

সউদী আরবের তদানীন্তন রাষ্ট্রদূত ওস্তাদ মুহাম্মদ আহমদ শুবাইলী কেবল ভিসা দেয়ার প্রতিশ্রুতিই দেননি, বরং তিনি নিশ্চয়তা দেন, সৌদি সরকার এ ব্যাপারে মাওলানার সব রকম সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। অনেকটা এ ধরনের জবাব দিয়েছেন জর্দানের কনসাল ওস্তাদ হাশেম আত্তাল। কিন্তু করাচি ত্যাগের আগ পর্যন্ত সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের পক্ষ থেকে কোনো জবাব পাওয়া যায়নি। তাদের পক্ষ থেকে কোনো জবাব না পেলেও মাওলানা সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এই

www.pathagar.com

মনে করে যে, মিসর এবং সিরিয়া যাওয়া সম্ভব না হলে আপাতত সৌদি আরব এবং জর্দান (ফিলিস্তিনসহ) পর্যন্ত সফর সীমাবদ্ধ রাখবেন।

এরপর প্রশ্ন ছিলো বৈদেশিক মুদ্রার। কি জানি, বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের সরকার প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় দেয় কিনা। তিনি পাঁচ হাজার রুপিয়ার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার জন্য স্টেট ব্যাংকের নিকট দরখাস্ত করলেন। কিন্তু ব্যাংক মাত্র সোয়া তিন হাজার টাকার (২২৫ পাউন্ড) প্রতিশ্রুতি দেয়। যদিও এ অর্থ সফরের জন্য মোটেই যথেষ্ট ছিলো না। কিন্তু মাওলানা আল্লাহর উপর ভরসা করে এই সামান্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা নিয়েই সফরের জন্য প্রস্তুতি নেন।

মাওলানা দুই ব্যক্তিকে তাঁর সফর সঙ্গী হিসেবে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন- করাচির চৌধুরী গোলাম মুহাম্মদ সাহেব এবং আমাকে। সফরের ধরণও অনেকটা এমন ছিলো যে, তাতে তিনজন লোকই দরকার। চৌধুরী সাহেব তার কুয়েতস্থ বন্ধুদের দাওয়াতক্রমে ৯ অক্টোবর (১৯৫৯) করাচি থেকে কুয়েত রওয়ানা হন। তার সাথে কথা ছিলো, আমরা (আমি ও মাওলানা) দাহরান (সউদী আরব) পৌঁছলে তিনি কুয়েত থেকে সেখানে গিয়ে আমাদের সাথে মিলিত হবেন। #

www.pathagar.com

২

লাহোর থেকে করাচি

আমি এবং মাওলানা লাহোরেই কলেরা-বসন্তের প্রতিষেধক টীকা গ্রহণ করি। কারণ, সৌদি আরব, জর্দান এবং সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের ভিসা নেয়ার আগেই এ টীকা নিতে হয়। অতঃপর ২২ অক্টোবর (১৯৫৯) আমরা খাইবার মেইল যোগে লাহোর থেকে রওয়ানা হয়ে ২৩ তারিখ ভোরে করাচি পৌঁছি। আগের দিন লাহোরের উর্দু দৈনিক তাসনীমে (অধুনালুপ্ত) মাওলানার এ সফরের খবর প্রকাশিত হয়। তাই বন্ধু-বান্ধব এবং ভক্তেরা দলে দলে প্রায় প্রতিটি স্টেশনেই সাক্ষাৎ করতে আসেন। রাত সাড়ে ১১টা পর্যন্ত সাক্ষাৎকার অব্যাহত থাকে। এরপর রাতে কাউকে মাওলানার সাথে সাক্ষাৎ করতে দেয়া হয়নি।

করাচিতে অবস্থান

করাচিতে বেশি দিন অবস্থান করার ইচ্ছা আমাদের ছিলো না। এখান থেকে সপ্তাহে একদিন একটা সমুদ্র জাহাজ বসরা যায়। ২৭ অক্টোবর একটা জাহাজ ছাড়ার কথা ছিলো। এ জাহাজেই রওয়ানা করার পরিকল্পনা ছিলো আমাদের। ধারণা ছিলো তিন-চার দিনের মধ্যেই ভিসা, বৈদেশিক মুদ্রা এবং টিকেট ইত্যাদির কাজ শেষ করা যাবে এবং ২৭ তারিখ আমরা নিরাপদে রওয়ানা করবো। কিন্তু কোনো কোনো সময় সামান্য ব্যাপার এমন প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় যে, মানুষের সকল কর্মসূচীই মুলতবি হয়ে যায়।

ভিসা পেতে আমাদের কোনো বেগ পেতে হয়নি। সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ওস্তাদ মুহাম্মদ আহমদ আল শুবাইলী আমাদের কেবল ভিসাই দেননি, বরং একদিন আমাদের জন্য জাঁকজমকপূর্ণ মেহমানদারীরও আয়োজন করেন। আমাদের সফর সম্পর্কে সৌদি সরকার এবং রিয়াদের বিশিষ্ট আলিমদের তারযোগে অবহিত করেন এবং আমাদের হাতে তিনখানা চিঠিও দেন। একটা সীমান্ত বা অন্যান্য স্থানে নিয়োজিত সৌদি কর্মকর্তাদের নামে, যেন সফরের ব্যাপারে তারা আমাদের সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতা করেন। দ্বিতীয় পত্র রিয়াদের শেখ আবদুল লতীফ ইব্ন ইব্রাহীমের নামে (দ্বীনী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং প্রধান মুফতী শেখ মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীমের ছোট ভাই) আর তৃতীয়টি রিয়াদের শেখ আব্দুল আযীয বিন বাযের নামে।

www.pathagar.com

জর্দানের কনসাল ওস্তাদ হাশেম আত্তালও শুধু ভিসাই দেননি, বরং তিনি মাওলানার সাথে বিশেষ বিশেষ সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষাও প্রকাশ করেছেন। মাওলানা একদিন তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে গেলে তিনি মাওলানাকে জানান, একটি বিশেষ কাজে সপ্তাহ দুয়েকের জন্য আমি আজই দেশে যাচ্ছি। সেখানে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকেই আপনার সম্পর্কে অবহিত করবো , যাতে জর্দানে প্রবেশের পর সফরের ব্যাপারে তারা আপনাকে সব রকম সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা দেন। তিনিও সীমান্তে নিয়োজিত শুল্ক কর্মকর্তাদের নামে একটা পত্র আমাদের হাতে দেন। আরব প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রদূত ওস্তাদ ত্বা-হা ফাতহুদ্দীনের কাছ থেকেও সহজে ভিসা পেয়ে যাই। মিসর সফর সম্পর্কে এমনিতে আমাদের মনে কোনো শংকা ছিলো না, ছিলো না কোনো অস্থিরতা। আমাদের মনে ছিলো যে, আমরা কেবল তুর পাহাড়ের (সিনাই) জন্য মিসর সফর করবো। আর সিনাই বর্তমানে সামরিক এলাকা। সরকারের অনুমতি ব্যতীত কোনো মিসরীও সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। তাই আমাদের মনে আশংকা ছিলো, আমরা অর্থ এবং সময় ব্যয় করে সেখানে গিয়ে যদি জানতে পারি, প্রবেশের অনুমতি পাওয়া যাবে না, তথাপি আমরা মিশরের রাষ্ট্রদূতের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করার কোনো প্রয়োজনবোধ করিনি। আমরা ঠিক করি, এ ব্যাপারে সৌদি আরবে নিযুক্ত মিসরীয় রাষ্ট্রদূতের সাথে আলোচনা করবো।

ভিসা পাওয়ার পর স্টেট ব্যাংক থেকে ২২৫ পাউন্ডের বিনিময়ও যথাসময় লাভ করি। কিন্তু শেষ মুহূর্তে বাধা আসে টিকেটের ব্যাপারে। ইচ্ছা ছিলো, সৌদি আরব থেকেই আমরা সফর শুরু করবো আর সৌদি আরবে প্রবেশ করবো খোবার (পূর্বাঞ্চলীয় বন্দর) পথ দিয়ে। আমরা আগে থেকেই জানতাম, হজের মৌসুম ছাড়া বছরের অন্যান্য সময় করাচি থেকে জিদ্দা সরাসরি কোনো জাহাজ চলাচল করে না। আর চলাচল করলেও সৌদি সরকারের তরফ থেকে জিদ্দার পথে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়া হয় না। কিন্তু খোবার যাওয়ার জন্য আমরা শিপিং কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করে জানতে পারি, করাচি থেকে বসরাগামী জাহাজ খোবার থামে না। তাই যাদেরকে করাচি থেকে খোবার যেতে হয়, তারা আগে বাহরাইন নামে। সেখান থেকে লঞ্চ বা বিমান যোগে খোবার পৌঁছে। এখন আমাদের বাহরাইনের ভিসাও প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আমি এবং মাওলানা কারো পাসপোর্টেই বাহরাইন অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। আজ ২৬ অক্টোবর। পরদিন জাহাজ ছাড়বে। একদিনে বাহরাইনের অন্তর্ভুক্তি কোনো রকমেই সম্ভব নয়। সম্ভব নয় ভিসা এবং টিকেট নেওয়া। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও সফর এক সপ্তাহ বিলম্বিত করতে হলো।

www.pathagar.com

বাহরাইনের অন্তর্ভুক্তির জন্য ২৭ অক্টোবর পাসপোর্ট অফিসে আমরা পাসপোর্ট জমা দেই। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী দশ দিনে পাসপোর্ট পাওয়ার কথা, কিন্তু আমরা দশ টাকা আর্জেন্ট ফি দেয়ায় পরদিন পাসপোর্ট পাই। হাতে আরও পাঁচদিন সময় রয়েছে। এরি মধ্যে বাহরাইনের ভিসা এবং টিকেটও সংগ্রহ করে নেই। আবার জানতে পারলাম, পাকিস্তান ত্যাগের আগে আরও একটা অনুমতি নিতে হবে এবং পাসপোর্টে একটা সীল লাগিয়ে নিতে হবে। যথাসময়ে এ কাজও সম্পন্ন হলো। পাসপোর্ট পাওয়া, ভিসা, টিকেট এবং বৈদেশিক মুদ্রার জন্য ছোটাছুটি একটা বিরাট অভিযানের চেয়ে কম নয় মোটেই। এটা হচ্ছে বর্তমানকালে প্রতিটি দেশের ঘাড়ে জাতীয়তার ভূত সওয়ার হওয়ার ফলশ্রুতি। যেন বিদেশ গমনেচ্ছু বা বিদেশ থেকে এদেশে আগমনেচ্ছু প্রতিটি ব্যক্তিই চোর, সব জায়গায় তাকে তল্লাশী করতে হবে। মুসলিম রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পাসপোর্ট ভিসার এ চক্কর ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকেও অপ্রয়োজনীয় এবং অর্থহীন। সপ্তম শতাব্দীতে ইবনে বতুতা মরক্কো থেকে চীন পর্যন্ত ভ্রমণ করেছেন। মুহাম্মদ ইবনে তুগলকের শাসনামলে তিনি হিন্দুস্তানে আগমন করেন এবং এখানে কয়েক বছর অবস্থান করেন। তিনি এখানে বিবাহ-শাদী এবং ঘর-সংসারও করেন। কাযীর (বিচারপতি) পদেও নিযুক্ত হন এবং রাষ্ট্রদূত হয়ে অন্য দেশেও প্রেরিত হন। কিন্তু কোথাও তার পাসপোর্ট-ভিসার কোনোই প্রয়োজন পড়েনি।

করাচিতে অবস্থানের দশটা দিন এই ছুটাছুটিতে কেটে যায়। এসময় বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সাক্ষাত এবং তাদের অনেক দাওয়াতে শরীক হওয়ারও সুযোগ হয়। ভালোই হয়েছে, মাওলানা লাহোর থেকে আসার সময় তাফহীমুল কুরআনের কিছু কাজ সাথে নিয়ে এসেছিলেন। তা-না হলে তাঁর এ বেকার দিনগুলো কিভাবে কাটতো বলা মুশকিল। 'তারজুমানুল কুরআন' নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৫৯ সংখ্যার জন্য তাফহীমুল কুরআনের কিস্তিগুলো মাওলানা করাচিতে বসেই লেখেন এবং কিছু অসমাপ্ত নিবন্ধও সমাপ্ত করেন। #

www.pathagar.com

৩

করাচি থেকে বাহরাইন

৩-৮ নভেম্বর ১৯৫৯

শিপিং কোম্পানীর ঘোষণা ছিলো, তাদের পরবর্তী জাহাজ যার নাম বারিসা (BARISA) ৩ নভেম্বর সন্ধ্যায় করাচি থেকে ছাড়বে। এক-দুই করে তেসরা নভেম্বর হাজির। ইতিমধ্যে আমরা প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ক্রয় করে প্রস্তুত হয়েছি। মাওলানার টিকেট ছিলো প্রথম শ্রেণীর আর তাঁর কেবিন ছিলো রিজার্ভড। তাই নির্ধারিত সময়ের অনেক আগে তাঁর বন্দরে পৌছার দরকার ছিলোনা। কিন্তু আমার টিকেট ছিলো ডেক শ্রেণীর। জায়গা নেয়ার জন্য আমাকে রীতিমতো সংগ্রাম করতে হয়। তাই প্রায় তিনটার দিকে আমি বন্দরে পৌঁছি। বন্দরে অনেকেই মাওলানার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তখন যেহেতু ইরাকে যাতায়াত বন্ধ ছিলো, এজন্য কোনো ভিসাও দেওয়া হতো না। তাই আমার ধারণা ছিলো, যাত্রীদের বুঝি তেমন ভীড় হবে না। কিন্তু আমি বন্দরে পৌঁছে দেখি, যাত্রীদের প্রচণ্ড ভীড়। জানতে পারলাম, করাচি থেকে যারা গোয়াদির বন্দরে যায় (গোয়াদির পাকিস্তানেরই আর একটি সমুদ্র বন্দর) তারা এই জাহাজেই যাতায়াত করে। আর সে জন্যই এতো ভীড়। একটা দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে আমি আগে পাসপোর্টে পুলিশের সিল লাগাই। বাহরাইনে নেমে যে কার্ডটি পূরণ করে পুলিশের হাতে দিতে হবে, তাও এখানে পাওয়া গেলো। এরপর শুরু হয় মাল-পত্র চেক করার পালা। সমুদ্রপথে যাত্রীদের মাল-সামানের ক্ষেত্রে স্থলপথে বা আকাশ পথের মতো বিশেষ কোনো পরিমাণ নির্ধারিত নেই। তাই আমার দু'টি বাক্স মাওলানার সামানের সাথে দিয়ে দেই। প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের মালপত্র চেক করা হয় অতি ভদ্রতার সাথে। যতসব চোরা কারবারী সন্দেহ করা হয় ডেক শ্রেণীর যাত্রীদেরকে। এদের ক্ষেত্রে কোনো নিয়ম-নীতির বালাই নেই। কঠোরভাবে তাদের মাল-সামান তল্লাশী করা হয়। গরীব সাধারণ মানুষদের অবস্থা সর্বত্রই এমন হয়। আমার কাছে ছিলো শুধু একটা বেডিং এবং একটা সাইড ব্যাগ। তাই চেকিং-এ আমাকে তেমন অসুবিধায় পড়তে হয়নি। চেকিং শেষে জাহাজে উঠে দেখি, বিছানা রাখার মতো কোনো স্থান নজরে পড়ছে না।

www.pathagar.com

অনেক খোঁজাখুঁজি করে এক কোণায় একটু স্থান পেলাম। সেখানে উপরে কিছুই নেই, একেবারেই শূন্য।

পাঁচটার দিকে মাওলানা এলেন। আলহামদু লিল্লাহ, মালসামান বুকিং-এ তাঁকে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি। জাহাজে পৌঁছার পরপরই তাঁর পাসপোর্টে পুলিশের সীল পড়ে। জাহাজে আরোহণকালে বিপুল সংখ্যক বন্ধু-বান্ধব তাঁকে বিদায় অভিনন্দন জানান। জনাব মাহেরুল কাদেরী, অধ্যাপক খুরশীদ আহমদ, জনাব আখলাক হোসাইন এবং মাওলানার পুত্র আহমদ ফারুক মওদূদী মাওলানার সাথে জাহাজের ভেতরে আসেন। মাওলানার কেবিন নম্বর ছিলো-১। সেখানে তাঁর সাথে অন্য কোনো যাত্রী ছিলো না। প্রতিটি কেবিনে অন্তত ছয়জন যাত্রী থাকে। পায়খানা-গোসলখানা তো কয়েকটি কেবিনের জন্য একটাই থাকে। তাই প্রথম শ্রেণীর টিকেট নিয়েও কেউ নিশ্চিত হতে পারে না যে, তাকে কোনো মদ্যপের পাল্লায় পড়তে হবে না। আল্লাহর শোকর! মাওলানা বেঁচে গেলেন এমন দুশ্চিন্তা থেকে।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে জাহাজ ছাড়ে। জাহাজ ছাড়ার পূর্বেই বন্ধু-বান্ধব সকলে নেমে যায়। আমি মাওলানার কাছেই ছিলাম। প্রায় এশার সময় আমার জায়গায় চলে আসি। যতোদিন জাহাজে ছিলাম বিনা বাধায় দিনের বেলা আমি মাওলানার কাছে চলে আসতাম এবং প্রায় সারাদিন সেখানেই পড়াশুনায় কাটাতাম। অবশ্য এশার পর নিজের জায়গায় ফিরে আসতে হতো। কারণ, রাতের বেলা ডেক থেকে উপরে যাওয়ার সকল পথ বন্ধ করে দেয়া হতো।

গোয়াদির বন্দর

পরদিন দুপুর ২টার দিকে আমাদের জাহাজ পাকিস্তানের গোয়াদির বন্দরে পৌঁছে। এখানে যেহেতু পূর্ণাংগ বন্দর নেই, তাই প্রায় এক দেড় মাইল দূরে জাহাজ ভেড়ে। যাত্রীরা নৌকা যোগে কূলে যায়। যখন আমাদের জাহাজ সেখানে পৌঁছে তখন কিছুটা জোরে বাতাস বইছিল। এ বাতাসের মুখে পালবাহী নৌকাগুলোকে জাহাজের কাছে আসতে যে বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল, তা দেখার মতো। পথ অতিক্রম করতেই তাদের প্রায় এক ঘণ্টা লেগে যায় এবং অনেক কষ্ট করে যাত্রীদের জাহাজে আরোহণ করতে হয়। যেসব যাত্রীর এখানে নামার কথা, তারা বিরাট ঝুঁকি নিয়ে নেমে যায়। এসব দেখে মাওলানা বললেন : "আল্লাহ্ যেন কোনো ভদ্রলোককে এ পথে না আনেন।"

এখানকার শুল্ক অফিসার ছিলেন লাহোরের বাসিন্দা। তিনিও জাহাজে আসেন। তিনি যখন জানতে পারলেন, এ জাহাজে মাওলানাও সফর করছেন, তখন তালাশ করে তিনি মাওলানার কাছে আসেন। তিনি জানালেন, আজতো আবহাওয়া

www.pathagar.com

অনেক ভালো। তাই যাত্রীদের তেমন অসুবিধা হয়নি। যেদিন আবহাওয়া খারাপ থাকে, সমুদ্রে থাকে উত্তাল তরঙ্গমালা, সেদিন তো এখানে প্রায় কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্যের অবতারণা হয়। বিশেষ করে গ্রীষ্মের মৌসুমে তো পরিস্থিতি একেবারেই অবর্ণনীয়। তিনি জানালেন, করাচি এবং গোয়াদিরের মধ্যে যাতায়াতের জন্য সমুদ্র পথ ছাড়া যেহেতু আর কোনো ভালোব্যবস্থা নেই, তাই বিপুল সংখ্যক যাত্রীকে এ পথে যাতায়াত করতে হয়। কিন্তু যাত্রীদের সুবিধার জন্য এখানে একটা ভালো নৌকাও নেই। এ পথে একটি মাত্র লঞ্চ আছে যাতে শুল্ক বিভাগের কর্তা ব্যক্তিরা যাতায়াত করে। সব যাত্রীকে যাতায়াত করতে হয় পালবাহী নৌকায়। একটু জোরের হাওয়া মুকাবিলা করাও এসব নৌকার জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে। স্থলপথে যাতায়াত করতে হলে তাদেরকে করাচি থেকে কোয়েটা যেতে হয়, সেখান থেকে গোয়াদির আসতে হয়। গোয়াদিয়ার প্রায় ৬০০ মাইল পথ অতিক্রম করতে হয়। এ দীর্ঘ পথে কাঁচা-পাকা কোনো রাস্তা নেই। হয় পায়ে হেঁটে যাতায়াত করে, না হয় উটে করে। এ পথে কয়েকটি লঞ্চ চালু করলে ভালো হতো, জাহাজ এবং বন্দরের মাঝখানের পথে যাত্রীদের বিপদের সম্মুখীন হতে হতো না।

পাকিস্তানের অধিকারে আসার আগে গোয়াদির ছিলো চোরাচালানীর বিরাট লীলাভূমি। পাকিস্তান যখন এর দায়িত্ব গ্রহণ করে, তখন সেখানে শুধু কাপড়ই ছিলো পাঁচ কোটি টাকার। অথচ দূর থেকে দেখা যায় একটা নেহায়েত মামুলী গ্রাম। শুল্ক কর্মকর্তা আরও জানান, পাকিস্তান থেকে বিদেশ যাওয়ার জন্য যারা পাসপোর্ট পায়না, তারা গোয়াদিরের টিকেট নিয়ে করাচি থেকে জাহাজে রওয়ানা হয়। কিন্তু গোয়াদিরে না নেমে তারা জাহাজে লুকিয়ে থাকে। অনেক কষ্ট করে তাদের খুঁজে বের করতে হয়। আর এজন্য এখানে জাহাজ ছাড়তে বিলম্ব হয়। এই তল্লাশীতে আমাদের জাহাজও বিলম্বিত হয়। মানুষ স্বাভাবিক উপায়ে পাসপোর্ট লাভ করলে এ অস্বাভাবিক পথ বেছে নেবে কেনো!

মাস্কাট থেকে দুবাই ও উম্মে সাঈদ

আমাদের জাহাজ ৫ নভেম্বর মাস্কাট, ৬ নভেম্বর দুবাই এবং ৭ নভেম্বর কাতারের উম্মে সাঈদ বন্দরে পৌঁছে। উম্মে সাঈদকে মানুষ সাধারণত সাঈদ বলে থাকে। এসব হচ্ছে পারস্য উপসাগরের আরব উপকূলে ইংরেজ শাসনাধীন ছোট ছোট আরব রাজ্য। ইংরেজরা যদিও বাহ্যত কাষ্ঠপুতুলের ন্যায় শেখদের বসিয়ে রেখেছে, কিন্তু কার্যত কল-কাঠি তাদের হাতে। শুরুতে ইংরেজরা এসব রাজ্যের উপর অধিকার বিস্তার করেছিল যাতে পারস্য উপসাগর অর্থাৎ ইরাক এবং হিন্দুস্তানের মধ্যবর্তী স্থানে সমুদ্রপথে তাদের অধিকার সংরক্ষিত থাকে। কিন্তু এসব রাজ্যে তৈল উত্তোলন শুরু হলে বা তার সম্ভাবনা দেখা দিলে এরা সর্বশক্তি

www.pathagar.com

নিয়োগ করে সেখানে থাবা বিস্তার করে। এগুলো তেমন বড় বন্দর নয়, এখানেও তীর থেকে চার-পাঁচ মাইল দূরে জাহাজ ভেড়ে। কিন্তু এখানে লঞ্চের ব্যবস্থা থাকাতে উঠা-নামায় যাত্রীদের গোয়াদিরের মতো বিপদের সম্মুখীন হতে হয় না।

আমাদের জাহাজ যখন মাস্কাট পৌঁছে, আমি তখন উপরে মাওলানার কাছে। জাহাজ ছেড়ে দেয়ার পর আমি নিচে এসে জানতে পারলাম, মাস্কাটের কিছু দোকানদার জাহাজে আরোহণ করে রীতিমতো দোকান খুলে বসেছে। চারিদিকে কেনা-কাটার ধুম পড়ে গেছে। পাকিস্তানি মুদ্রা এখানে চলে না, অবশ্য হিন্দুস্তানী মুদ্রা চলে। মজার ব্যাপার, পারস্য উপসাগরীয় রাজ্যগুলোর জন্য হিন্দুস্তান স্বতন্ত্র নোট ছেপেছে। সরকারিভাবে যদিও পাকিস্তান এবং হিন্দুস্তানের মুদ্রার মান সমান, কিন্তু কার্যত পাকিস্তানি মুদ্রার মান এক তৃতীয়াংশ কম। সামনে গিয়ে দুবাই থেকে উম্মে সাঈদ বন্দরেও এধরণের বাজার জমতে দেখেছি। অনেক দোকানদার তো রীতিমতো দোকান খুলে বসে। কাপড়-চোপড়, জুতা-মোজা, কলম, বিস্কুট, নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য মোটকথা, এমন কোনো প্রয়োজনীয় দ্রব্য নেই, যা এসব দোকানে পাওয়া যায় না। আর দামেও খুবই সস্তা। এক জোড়া জাপানী চপপলের দাম জিজ্ঞেস করলে দোকানদার জানায় দু'টাকা। অথচ লাহোর এবং করাচিতে এ চপপলের মূল্য প্রায় দশ টাকা। কাপড়-চোপড় এবং অন্যান্য জিনিসের দামও সস্তা।

আমাদের জাহাজটি কেবল যাত্রীবাহী জাহাজই নয়, মালবাহীও। তাই প্রতিটি বন্দরে নোঙ্গর করে যাত্রী উঠা-নামা ছাড়াও মাল বোঝাই এবং খালাস করা হতো। ফলে এক একটি বন্দরে কয়েক ঘণ্টা বিলম্ব হতো। উম্মে সাঈদ বন্দরে যেসব মাল নামানো হয়, তার বেশির ভাগই ছিলো মোড়কে আবৃত শুকনো গোশ্ত। সম্ভবত এগুলো এসেছে অস্ট্রেলিয়া থেকে। তাও আবার মেশিনে কাটা। ভাবতে অবাক লাগে, এ ব্যাপারে আরবদের কোনো খবরই নেই।

জানতে পারলাম, জাহাজে খুব মদ্য পান চলে। বিশেষ করে প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীরাতো সফরই করে মদ আর প্রমোদের জন্য। রাতের বেলা যার সাথেই দেখা, তার মুখ থেকে ভেসে আসে মদের গন্ধ। জাহাজের একজন কর্মকর্তা জানান, করাচি থেকে যেসব যাত্রী এসেছে তাদের অধিকাংশই এখানে এসে মদ পান করে। জাহাজে মদ পাওয়া যায় খুব সস্তায় এবং এজন্য কোনো ডাক্তারী সার্টিফিকেটেরও দরকার হয় না। সুতরাং তারা কেনো মদ পান করবে না? আমাদের এ জাহাজেই গুজরাটের জনৈক মৌলবী সাহেব করাচি থেকে বাহরাইন যাচ্ছিলেন। বাহরাইন থেকে তিনিও আমাদের মতো খোবার যাবেন এবং সেখান থেকে মক্কা মুয়ায্যামা যাবেন উমরা করার জন্য। তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতেই যাচ্ছিলেন। কিন্তু খুব অল্প সময়ই তিনি তার কেবিনে অবস্থান করতে পারতেন। কেবিনের অন্য যাত্রীদের মদ পানের ফলে কেবিনে অবস্থান করাই তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

জাহাজে দু' ধরনের খাবার দেয়া হয় ইংলিশ এবং হিন্দুস্তানি। আবার প্রতিটি খাবারের তিনটি শ্রেণী ১ম, ২য় এবং ৩য়। হিন্দুস্তানী খাবারে মুসলিম অমুসলিমের পার্থক্য থাকে। কিন্তু ইংলিশ খাবারের জন্যই জাহাজ কর্তৃপক্ষের যতো চেষ্টা যত্ন। তৃতীয় শ্রেণীর খাবারও হিন্দুস্তানী প্রথম শ্রেণীর খাবারের চেয়ে উত্তম। কিন্তু এর গোশ্‌ত সম্পর্কে সন্দেহ থাকায় কোনো সচেতন মুসলমানের পক্ষে তা গ্রহণ করা মুশকিল। মাওলানা হিন্দুস্তানি খাবারকেই অগ্রাধিকার দেন। খাবার যদিও প্রথম শ্রেণীর ছিলো এবং এজন্য তিনি প্রায় ১ শত টাকার অধিক মূল্য পরিশোধ করলেও তা ছিলো অতি নিম্নমানের একেবারে হিন্দুদের পদ্ধতির তৈরি। এতে যে ঘি ব্যবহার করা হয়, তাও খুবই নিম্নমানের। তাই মাওলানা কয়েক বেলার বেশি খেতে পারেননি। শেষ তিনচার দিন তো শুধু নামে মাত্র খেয়েছেন। ডেক শ্রেণীর যাত্রীদের দুই ধরনের টিকেট হয় খাবারসহ এবং খাবার ছাড়া। যারা টিকেটের সাথে খাবারের মূল্যও পরিশোধ করে, তাদেরকে জাহাজের লংগরে গিয়ে খেতে হয়। প্রথমবার সফর করার ফলে এ সম্পর্কে আমার জানা ছিলো। আমার টিকেটে খাবার অন্তর্ভুক্ত করিনি। জাহাজে উঠে বাবুর্চি খানার মুসলিম ম্যানেজারকে খাবার বাবদ চল্লিশ টাকা পরিশোধ করি এবং প্রথম শ্রেণীর হিন্দুস্তানি খাবারের জন্য আলাদা টিকেট নেই। একদিকে তা আমার সীটে নিয়ে আসা হতো, অন্যদিকে আমার মতো লোক কোনো রকমে তা খেতে পারতো।

আবহাওয়া ছিলো চমৎকার। সমুদ্রে কোনো তরঙ্গমালা ছিলো না। তাই বমি, মাথা ঘোরা ইত্যাদি থেকে অধিকাংশ যাত্রীই রক্ষা পায়। আলহামদুলিল্লাহ মাওলানা তো সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিলেন। একদিন আমার মাথায় সামান্য চক্কর দেয়। কিন্তু লেবুর আচার খাওয়ায় তা দূর হয়ে যায়। ১৯৪৯ সালের গ্রীষ্মকালে আমি যখন মরহুম মাওলানা মাসউদ আলম নদবীর সাথে করাচি থেকে বসরা সফর করেছিলাম তখন বমি এবং মাথা ঘোরার ফলে আমার যে নাজুক দশা হয়েছিল তা এখনও আমার মনে আছে।

বাহরাইন

৮-১০ নভেম্বর ১৯৫৯

৮ নভেম্বর সকাল ৭টার দিকে আমাদের জাহাজ বাহরাইন পৌঁছে। পারস্য উপসাগরে একটি বড় এবং দু'টি ছোট দ্বীপের সমষ্টির নাম বাহরাইন। শুধু বড় দ্বীপটিকেও বাহরাইন বলা হয়। এ বড় দ্বীপে মানামা নামে একটা বন্দর নগরী রয়েছে। আমাদের জাহাজ এই মানামায় আসে। নিকটবর্তী সমুদ্রে অনেক দূর পর্যন্ত ছিলো উত্তাল তরঙ্গমালা। তাই আমাদের জাহাজ বন্দর থেকে প্রায় চার মাইল দূরে নোঙ্গর করে। নয়টার দিকে আমরা জাহাজ থেকে নেমে ১১টার দিকে বন্দরে পৌঁছি লঞ্চ যোগে। মাথাপিছু ভাড়া নেয় পাঁচ টাকা।

www.pathagar.com

আমাদের ধারণা ছিলো, এখানে আমাদের পরিচিত কেউ নেই। তাই এখানে মাত্র কয়েক ঘণ্টা অবস্থান করে লঞ্চ বা বিমান যোগে খোবার (সউদী আরব) যাবো। কিন্তু লঞ্চ কূলে ভিড়লে যাত্রীদের গ্রহণ করার জন্য যারা সেখানে উপস্থিত ছিলো, তাদের মধ্যে এমন কিছু চেহারাও আমাদের নজরে পড়ে, যেন তারা আমাদের খুঁজছেন। আমরা লঞ্চ থেকে নামলে তিনজন লোক এগিয়ে এসে আমাদের সাথে মোসাফাহ করলেন। এদের একজনের পরনে হিন্দুস্তানি আর দু'জনের পরনে আরবীয় পোশাক। পরিচয় জানতে পারলাম, পাকিস্তানি পোশাক পরিহিত ব্যক্তি হাজারা জেলার অধিবাসী। প্রায় দুই আড়াই বছর ধরে তিনি বাহরাইনের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন। আর এ স্কুলের অধিকাংশ ছাত্রই পাকিস্তানি বা হিন্দুস্তানি প্রবাসীদের সন্তান। তার অপর দু'জন সাথী বাহরাইনেরই বাসিন্দা। আমরা তাদের কাছে জানতে চাইলাম, আমাদের আসার খবর আপনারা কিভাবে পেলেন? জবাবে তারা জানালেন, খোবার এবং বাহরাইনের অনেকেই করাচি থেকে আপনাদের আসার খবর পেয়েছে। তারা কেবল আমাদের খবরই দেননি, বরং আপনাদেরকে স্বাগত জানাবার জন্য বিশেষভাবে একজন লোকও পাঠিয়েছেন। আপনাদের ইসতিকবাল করার জন্যে জনৈক বাহরাইনী বন্ধুকে সাথে নিয়ে তিনি জাহাজে আরোহণ করেছেন। আমরা এসব আলাপ করছিলাম, এমন সময় আর একটি লঞ্চ যোগে উভয় ভদ্রলোক এসে পৌঁছান। বাহরাইন থেকে যে ভদ্রলোক এসেছেন তিনিও পাকিস্তানি। তার নাম ইসমাইল খান। তিনিও হাজারা জেলার অধিবাসী। আরব-আমেরিকান তেল কোম্পানী-আরামকোতে বিগত ৮ বছর যাবত চাকুরী করছেন।

জাহাজ থেকে নামার সময় আমাদের পাসপোর্টে বাহরাইন অবতরণের সীল দেয়া দরকার ছিলো, কিন্তু না জানা এবং তাড়াহুড়ার কারণে আমরা তা করতে পারিনি। পরিচিত কেউ এখানে উপস্থিত না থাকলে আমাদের অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হতো। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ। এদের কারণে কোনো অসুবিধা হয়নি। এদের মাধ্যমে তখনই একাজ সেরেছি এবং আমাদের আসবাবপত্রও চেক করা হয়নি। এভাবে বন্দরে কয়েক মিনিটের বেশি আমাদের সময় ব্যয় হয়নি।

আমরা হোটেল 'ফুন্দকুল বাহরাইনে' গিয়ে উঠি। জনৈক ইরানী এ হোটেলের মালিক। মানামা খুব সুন্দর শহর। রাস্তাঘাট চমৎকার, সবগুলো ইমারতই আধুনিক ডিজাইনে নির্মিত। ইসমাইল খান আগে থেকেই আমাদের জন্য হোটেলের একটি কক্ষ নিয়ে রেখেছেন। আমরা কক্ষে মাল-সামান রেখে কাপড়-চোপড় পরিবর্তন করি। এরপরই শুরু হয় দর্শনার্থীদের পালা। এদের কিছু পাকিস্তানি আর অধিকাংশই বাহরাইনী। এরা মাওলানার আরবি কিতাব এবং আলমুসলিমুন ও অন্যান্য আরবি পত্রিকায় তাঁর নিবন্ধ পাঠ করেছিলেন এবং দূরে

www.pathagar.com

থেকে মাওলানাকে ভালোভাবে জানতেন। দুপুরের খাবার আমাদের পাকিস্তানি বন্ধু- যিনি বন্দরে আমাদের অভ্যর্থনা জানান- নিজের বাসা থেকে নিয়ে আসেন। জানতে পারলাম, তার বাসা হোটেল থেকে দশ-বারো মাইল দূরে। আমরা তা আগে জানতে পারলে তাকে এতটা কষ্ট করতে দিতাম না। নিকটস্থ বাজার থেকেই খাবারের ব্যবস্থা করে নিতাম। যদিও আমাদের মন অন্য কিছু চাচ্ছিল। কারণ, জাহাজে দীর্ঘদিন একটানা একধরনের খাবার আমাদের কাছে বিস্বাদ লাগছিল। তাই হোটেলের এবং বাজারের খাবার গ্রহণ করতে মন চাচ্ছিল না। ভদ্রলোক এতো বেশি পরিমাণ খাবার নিয়ে এসেছেন যে, আমাদের ছাড়া আরও ৮/১০ জন খেয়েছেন। খাবার ছিলো পাকিস্তানি কায়দার, যদিও কিছুটা আরবিয় প্রভাব ছিলো। আরবিয় প্রভাব অর্থ তাতে মরিচ কম ছিলো। কিন্তু তারপরও আমাদের কোনো কোনো পাকিস্তানি বন্ধুর অসুবিধা হয়। আরব দেশে লাল মরিচ একেবারেই ব্যবহার করা হয় না। দ্বিতীয়, আরবিয় প্রভাব ছিলো এই যে, দু'তিনজন লোকের জন্য যে খাবার আনা হয়েছে, তার পরিমাণ এতো বেশি ছিলো যে, দশ-বারোজনে তৃপ্তি সহকারে খেয়েছে। মেহমানের সংখ্যা অনুপাতে খাবার আনা হবে- আরবদের কাছে এটা অত্যন্ত আপত্তিকর। বরং তাদের মতে মেহমানের সামনে খাবার হাযির করতে হবে তাদের সংখ্যার তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে, যাতে মেহমান যাকে খুশী খাবারে শরীক করতে পারেন। তাদের মতে মেহমানের মর্যাদা এরই মধ্যে নিহিত।

খাওয়া দাওয়া শেষে আমরা পরদিন খোবার রওয়ানা হওয়ার জন্য তাদের অনুমতি চাই। কিন্তু তারা অনুমতি দিতে রাজি না। তারা চান, আমরা অন্তত এক সপ্তাহ বাহরাইনে অবস্থান করি। তারা এক সপ্তাহের একটা কর্মসূচীও প্রস্তুত করে নিয়েছেন। কিন্তু আমাদের হাতে যেহেতু সময় কম, তাই শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত হয় আমরা সেখানে দু'দিন অবস্থান করে ১০ নভেম্বর খোবার রওয়ানা করবো।

মাগরিব পর্যন্ত আমরা হোটেলেই ছিলাম। এ সময় সাক্ষাৎপ্রার্থীদের ভিড় লেগেছিল। রাতে আল মাহরাফে এক আরব বন্ধুর বাসায় খাবার দাওয়াত ছিলো। আল-মাহরাফ বাহ্‌রাইনের আর একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। একটি পুলের মাধ্যমে মানামার সাথে সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। জাহাজ যাতায়াতের জন্য পুলটি গুটিয়ে নেয়া এবং পরে আবার পেতে দেয়া হয়। মাগরিবের পর কয়েকজন বন্ধুকে সাথে নিয়ে সেখানে পৌঁছি। সেখানে ১৫/১৬ জন শিক্ষিত তরুণ এবং বয়স্ক লোক উপস্থিত ছিলো। তারা মাওলানাকে উষ্ণ সম্বর্ধনা জানান। এরপর তাদের সাথে আলাপ পরিচয় হয়। আমরা তাদের সাথে এশা'র নামায আদায় করি। নামায শেষে খেতে বসি। খাবারে আরবিয় সংস্কৃতির প্রাধান্য ছিলো। দস্তরখানে রকমারি খাবার সাজানো কিন্তু কোনো খাবারেই লাল মরিচ নেই। যেনো এ সফরে আজই

www.pathagar.com

আমাদের বিনা মরিচে খাবার শুরু হচ্ছে। অবশ্য তারা আমাদের ইন্দো-পাকিস্তানি রুচির প্রতিও লক্ষ্য রেখেছেন। আমাদের সামনে একটা ছোট প্লেটে বাটা মরিচ রাখা হয় যাতে আমরা নিজেরা যে খাবারে খুশি তা মিশিয়ে খেতে পারি। সব খাবারই তৈরি করা হয়েছে অত্যন্ত যত্ন সহকারে। আমাদের বাহরাইনী বন্ধুতো খুব তৃপ্তি সহকারে খাচ্ছিলেন। কিন্তু মরিচের অভাবে আমরা কোনো খাবারেই স্বাদ পাচ্ছিলাম না। আমরা কেবল ভাবছিলাম, এরা মরিচ ছাড়া খায় কি করে। যাই হোক আমরা বাটা মরিচ মিশিয়ে খাবার কিছুটা চেষ্টা করলাম। খাবার শেষে চা এলো, কিন্তু তাতে দুধ নেই। দুধ বিহীন চায়ের অভিজ্ঞতা বিগত সফরেও আমাদের হয়েছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা চা পান করতে রাজি হতাম না। আবার কোথাও সম্ভব হলে দুধ চেয়ে নিতাম। কিন্তু এখানে চা প্রত্যাখ্যান করা ভালো মনে হলো না। আরব দেশের লোকেরা চায়ে দুধ মিশাতে জানেইনা। এখানে এতো প্রচুর এবং ব্যাপক চা পান করা হয় যে, আমাদের দেশে দুধ মিশিয়েও খুব কম লোকই এতোটা চা পান করে থাকে। অবাক হওয়ার কথা, যে দেশে যতো গরম, সে দেশে ততো বেশি চা পান করে থাকে। ইরাকের প্রায় প্রতিটি লোক দৈনিক ১৫/২০ পেয়ালা চা পান করে থাকে। আর তাদের চা এতোটা কড়া হয় যে, আমার মতো লোক যদি সকালে এক পেয়ালা চা পান করে তাহলে তাকে রাত পর্যন্ত বালিশে মাথা দিয়ে পড়ে থাকতে হবে। ইরাকের পর হিজাজ এবং অন্যান্য দেশের স্থান। সিরিয়া এমন একটা দেশ, সেখানকার আবহাওয়া ঠাণ্ডা থাকলেও চা কিন্তু সেখানে খুব কমই পান করা হয়। পরিমাণ কম ছাড়াও তাদের চা এতোটা হালকা যে, ইরাকীরা বলে, এমন চা তো আমরা শিশুদের দিয়ে থাকি। খুব সম্ভব এ কারণে সিরিয়ার লোকদের স্বাস্থ্য খুব ভাল।

খাবার শেষে সকলে একটা বিরাট কক্ষে বসে পড়েন। বাইরে থেকেও লোকজন আসছিল। তাদের পরিকল্পনা ছিলো, বিভিন্ন বিষয়ে মাওলানাকে প্রশ্ন করা হবে, মাওলানা সেসব প্রশ্নের জবাব দেবেন। প্রশ্ন ছিলো সাধারণত পাকিস্তান, হিন্দুস্তান এবং কাশ্মীরের মুসলমানদের সম্পর্কে। কেউ কেউ ইসলামী দাওয়াতের ধরন-প্রকৃতি সম্পর্কেও প্রশ্ন করেন। এসব প্রশ্ন থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে তা হচ্ছে এই যে, নিজেদের দেশের অবস্থা দেখে যেহেতু ভালোর উপর মন্দের প্রভাব বিস্তার সম্পর্কে তাদের মনে তীব্র অনুভূতি জাগ্রত ছিলো, আর কিভাবে তারা গোটা মুসলিম জাহান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে- তাই ইসলামের জন্য কাজ করার বিপুল আগ্রহ ছিলো তাদের মনে। কেউ তাদেরকে সোজা পথে এনে দাঁড় করাবে, তারা কেবল সে অপেক্ষায়ই রয়েছে। তাই সেখানে কোনো দ্বীনী আলেমকে পেয়ে তারা তাকে অপ্রত্যাশিত নিয়ামত মনে করে। মাওলানা ধীরে সুস্থে এবং বিস্তারিতভাবে তাদের সব জিজ্ঞাসার জবাব দেন। হিন্দুস্তানের

www.pathagar.com

মুসলমানদের সম্পর্কে মাওলানা বলেন, তাদের অবস্থা ইসরাইলে আরবদের অবস্থার মতো। এ সংক্ষিপ্ত জবাবটি ছিলো অত্যন্ত ক্রিয়াশীল। এ উদাহরণ ছাড়া হিন্দুস্তানে মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে দীর্ঘ বক্তৃতা দিলে তাও এতোটা প্রভাবশীল হতো না। কেউ কেউ পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কেও প্রশ্ন করে। কিন্তু মাওলানা এসব প্রশ্নের কোনো জবাব দেননি। তিনি বলেন, পাকিস্তানের রাজনৈতিক প্রসঙ্গ করাচি বন্দরে আমানত হিসাবে রেখে এসেছি। দেশে ফিরে গিয়ে তা আবার গ্রহণ করবো । তাই এ প্রসঙ্গে আপনারা আমাকে কোনো প্রশ্ন করবেন না।

কোনো কোনো প্রশ্ন থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাবলীগ জামায়াত প্রভাবিত কিছু লোকও এখানে রয়েছেন, তাদের কথাবার্তা থেকে সাধারণ্যে এ ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, মাওলানা মওদূদী এবং তাবলীগ জামায়াতের মধ্যে কিছুটা বড় রকমের মতবিরোধ রয়েছে। মাসিক আল ফোরকানের নিবন্ধও এসব ধারণাকে প্রবল করেছে। এ সম্পর্কিত কোনো কোনো প্রশ্নের জবাবে মাওলানা বলেন, তাবলীগ জামায়াতের সাথে আমাদের কোনো বিরোধ নেই। নিজেদের বুদ্ধি এবং কর্মসূচী অনুযায়ী তারাও দীনের কাজ করছেন, আমরাও করছি। বর্তমান সময়ে বাতিল এতোটা প্রভাব বিস্তার করে আছে যে, দীনের কাজ করার জন্য দু'চারটি নয় বরং শত শত দলও যদি কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, তা-ও বেশি নয়। তাই এসব দলের মধ্যে শত্রুতার কোনো কারণ নেই। শত্রুতা তো তাদের মধ্যে হতে পারে, যাদের মানসিকতা দোকানদারসুলভ এবং যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয়, বরং নিজেদের স্বার্থ এবং নামের জন্য কাজ করে। মাওলানা তাদের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে বলেন, বর্তমানকালে যারা দীনের কাজ করছে, আপনারা তাদের সকলের বই-পুস্তক পাঠ করুন এবং তাদের কাজ দেখুন। এরপর যেদিকে আপনাদের মন চায়, তাদের সাথে মিলিত হয়ে নিষ্ঠার সাথে দীনের খেদমত করুন, কিন্তু শুধু শুধু দীনের অপর খাদেমদের পেছনে পড়বেন না।

প্রশ্নোত্তরপর্ব প্রায় দু'ঘন্টা অব্যাহত থাকে। রাত প্রায় ১২টা। লোকেরা নিজেরাই অনুভব করে, মাওলানা যেহেতু আজই সফর করে এসেছেন এবং তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত, তাই তাকে বিশ্রাম করতে দেয়া উচিৎ। এরপর আমরা হোটেলে ফিরে যাই।

পরদিন দুপুর পর্যন্ত আমরা বাজারে সফর সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কেনা-কাটায় ব্যস্ত ছিলাম। গোটা বাজার ছিলো খুব সাজানো-গুছানো। বিদেশ থেকে বিশেষ করে ইংল্যান্ড এবং জাপান থেকে আমদানীকৃত পণ্যে বাজার ছিলো ভরা। প্রয়োজনীয় পণ্যতো দূরের কথা, এমন কোনো বিলাসদ্রব্য নেই যা এখানকার বাজারে পাওয়া যায় না। আর দামও অবিশ্বাস্য সস্তা। শুনেছি বিদেশ থেকে আমদানীকৃত পণ্যের উপর এখানে শুল্ক আরোপ করা হয় শতকরা মাত্র দুভাগ। অথচ সৌদি আরবেও

www.pathagar.com

এ শুল্ক ধার্য করা হয় শতকরা ত্রিশভাগ। তাই বিদেশী পণ্য এখানে সৌদি আরবের চেয়েও সস্তা। আমাদের বন্ধু ইসমাইল খান বলেন এবং পরে খোবার পৌঁছে আমাদের নিজেদেরও অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, বাহরাইনে যে পণ্যের দাম এক টাকা, খোবার এবং যাহরানে তার দাম হবে কমপক্ষে দেড় টাকা, আর মক্কা ও জেদ্দায় অন্তত এক টাকা পঁচিশ পয়সা। তাই সৌদি আরব থেকে যারা বাহরাইনে আসে বা বাহরাইন হয়ে যারা সৌদি আরব যায় তারা প্রয়োজনীয় জিনিস বাহরাইন থেকেই কিনে নেয়।

বাজারে মহিলাদের খুব কমই চোখে পড়ে। আর যা চোখে পড়ে, তাদের অধিকাংশই বোরকা পরিহিতা। শুনেছি এখানকার মহিলাদের মধ্যে এখনও পর্দহীনতা ও নির্লজ্জতা ছড়ায়নি। অবশ্য কিছুসংখ্যক নারীর দেহে আলো লাগা শুরু করেছে। তারা স্বচ্ছ ঝিলিমিলি কালো নেকাব পরা শুরু করেছে, যা থেকে চেহারা স্পষ্ট দেখা যায়। অন্যরা অবশ্য মোটা নেকাব পরে। কিন্তু অধুনা মিসরীয়, লেবাননী এবং সিরীয় নারীদের বদৌলতে এরাজ্যেও পাশ্চাত্যের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। আর উচ্চ শ্রেণীর নারীরা সবদিক থেকে মেম সাহেবা বনে বসেছে। পুরুষদের মধ্যেও স্যুট-কোট পরিহিত লোক খুব কমই নজরে পড়েছে। সকলে না হলেও বেশির ভাগ লোককে দেখেছি লম্বা জামা আর মাথায় রুমাল জড়িয়ে বাজার করছে। দোকানদার আর অফিসের চাকুরীজীবিদেরও একই অবস্থা। শুনেছি চিরাচরিত পোশাকেই তারা ফ্যাশানপ্রিয়তা জাহির করতে চায়। যেমন নওজোয়ানদের দেখেছি রেশমী জামা এবং মাথায় হালকা-পাতলা রুমাল ব্যবহার করতে। সৌখিন ব্যক্তিরা লম্বা জামার উপর কোটও পরেন। প্রথম প্রথম এটা আমাদের কাছে খুব খারাপ লেগেছে। যাই হোক, আনন্দের বিষয় যে, এরা এখনও অন্তত পোশাকে পাশ্চাত্য প্রভাবমুক্ত রয়েছে। যদিও তাদের লম্বা জামা দেখে মাওলানা অবাক হয়ে বলেন, এ লম্বা জামা পরে এরা কাজ করে কিভাবে? তাদের নারীদের বোরকাও এক আশ্চর্য ধরনের। তাদের বোরকাগুলো খুব ভারি এবং নাকের উপর এক ধরনের লাগাম লাগানো থাকে। মাওলানা একদিন বলেন, আরবদের কি বিস্ময়কর অবস্থা! হয় তারা নিজেদের সেই পুরাতন লেবাস পরবে, তা আর যাই হোক অন্তত এ যুগে খাপ খাওয়ানো যায় না, আর না হয় তারা একেবারেই ছুটে চলবে পাশ্চাত্য পোশাকের প্রতি। আমাদের দেশে যেহেতু যুগের গতির সাথে পোশাকেও সর্বদা পরিবর্তন হচ্ছে, তাই আমাদের দেশের লোক এর সাথে তাল মিলাতে পারে এবং এখনও মিলিয়ে চলছে।

বিকালে আমরা ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহ দেখতে বের হই। মানামা থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে পর্তুগীজদের নির্মিত, একটি পুরাতন দুর্গ আছে। দুর্গটি আনুমানিক খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকে নির্মিত, যখন তারা পারস্য উপসাগর থেকে

www.pathagar.com

আরবদের বিতাড়িত করছিল। এখন দুর্গটির কেবল ধ্বংসাবশেষ বর্তমান রয়েছে। মূল দুর্গটি ধ্বংস হয়ে গেছে। এর পাশেই রয়েছে একটা পুরাকীর্তি ভবন। কিন্তু সেখানে নাম ছাড়া আর কিছুই নেই। শুনেছি কয়েক বছর আগে ডেনমার্কের পুরাকীর্তি বিভাগের একটি দল এ দুর্গ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য এসেছিলেন। তারা দুর্গের ভেতরে বাইরে খনন কার্য চালিয়ে ফিনিকীদের শাসনামলের একটি প্রাচীন গ্রাম আবিষ্কার করেছেন।

কেল্লার পথে একটি মসজিদ রয়েছে। স্থানীয় লোকেরা জানায়, এটা হযরত খালিদ ইব্নে অলীদের (রা.) সময়ের মসজিদ। এদের কথা কতটুকু নির্ভরযোগ্য, বলা মুশকিল। ফেরার পথে কেল্লার নিকটে একটা স্থান দেখতে পাই, যাকে স্থানীয় লোকেরা বলে ইয়াবুর। এটা খেজুর বাগানের ভেতরে খেজুরের ঝুপড়ির একটা বস্তি। গরমের মৌসুমে শহরের পাকা দালান কোঠা যখন ভীষণ গরম হয়ে যায়, তখন লোকজন শহর ছেড়ে এখানে এসে বসবাস করে।

মাগরিবের পর আমরা এক পাকিস্তানি বন্ধুর বাসায় যাই। সেখানে আরও আরব এবং পাকিস্তানি উপস্থিত ছিলেন। খাওয়া দাওয়া শেষে এশার নামায আদায় করি। এরপর শুরু হয় প্রশ্নোত্তরের পালা। আজকের সকল প্রশ্ন একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে। আর তা হচ্ছে এ যুগে কিভাবে ইসলামী দাওয়াতের কাজ করতে হবে। প্রথম দিনের তুলনায় আজকের প্রশ্নগুলো ছিলো অনেকটা সুচিন্তিত এবং বুদ্ধিদীপ্ত। আর যারা এসব প্রশ্ন করছিল, তারাও ছিলো অনেকটা শিক্ষিত লোক। কাজের জন্যও তাদের আগ্রহ প্রচুর। অবশ্য তাদের অনেককেই হতাশার শিকার মনে হচ্ছিল। মাওলানার জবাব শুনে এরা অনেকটা আশাবাদী হয়। রাত ১১টা পর্যন্ত প্রশ্নোত্তরের পালা চলে। এরপর আমরা হোটেলে ফিরে যাই।

বাহরাইনের সাধারণ অবস্থা

আমি আগেই বলেছি, বাহরাইন হচ্ছে তিনটি ক্ষুদ্র দ্বীপের সমষ্টি। আয়তন চারশত বর্গমাইল। এগুলোর মধ্যে বড় দ্বীপটি দুই মাইল দীর্ঘ এবং প্রায় ১২ মাইল প্রস্থ। মোট জনসংখ্যা ১ লাখ ৭০ হাজার। গোটা দ্বীপটি ফাঁকা মাঠ। এখানে কোনো উঁচু পাহাড় নেই। কেবল একটা টিলা আছে, যাকে বলা হয় এখানকার সর্বোচ্চ পাহাড়। এর নাম জাবালুদ দোখান- ধোঁয়ার পাহাড়। উচ্চতা ৪৫০ ফুট। আজ থেকে দশ বছর আগে এখানে খেজুর ছাড়া আর কিছু হতো না। তখন বাহরাইন ছিলো একটা ক্ষুদ্র গরীব রাজ্য। কিন্তু পেট্রোল আবিষ্কারের পর দেশের ভাগ্য পরিবর্তন হয়েছে। শুনেছি, বর্তমানে এখানে পেট্রোলের মোট কূপের সংখ্যা ৪২০টি।

গ্রামাঞ্চলে শিয়াদের সংখ্যাই বেশি। ব্যবসা বাণিজ্যের সিংহভাগ শিয়াদের হাতে। আর শিয়ারা ইরানপন্থী। বাহরাইন সম্পর্কে ইরানের যে দাবি তাতে এখানে ইরানের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। ফারসি ভাষী লোকের সংখ্যাও নেহাত কম নয়।

www.pathagar.com

এরা সকলেই শিয়া। সম্ভবত ইরানের বিজয় যুগে এরা এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছে। হোটেলের মালিক এবং শ্রমিকতো এরাই। সুন্নীদের অধিকাংশই শাফেয়ী মতাবলম্বী। কিন্তু সরকারি মযহাব মালেকী। কারণ, শাসক শ্রেণী মালেকী মযহাবের অনুসারী।

এখানে রয়েছে ইংরেজদের কড়া নিয়ন্ত্রণ।[১] শাসন দণ্ড তাদেরই হাতে। আর শেখ কেবল নামকা ওয়াস্তে। কোম্পানীর কাছ থেকে তারা যে রাজস্ব পায়, তা নিয়ে তারা মগ্ন। আরাম আয়েশে ডুবে রয়েছে। রাজস্ব এবং তার পরিমাণ বৃদ্ধি ছাড়া আর কিছুতেই তাদের তেমন মাথা ব্যথা নেই।

নাগরিক অধিকার বলতে কিছুই নেই। এখানে কেবল রাজনৈতিক দলই নিষিদ্ধ নয়, বরং সীমিত অর্থে ধর্মের জন্যও সমষ্টিগতভাবে কোনো কাজ করা যায় না। সরকারের অনুমোদন না নিয়ে জুমার দিন কোনো খতীব খোতবা দিতে পারেন না। গোপন পুলিশের কঠোর ব্যবস্থা হয়েছে। কারো কথা বা লেখায় স্বাধীনতার সামান্যতম গন্ধ পাওয়া গেলে তৎক্ষণাৎ তাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়। এজন্য একজন অপরজনের সাথে কথা বলতে ভয় পায়। আমরা দেখেছি, যারা হোটেলে আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন, তারাও একসঙ্গে আসেননি। বাজারেও দলবদ্ধভাবে কেউ চলাচল করে না।

এখানে শ্বেতাঙ্গদের জন্য একটা স্বতন্ত্র এলাকা রয়েছে। যাকে বলা হয় আওয়ানী। এখানে আরব জাতীয়তাবাদের ধুয়া দিন দিন মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। এর ফলে অমুসলিম আরবদের চেয়েও অনারব মুসলিমদের বেশি হিংসার চোখে দেখা হয়। এখানে পাকিস্তানি মুসলমানদের সংখ্যা কয়েক হাজার। কিন্তু আরবদের শ্রেণী বিদ্বেষের ফলে এ সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। আরবদের তরফ থেকে তেল কোম্পানীর উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে, তারা যেনো অনারব কর্মচারী না রাখে। আগে থেকে যেসব অনারব কর্মচারী রয়েছে, তাদের যেনো অতি শীঘ্র বিদায় দেয়া হয়। বলা হয়ে থাকে, পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে এ বিদ্বেষ বিস্তারে মিসরীয় অপপ্রচারের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

বাহরাইনের মূলভাষা আরবি। এখন সরকারিভাবে ইংরেজি ভাষা চেপে বসেছে। কিন্তু উর্দু-ফার্সীর প্রচলনও কম নয়। উর্দু-ফার্সি অনেক শব্দ স্থানীয় লোকেরা এমনভাবে ব্যবহার করে, এটা যেনো তাদের নিজেদের ভাষার শব্দ। ফার্সি জানা লোকের তো কোনো অসুবিধাই নেই। কেবল উর্দু জানা লোকও সেখানে গেলে কাজ-কর্ম চালাতে কোনো অসুবিধা হবেনা। #

---

১. মনে রাখতে হবে এটা ১৯৫৯ সালের কথা। - সম্পাদক

www.pathagar.com

৪

যাহ্‌রান-খোবার-দাম্মাম

১০-১৮ নভেম্বর ১৯৫৯

বাহরাইন থেকে খোবার

১০ নভেম্বর ভোরে আমাদের বাহরাইন থেকে খোবার (সৌদি আরব) রওয়ানা হওয়ার কথা। বাহরাইন থেকে প্রতি দু'ঘণ্টা অন্তর একখানা বিমান যাহরানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে এবং মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে সেখানে পৌছে। বিমানটি খুব ছোট, মাত্র ১০/১২টি আসন। মাওলানা রসিকতা করে বলেন, এ-তো জাহাজ নয়, যেন কবুতর, বাহরাইন থেকে উড়ে আর যাহরান গিয়ে নামে। ভাড়া ৩৩ টাকা। এক একজন যাত্রী ২০ কিলো (প্রায় ২৬ সের) মাল বহন করতে পারে। এর অতিরিক্ত মালের জন্য ভাড়া দিতে হয়। আমাদের সাথে মাল-সামান যেহেতু বেশি ছিলো, তাই সিদ্ধান্ত হয়, মাওলানা ইসমাইল খানের সাথে বিমানে যাবেন আর আমি জিনিসপত্র নিয়ে লঞ্চ যোগে যাবো। আমি নবাগত বিধায় বাহরাইনের জনৈক আরব বন্ধু আমার সাথে যেতে প্রস্তুত হলেন। মাওলানা সকাল সাড়ে সাতটায় বিমান যোগে রওয়ানা হন আর আমি বাহরাইনের বন্ধুসহ সবকিছু নিয়ে বন্দরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। বন্দরে আমার পাসপোর্টে বাহরাইন ত্যাগের সীল পড়ে। এরপর আমরা মাল-সামান নিয়ে লঞ্চে আরোহণ করি। লঞ্চের ভাড়া মাথাপিছু ৬ টাকা। দুপুর বারটার দিকে লঞ্চ ছাড়ে। বাহরাইন থেকে খোবারের দূরত্ব প্রায় ২৫ মাইল। লঞ্চ খোবার পৌছতে সাধারণত চার ঘণ্টা লাগে। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য যে, আজ বাতাস অনুকূল থাকায় আমরা মাত্র আড়াই ঘণ্টায় খোবার পৌছি। সমুদ্র এতো শান্ত ছিলো যে, লঞ্চ থেকে সমুদ্রের তলদেশ স্পষ্ট দেখা যায়। খোবার যাওয়ার পথে আমরা বাহরাইনের তৃতীয় দ্বীপটিও দেখতে পাই। দ্বীপটি অতি ক্ষুদ্র এবং এখানে কোনো জনবসতি নেই।

বাহরাইনের নিকট সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চলীয় সমুদ্রতীরে ৩টি বন্দর আছে- খোবার, দাম্মাম এবং রাস তানুরা। খোবার একটি ছোট বন্দর। এ বন্দর পথে যাত্রীরা শুধু বাহরাইন যাতায়াত করে। খোবার থেকে দশ বারো মাইল দক্ষিণে দাম্মাম। এটা বড় বন্দর। মালবাহী জাহাজ এই বন্দরে ভেড়ে। এখানে যেহেতু

www.pathagar.com

বন্দরের নিকটে সমুদ্র গভীর নয়, তাই বন্দর থেকে তিন চার মাইল দূরে জাহাজ ভেড়ে। আর সেখান থেকে লঞ্চ যোগে মালামাল বন্দরে আনা নেওয়া হয়। কিন্তু সৌদি সরকার বর্তমানে সমুদ্রগর্ভে পাথর ঢেলে ১৩ মাইল দীর্ঘ একটি সড়ক নির্মাণ করেছে এবং তার উপর রেল লাইনও বসিয়েছে। কারো কারো মতে দাম্মাম এশিয়ার সবচেয়ে বড় বন্দরে পরিণত হয়ে গেছে। দাম্মাম থেকে প্রায় তিরিশ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে রাস তানুরা বন্দর অবস্থিত। এ বন্দরে তৈলবাহী জাহাজ ভেড়ে। আরামকোর তেলের বিরাট অংশ এ বন্দরেই জাহাজ বোঝাই হয়ে বিদেশে যায়।

আমরা দু'টার দিকে খোবার পৌঁছি। কিন্তু প্রায় তিনটা পর্যন্ত আমাদেরকে লঞ্চে আটকে পড়ে থাকতে হয়। কারণ, বন্দরে যে কেরাণীর ডিউটি ছিলো, তিনি বাইরে কোথাও গিয়েছেন। তার ফিরে আসার আগ পর্যন্ত কোনো যাত্রীকেই লঞ্চ থেকে নামতে দেয়া হয়নি। আর আমাকে নিয়ে একটা মজার কাণ্ডও ঘটেছে। আমার যেহেতু পাকিস্তানি পাসপোর্ট ছিলো, তাই আমাকে বলা হয়, আজকের গাড়ি যেহেতু ছেড়ে গেছে এজন্য আগামীকাল গাড়ি আসা পর্যন্ত বন্দরেই অবস্থান করো। কারণ, যেসব অ-সৌদি যাত্রী মক্কা মুয়ায্যমা যাবার জন্য খোবারের পথে আগমন করে, তাদের শহরে অবস্থানের অনুমতি নেই। ভালই হয়েছে, আমি মাওলানার কাছ থেকে সৌদি রাষ্ট্রদূতের চিঠিখানা রেখে দিয়েছিলাম। সীমান্ত অফিসারদের নামে এ চিঠি তিনি আমাদের হাতে দিয়েছিলেন। আমি তাকে চিঠিখানা দেখালে তার কঠোরতা কোমলতায় পরিণত হয়। এবং তিনি বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেন। তিনি আমার কাছ থেকে ৫০ রিয়াল ফিসও আদায় করেন। সৌদি আরব প্রবেশকালে অ-সউদীকে এই ফিস দিতে হয়। আমাকে নেয়ার জন্য এসেছিলেন রাও মুহাম্মদ আখতার সাহেব। তার কাছে জানতে পারলাম, বিমান বন্দরে মাওলানার কাছ থেকে এ ফিস আদায় করা হয়েছে। কাস্টমস্ চেকিং-এ আমার কোনো অসুবিধা হয়নি। যদিও আমার সাথে কিছু কিতাবপত্র ছিলো। এর অধিকাংশই তাদের ভাষায় ছিলো ধর্মীয় বইপুস্তক। অবশ্য শুল্ক কর্মকর্তা এগুলোকে সন্দেহের চোখে দেখেননি। কারণ দু'একটি কিতাব দেখে তার ধারণা হয়েছে, আমিও বুঝি সালাফী আকীদার লোক। তাই কড়াকড়িভাবে তল্লাশী করা তিনি দরকার মনে করেননি। আর কিতাবগুলো নিয়েই আমার ভয় ছিলো সবচেয়ে বেশি। কারণ, বিগত সফরে (১৯৫৬ সালে) কিতাবের তল্লাশী নিয়ে জেদ্দা বিমান বন্দরে আমাদের যে অস্থিরতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তা এখনও আমার মনে আছে। দুনিয়ার অন্যান্য দেশে ধর্মীয় বই পুস্তক বাদে অন্যান্য বই খুব যাচাই-বাছাই করা হয়, কিন্তু ধর্মীয় বই নিয়ে আপত্তি-বিপত্তি হয়না। সৌদি আরবের ব্যাপার তার উল্টো। এখানে অন্যান্য বইকে কোনো গুরুত্বই

www.pathagar.com

দেওয়া হয়না। কিন্তু ধর্ম এবং বিশেষ করে আকায়েদ সংক্রান্ত বইকে অত্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখা হয়। অনেক সময় শুল্ক কর্মকর্তারা এসব বই সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে না পেরে আলিমদের নিকট প্রেরণ করেন। অর্থাৎ আলিমরা যতক্ষণ এসব বই আপত্তিকর নয় বলে রায় না দেন, ততক্ষণ সেগুলো দেশের ভেতরে নিয়ে যেতে দেয়া হয় না।

রাও মুহাম্মদ আখতার সাহেবের এক বন্ধু হারুন সাহেব তার গাড়ি নিয়ে এসেছেন। কাস্টমস্ এর চক্কর থেকে রক্ষা পেয়ে আমরা রাও সাহেবের বাড়ি পৌঁছি। গিয়ে দেখি, দর্শনার্থীদের ভিড়। এদের মধ্যে কতিপয় আরবও ছিলেন। কিন্তু অধিকাংশই পাকিস্তানি। এরা আরামকোতে চাকুরী করেন। এরা সকলে এক জায়গায় থাকেন না, কেউ খোবারে থাকেন, কেউ যাহরানে আর কেউবা থাকেন দাম্মামে। আবার কেউ থাকেন রাস তানুরায়, কেউ কেউ বুকাক, আর কেউবা থাকেন অন্য স্থানে। আরামকোয় চাকুরীরত পাকিস্তানিদের সংখ্যা প্রায় এক হাজার। এ সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। কারণ, এখানেও কোম্পানীর উপর নির্দেশ দেয়া হচ্ছে বিদেশীদের তাড়াতাড়ি বিদায় দিয়ে তাদের স্থলে সৌদি আরব বা অন্য কোনো আরব দেশের লোক নিয়োগ করার জন্যে। আরব জাতীয়তাবাদের প্রভাবে সরকারের দৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি অগ্রগণ্য হচ্ছে সৌদি নাগরিক, তারপর অন্য আরবদেশ এবং সব শেষে দুনিয়ার অন্যান্য দেশের লোক। তাদের মধ্যেও মুসলিম-অমুসলিমের কোনো পার্থক্য নেই। এ নীতির ফলে ধারণা করা হচ্ছে, ১৯৬৩ সাল নাগাদ সকল পাকিস্তানিকে চাকুরীচ্যুত করা হবে। সৌদি সরকার ছাত্রদের ইংরেজি এবং কারিগরী শিক্ষা দিয়েছেন। অবশ্য বিদেশীদের তাড়িয়ে সবকাজ নিজেরা করবে- এমন সময় আসতে এখনও অনেক দেরি আছে। সহসা এমনটা আশা করা যায় না।

মহল্লার মসজিদে আমরা মাগরিবের নামায আদায় করি। নব-নির্মিত সাদাসিদে মসজিদটি প্রশস্ত এবং সুদৃশ্য। জানা যায়, সৌদি সরকার খোবার, দাম্মাম, যাহরান, রাসতানুরা এবং বুকাইক এর সকল বস্তি এবং কোম্পানীর কর্মচারীদের আবাসিক এলাকায় এ ধরনের মসজিদ নির্মাণ করছে এবং এর সমুদয় ব্যয়ভারও সরকার বহন করছে। আরব দেশের মসজিদে আমাদের দেশের মতো অযুর ব্যবস্থা নেই। সকলে নিজ নিজ বাসস্থান থেকে অযু করে মসজিদে আসে। আরব দেশের লোকেরা জুতা পরে বিনা বাধায় মসজিদে প্রবেশ করে। শুধু নামায পড়ার সময় জুতা খুলে রাখে। অনেকে তো নামায পড়ার সময়ও জুতা খুলেনা, জুতা পায়ে দিয়েই নামায পড়ে। এ কাজটি সকল আরব দেশে সমভাবে প্রচলিত থাকলেও সৌদি আরবে বিশেষ করে নজদের অধিবাসীরা এ ব্যাপারে খুব বেশি বাড়াবাড়ি করে। এটা সত্য যে, জুতা পায়ে দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা জায়েয।

www.pathagar.com

নবী (স) এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা.) অধিকাংশ সময় মসজিদে জুতা পায়ে দিয়ে নামায পড়েছেন। কিন্তু এমনটি তারা করেছিলেন প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং অসুবিধার কারণে। মসজিদের মেঝে যদি পাকা না হয় বা রোদে খুব গরম হয়ে যায়, তখন জুতা পায়ে দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা এবং নামায পড়া যায়। কিন্তু যেখানে মসজিদের মেঝে পাকা এবং উন্নতমানের জায়নামায বিছানো, সেখানে জুতা পায়ে দিয়ে মসজিদে ঢোকা এবং জুতা পায়ে দিয়ে নামায পড়া শুধু শুধু বাড়াবাড়ি ছাড়া কিছুই নয়। অন্যদিকে আমাদের দেশে সর্বাবস্থায় জুতা পরে মসজিদে প্রবেশ করা এবং নামায পড়াকে মসজিদের সম্মানের পরিপন্থী কাজ মনে করা হয়। এমনকি কেউ যদি মাঠে-ময়দানেও জুতা পরে নামায পড়ে, তাতেও অত্যন্ত আপত্তি করা হয়। অথচ মধ্যপন্থা হচ্ছে এ দুয়ের মাঝখানে।

মসজিদের ইমাম ছিলেন নজ্‌দের এক নওজোয়ান। অতিসম্প্রতি তিনি রিয়াদের কোনো একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করে এসেছেন। তিনি নামায পড়াবার জন্য দাঁড়িয়েছেন। তাকবীরে তাহরিমার আগে পকেট থেকে মিসওয়াক বের করে দাঁতন করে নিলেন। আর ঐ অবস্থায় মিসাওয়াক পকেটে রেখে নামায পড়াতে দাঁড়িয়েছেন। নামায এতো দ্রুত পড়ালেন যে, তার সাথে তাল মিলানো আমাদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়ে। এমন শুষ্ক এবং অশুদ্ধ কুরআন পাঠ করলেন যে, তা শুনে আমরা মনে খুব ব্যথা অনুভব করলাম। মাওলানার উক্তি অনুযায়ী আমাদের দেশের পাড়া গাঁয়ের মোল্লারাও এর চেয়ে ভালোভাবে কুরআন পড়েন এবং ধীরস্থিরভাবে নামায পড়াতে পারেন। আমাদের পাকিস্তানি বন্ধুরা জানান, এই ইমাম সাহেব তো কুরআন মজীদ অনেক ভালই পড়েন। এখানের অন্যান্য মসজিদের অবস্থা তো আরো করুণ। মিসর, সিরিয়া এবং ইরাকের লোকেরা তো কুরআন মজীদ পাঠ করে কাওয়ালির মতো টেনে টেনে। আর নাজদী হযরতদের অবস্থা এই যে, তাদের বড় বড় আলিমরা পর্যন্ত ছহীহ-শুদ্ধ করে কুরআন মজীদ পাঠ করাকে যেন বিদআত মনে করেন। নাজদী হযরতদের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা নামাযে ধীরস্থিরভাবে দাঁড়ান না। তারা নামাযে দাঁড়িয়ে কখনো কাপড় ঠিক করেন, আবার কখনোবা তাদের মনে পড়ে যায়, তার তো জামার বোতাম লাগানো হয়নি, তাই বোতাম লাগাবার কাজে লেগে যান। আবার কখনো মনে পড়ে, তার মাথার রুমালটা বাঁকা হয়ে গেছে। তাই তিনি রুমাল ঠিক করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এমনকি কেউ কেউ তো নামাযে দাঁড়িয়ে ঘড়িতে সময় দেখাও কোনো দোষ মনে করেন না। এগুলো আমাদের জন্য নতুন কিছু ছিলো না, আমরা ইতিপূর্বেও এসব প্রত্যক্ষ করেছিলাম। বর্তমান সফরে যেহেতু প্রথমবারের মতো বারবার এসব প্রত্যক্ষ করছি, তাই খুব খারাপ লাগছিল। মাওলানা তো অনেক রাত পর্যন্ত বারবার এদের কথাই বলছিলেন।

www.pathagar.com

রাস তান্নুরা

পরদিন ১১ নভেম্বর বাদশাহ সউদের সিংহাসন আরোহণ বার্ষিকী। এ উপলক্ষে সমস্ত কর্মচারীকে তিন দিন ছুটি দেয়া হয়। ছুটির সময় মাওলানাকে পেয়ে তারা আনন্দিত। তারা আমাদের সাক্ষাত বা বলা চলে ভ্রমণের রীতিমতো একটা প্রোগ্রামও তৈরি করেছে। তাদের প্রোগ্রাম অনুযায়ী আমরা ১১ নভেম্বর সকাল নয়টায় রাস তান্নুরা যাই। রাস তান্নুরা খোবার থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থিত একটা বন্দর। আরামকোর তেলের বিরাট অংশ এ বন্দর দিয়েই বিদেশে রপ্তানী করা হয় জাহাজ বোঝাই করে। আরামকোর সবচেয়ে বড় তৈল শোধনাগারও এখানেই অবস্থিত। খোবার থেকে রাস তান্নুরা পর্যন্ত চমৎকার পাকা রাস্তা। রাস্তাটি কোম্পানীর তৈরি। রাস্তার পাশে মোটা মোটা পাইপ লাইনও নজরে ছিলো। এসব পাইপ লাইনের মাধ্যমে যাহরান এবং অন্যান্য এলাকা থেকে শোধনাগারে তেল আসে শোধনের জন্য। পথে একটা গ্রাম চোখে পড় ছিলো। আমাদের সাথীরা জানালেন, কথিত আছে, এখানে হযরত 'ইয়াসা' আলাইহিস সাল্লামের কবর রয়েছে। কিন্তু এখানে তাঁর কবর হওয়ার কোনো কারণ আমরা খুঁজে পাইনি। কারণ তিনি ছিলেন বনী ইসরাইল বংশের নবী, ফিলিস্তিন অঞ্চলে ছিলো তাঁর নিবাস।

রাস তান্নুরা পৌঁছে দেখি, পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের অনেক শ্রমিক কর্মচারী কোম্পানীর কোয়ার্টারের একস্থানে সমবেত হয়েছেন। শ'দুয়েক শিক্ষিত নওযোয়ানও উপস্থিত। এরা সকলেই মাওলানার আগমনের প্রতীক্ষায় ছিলেন। সালাম-কালাম এবং পরিচয় পর্ব শেষে শুরু হয় প্রশ্নোত্তরের পালা। এ অনুষ্ঠান চলতে থাকে শোয়া দশটা থেকে পৌনে একটা পর্যন্ত। প্রায় সকল প্রশ্নই ছিলো গাম্ভীর্যপূর্ণ এবং একাডেমিক। মনে হচ্ছিলো, মাওলানা যেন 'মুডে' এসেছেন। ধীরে সুস্থে প্রশ্নগুলোর বিস্তারিত জবাব দিচ্ছিলেন। বেশিরভাগ প্রশ্ন ছিলো সুদ, যাকাত, জন্মনিয়ন্ত্রণ, অস্ট্রেলিয়া থেকে আমদানীকৃত টিনজাত গোশ্ত ও কারেন্সী সম্পর্কিত। তাদের সবগুলো প্রশ্নই ছিলো সত্যি সত্যিই প্রয়োজনীয় এবং সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু যে সমস্যাটি তাদের সবাইকে অস্থির করে তুলছিলো, তা ছিলো গোশতের সমস্যা। কোম্পানীর আরব কর্মচারীরা অস্ট্রেলিয়া থেকে আমদানীকৃত টিনজাত গোশত নির্দ্বিধায় ভক্ষণ করে। তারা এতে কোনো দোষ মনে করে না। কোম্পানীর ক্যান্টিনে শুকরের গোশ্তের যে টিন বিক্রি হয়, তা অন্যান্য গোশতের কৌটার সাথে একই সঙ্গে রাখা হয় এবং তাতে শুধু ইংরেজিতে Pork লেখা থাকে। কেউ কেউ তো জেনে শুনেই এইসব কৌটা ক্রয় করে। কিন্তু অনেকেই ইংরেজি না জানার কারণে, আবার জানলেও অর্থ না বুঝার কারণে ভুল করে তা ক্রয় করে এবং শুকরের গোশত খায়। আমদানীকৃত এসব গোশত

www.pathagar.com

যেহেতু স্থানীয় গোশতের তুলনায় দামে অনেক সস্তা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নও তাই বিক্রিও হয় বেশি। মাওলানা তাদের সত্যিকার মাসআলাটা বুঝিয়ে দেন এবং ওয়াদা করেন, সুযোগ হলে বিষয়টির প্রতি তিনি রিয়াদের আলিম সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।

দেড়টার সময় আমরা সেখানে কোয়ার্টারের মসজিদে যোহরের নামায আদায় করি। মসজিদের ইমাম একজন পাকিস্তানি পাঠান। পাকিস্তান থেকে তাকে আনা হয়েছে এই মসজিদের ইমামতির জন্য। সোয়া তিনটা থেকে সোয়া চারটা পর্যন্ত আবার চলে প্রশ্নোত্তরের পালা। এবার প্রশ্ন ছিলো সুন্নাত, মে'ইয়ারে হক (সত্যের মানদণ্ড) শয়তানের নিগুঢ় তত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে। আসরের নামায শেষে চা-নাস্তা সেরে আমরা যে স্থানটি দেখতে যাই, সেখান থেকে জাহাজে তেল বোঝাই করা হয়। সমুদ্রে তখন বেশ কয়েকটি বিদেশী জাহাজ জাপান, আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশের। তখন পাইপ দিয়ে জাহাজে তেল বোঝাই করা হচ্ছিল আর অন্য জাহাজগুলো অপেক্ষায় ছিলো। নিকটেই ছিলো রিফাইনারী। আমরা ভেতরে যেতে পারিনি। কিন্তু বাইরে থেকে তা ভালোভাবেই দেখা যাচ্ছিল। আর আমাদের সঙ্গীরা দূর থেকেই ইশারা করে আমাদের অনেক কিছু বুঝাচ্ছিলেন। অনেক স্থানে দেখলাম, মাটিতে আগুন জ্বলছে। আমাদের সাথী জানালেন, পেট্রোলের সাথে একপ্রকার গ্যাস থাকে। পেট্রোল শোধনের পর এসব গ্যাস অর্থহীন ভেবে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। কোম্পানী বর্তমানে ইনজেকশনের মাধ্যমে গ্যাস পুন প্রবেশ করানোর পন্থা উদ্ভাবন করেছে। এর ফলে একদিকে তেলের নিম্নমুখী চাপ বহাল থাকবে অপর দিকে তেল শেষ হওয়ার পরবর্তী পর্যায়ের জন্য গ্যাস সংরক্ষিত থাকবে। এ গ্যাস পাকিস্তানে আবিষ্কৃত সুই গ্যাসের মতো। মাওলানা জানালেন, ১৯৫৬ সালে হজ্জ থেকে ফেরার পথে রাতের বেলা তাঁর বিমান যখন যাহরানের নিকট পৌঁছে, তখনও তিনি স্থানে স্থানে এরকম গ্যাস জ্বলতে দেখেছেন।

স্থানীয় একটি মসজিদে মাগরিবের নামায আদায় করে আমরা যাহরানের পথে খোবার যাত্রা করি। খোবার থেকে যাহরানের দূরত্ব তিন-চার মাইল। আরব-আমেরিকান অয়েল কোম্পানী আরামকোর সদর দফতর যাহরানে অবস্থিত। এখানে কোনো শহর নেই, নেই কোনো বাজারও। এখানে কেবল কোম্পানীর সদর দফতর এবং কর্মচারীদের বাসস্থান আছে। কর্মচারীরা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যাহরান বা দাম্মাম থেকে ক্রয় করে। রাতের বেলা যাহরানকে খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। উন্নত রাস্তা ঘাট আর ইমরত আর তার উপর পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা। এসব দেখে কেউ এটা কল্পনা করতে পারবেনা যে, তেল উত্তোলনের আগে এখানে ছিলো কেবল ধূধূ বালির স্তূপ। এখন যাহরানকে নিউইয়র্কের একটা টুকরা বললে বেশি বলা হবে না।

www.pathagar.com

রাও সাহেবের বাসায় ফিরে দেখি, চৌধুরী গোলাম মুহাম্মদ সাহেব একটি কক্ষে শুয়ে আছেন। মাওলানা রসিকতা করে জিজ্ঞেস করেন, এ আবার কোন্ চোর ঘরের মালিকের অনুমতি না নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেছে? চৌধুরী সাহেব জানালেন, দুপুরে এখানে এসে দেখি, বাসা খোলা পড়ে আছে। ভেতরে কেউ নেই। আমি নিশ্চিন্তে ঘরে ঢুকেছি এবং একটি কক্ষে শুয়ে পড়েছি। চৌধুরী সাহেবের তখন ভীষণ মাথাব্যথা। তিনি সর্দি-কাশিতে ভুগছিলেন। তিনি গতকাল কুয়েত থেকে রওয়ানা করেন। কুয়েত এবং সৌদি আরবের সীমান্তে উন্মুক্ত আকাশের নিচে মাটিতে বিছানা পেতে তাঁকে রাত কাটাতে হয়েছে। যাই হোক, তিনি এসে আমাদের সাথে মিলিত হওয়ায় আমরা আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করি। তিনি একটা ক্যামেরাও সাথে করে এনেছেন। কুয়েতে অবস্থানকালে তিনি তা ব্যবহারও করেছেন। এবার আমরা নিশ্চিত হয়েছি এই ভেবে যে, আগামীতে আমরা যেখানে যাবো, ছবিও তুলতে পারবো।

আমরা রাও সাহেবের কাছে ঘর খোলা রেখে যাওয়ার কারণ জানতে চাইলে তিনি জানান, আমরাতো অধিকাংশ সময় এভাবে ঘর খোলা রেখে বাইরে চলে যাই। সারাদিন বাইরে কাটিয়ে রাতে যখন ঘরে ফিরি সব কিছুই ঠিক আছে দেখতে পাই। ইসমাঈল খান সাহেব বলেন, আপনাদেরকে আনার জন্য আমি যখন বাহরাইন গিয়েছিলাম, তখনও আমার ঘরে কোনো তালা লাগিয়ে যাইনি। তিন দিন পর ফিরে এসে দেখি, আমার ঘরের সব কিছুই ঠিক আছে। সৌদি আরবে শান্তি ও নিরাপত্তার অনেক ঘটনা আমরা ইতোপূর্বেও শুনেছিলাম। বিগত সফরেও আমরা এসব প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু এ দু'টি ঘটনা আমাদের জন্য রীতিমতো বিস্ময়কর ছিলো। একবার ভেবে দেখুন, এটা কিসের বরকত? আমাদের দেশে অনেকে বলে থাকেন, শরীয়তী শাসন ব্যবস্থা জারী হলে মানুষের হাত কাটা যাবে। কথা ঠিক, কিছু হাত কাটা যাবে বটে, কিন্ত গোটা দেশ শান্তি পাবে।

বুকাইক

প্রোগ্রাম অনুযায়ী পরদিন আমরা বুকাইক রওয়ানা হই। এটা খোবার থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল পশ্চিমে। আরামকো এখানেই সৌদি আরবের তেলের সবচেয়ে বড় খনি আবিষ্কার করেছে। এখানেও পাকিস্তানের অনেক কর্মচারী থাকে। দশটা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত এখানেও প্রশ্নোত্তরের পালা চলে। সব ধরনের লোক উপস্থিত ছিলেন। মাওলানার বই-পুস্তক পড়ে তার দ্বারা প্রভাবিত, পারভেজ সাহেবের সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত এবং তাবলীগ জামাত দ্বারা প্রভাবিত- সব ধরনের লোক ছিলেন। আজকের প্রশ্নোত্তর ছিলো বর্তমান পরিস্থিতিতে পাকিস্তানে ইসলামের জন্য কাজ করার পন্থা, মৌলিক গণতন্ত্র, তাবলীগ জামাতের সাথে

www.pathagar.com

মিলে-মিশে কাজ করা না করা এবং আহলে কিতাবের জবাই করা পশুর গোশত জায়েয নাজায়েয ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে।

প্রথম প্রশ্নের জবাবে মাওলানা বলেন, বর্তমানে পাকিস্তানে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে[২], তাতে কোনো দল কাজ করতে না পারলেও ব্যক্তি তো আছে আর আল্লাহর দীনের সাথে তাদের সম্পর্কও রয়েছে। তারা যদি দীনের খেদমত করার ব্যাপারে আল্লাহর সাথে কোনো ওয়াদা অঙ্গীকার করে থাকে, তাও বহাল রয়েছে। এজন্য প্রতিটি ব্যক্তি ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিজের শুভ বুদ্ধি অনুযায়ী দীনের যেটুকু খেদমত করতে পারে, তা করা উচিৎ। এ ব্যাপারে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই, থাকতেও পারে না।

তাবলীগ জামাতের সাথে মিলেমিশে কাজ করা সম্পর্কে মাওলানা বলেন, আমরা আমাদের শুভ বুদ্ধি অনুযায়ী দীনের কাজ করছি, আর তাবলীগ জামাতের লোকেরা তাদের শুভ বুদ্ধি অনুযায়ী দীনের কাজ করছেন। যেহেতু তাদের এবং আমাদের কর্মপন্থায় পার্থক্য রয়েছে তাই তাদের সাথে একত্রে কাজ করারতো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু কর্মপন্থার পার্থক্য থাকার অর্থ এ নয় যে, তাদের সাথে আমাদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং বিরোধিতা চলবে, আমরা শুধু একে অপরের প্রতিরোধ করবো এবং একে অন্যের কাজে খুঁত বের করার চেষ্টা করবো। বরং তারা এবং আমরা যদি নিষ্ঠার সাথে একই খোদার দীনের খিদমত করে থাকি, তাহলে আমাদেরকে পরস্পরের শুভাকাঙ্ক্ষী হওয়াই উচিৎ। যতদূর আমরা একে অপরের সাহায্য করতে পারি বা সাহায্য নিতে পারি, তাতে আমাদের কষ্টবোধ করা উচিৎ নয়। আর কিছু না হোক, অন্তত এটুকু তো হওয়া উচিৎ নয় যে, আমরা একে অপরের বিরুদ্ধে কু-ধারণা পোষণ করবো এবং জনগণের মধ্যে তা ছড়াবো। সব শেষে মাওলানা বলেন, আপনারা সবকিছু পড়াশুনা করুন এবং প্রত্যেকের কাজ দেখে নিজেরাই ফয়সালা করুন, কোন্ কর্মপন্থায় আপনার অন্তর বেশি আশ্বস্ত হয়। এরপর যা আপনাদের পছন্দ হয়, তা গ্রহণ করুন এবং তদনুযায়ী কাজ করুন।

আহলে কিতাবের জবাই করা জন্তু সম্পর্কে মাওলানা সংক্ষেপে তাঁর সে মতই ব্যক্ত করেন যা মাসিক তরজমানুল কুরআন ১৯৫৯ সালের এপ্রিল সংখ্যায় বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে তিনটা পর্যন্ত নামায, খাওয়া-দাওয়া বিশ্রামের জন্য বিরতি থাকে। এরপর পুনরায় এক ঘন্টা পর্যন্ত প্রশ্নোত্তর চলে। আসরের নামাযের

২. উল্লেখ্য, এ সময় পাকিস্তানে চলছিল সামরিক শাসন এবং জামাতসহ রাজনৈতিক দলগুলো ছিলো নিষিদ্ধ।

www.pathagar.com

শেষে আমরা বুকাইকের কাযী সাহেবের সাথে সাক্ষাত করতে যাই। ভোরে আমরা বুকাইকে পৌঁছলে কাযী সাহেব মাওলানার কাছে পয়গাম পাঠান এবং তাঁকে সেখানে যাওয়ার দাওয়াত দেন। মাওলানা তাঁকে আসরের পর আসার ওয়াদা দেন। আমাদের সাথে আরও ২০/২৫ জন ছিলেন। সবাইকে দেখে কাযী সাহেব খুব খুশী হন এবং তিনি চা-কফি দিয়ে আমাদের মেহমানদারী করেন। কাযী সাহেব সেখানে আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার বিভাগের ইনচার্জ। মাওলানার আগমনে এসব পাকিস্তানি যুবকরা দীনের কথা শুনার জন্য সমবেত হয়েছে। এজন্য কাযী সাহেব মাওলানাকে ধন্যবাদ জানান।

মাগরিবের পর আমরা বাসায় ফিরে আসি। এশার পর এক আরব নওজোয়ানের বাসায় আমাদের দাওয়াত ছিলো। ইয়াকুব নামে এই নওজোয়ান খোবারের স্থানীয় অধিবাসী। ইয়াকুব নওজোয়ান হলেও দীনের জন্য তাঁর মনে রয়েছে গভীর আগ্রহ। বর্তমান যুগে দীনের দাবি এবং তদনুযায়ী কাজ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সচেতন। বৈরুতের আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত এই নওজোয়ান বৈরুতে অধ্যয়নকালেই ইমাম হাসানুল বান্না এবং মাওলানা মওদূদীর বই পুস্তক পড়ে প্রভাবিত হন। এ কারণে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ তাঁর মধ্যে কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি। শুধু তাই নয়, তিনি অনেক নওজোয়ানকেও এ পরিবর্তনের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। আমরা যখন তাঁর বাসায় উপস্থিত হই, তখন তাঁরই মতো আরও ৮/১০ জন নওজোয়ান সেখানে অপেক্ষা করছিলেন। এদের কয়েকজন স্থানীয় আর অন্যরা সিরিয়া, ফিলিস্তিন এবং মিসরের। সেখানে ওস্তাদ আবদুল হাকীম আবেদীনের সাথেও আমাদের সাক্ষাত হয়েছে। একটি মামলার ব্যাপারে দু'দিন আগে তিনি জেদ্দা থেকে খোবার এসেছেন। তার সাথে সাক্ষাতে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। তার মুখে মিসর এবং সিরিয়ার অনেক কথা শুনতে পেয়েছি, জানতে পেরেছি অনেক কিছু। ওস্তাদ আবদুল হাকিম আবেদীন ইমাম হাসানুল বান্না শহীদের ভগ্নিপতি এবং মিসরে ইখওয়ানুল মুসলিমুনের সেক্রেটারি ছিলেন। মিসর সরকার ১৯৫২ সালে যে চারজন নাগরিকের নাগরিকত্ব বাতিল করে, তিনি তাদের অন্যতম। তারা আগে থেকে দেশের বাইরে ছিলেন। তাই শুধু তাদের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছে। তারা দেশে থাকলে ওস্তাদ আবদুল কাদের আওদা শহীদ এবং অন্যদের ভাগ্য তাদেরকেও বরণ করতে হতো। বর্তমানে তিনি সৌদি নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন এবং সপরিবারে জেদ্দায় বাস করছেন। জেদ্দা এবং বৈরুতে তিনি ওকালতী করেন।

খাওয়া দাওয়া শেষেও দীর্ঘ সময় তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা চলে। এসব আলোচনায় একে অপরের সম্পর্কে জানার অনেক সুযোগ হয়েছে।

www.pathagar.com

যাহরান

কর্মসূচী অনুযায়ী ১৩ নভেম্বর আমরা যাহরান গমন করি। ১১টা থেকে শোয়া ১২টা পর্যন্ত সেখানেও চলে প্রশ্নোত্তরের পালা। এ দিন ছিলো শুক্রবার। কোয়ার্টারের মসজিদেই আমরা জুমার নামায আদায় করি। মসজিদের খতীব ছিলেন নজদের আলিম। তিনি চমৎকার খোতবা দেন। কিন্তু নামাযে তার কিরায়াত শুদ্ধ ছিলোনা। মনে হচ্ছে, নজদে শুদ্ধরূপে কুরআন মজীদ তালীম দেয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। তারা হয়তো ধরে নিয়েছেন, যেহেতু আমরা আরব, সুতরাং আপনা-আপনিই আমরা কুরআন শুদ্ধ পড়বো।

জুমার পর ছিলো খাবার এবং বিশ্রামের জন্য বিরতি। সোয়া চারটা থেকে পৌনে ছটা পর্যন্ত আবার চলে প্রশ্নোত্তর পর্ব। আজকের সব আলোচনা টেপ রেকর্ড করা হয়।

কোম্পানীর চাকুরী উপলক্ষে যেসব পাকিস্তানি বন্ধু এখানে অবস্থান করেন, তাদের অধিকাংশেরই উপার্জন করা এবং খাওয়া দাওয়া ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা নেই। এক-তৃতীয়াংশ লোক এমনও রয়েছে, যাদের মধ্যে দীনের জন্য কিছু দরদ-অনুভূতি আছে। কোনো না কোনো চিন্তাধারার সাথে তারা সম্পৃক্ত। তা না হলে অন্তত তার প্রতি সহানুভূতিশীল। তাঁদের মধ্যে একজন কাদিয়ানীও আছেন, কিন্তু তিনি নিজেকে কাদিয়ানী বলে প্রকাশ করেন না। এখানে তার কোনো কর্মতৎপরতাও নেই। খাকসার আন্দোলনের নেতা আল্লামা ইনায়াতুল্লাহ মাশরেকীর একজন অনুসারীও আছেন, যারা নিজেদের আহরার (স্বাধীন) বলে দাবি করেন। কিন্তু কার্যত তিনিও নীরব। তাবলীগ জামাতের সাথে সম্পৃক্ত দশ বারোজন লোকও রয়েছেন। তারা এখানে গাশ্‌তে বের হন, লোকদেরকে নামাযের জন্য তাকীদ করেন এবং তাদের কালেমা পাঠ শুদ্ধ করেন। গোলাম আহমদ পারভেজের দ্বারা প্রভাবিত কিছু লোকও আছেন এবং বেশ তৎপরতার সাথে তাদের চিন্তাধারা প্রচার করেন। এ সব নানা চিন্তাধারার লোক মাওলানার সাথে সাক্ষাত করেন অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধার সাথে আর উল্টা-পাল্টা প্রশ্ন করে তাঁকে বিভ্রান্ত করারও কোশেশ করেন। ১৩ নভেম্বর এরা মাওলানাকে তাদের সেখানে দাওয়াত করে এবং মাওলানার জন্য একটা প্রশ্নমালা পূর্ব থেকেই প্রণয়ন করে রাখে। অনেক চিন্তা চেষ্টা করে তারা এসব প্রশ্ন প্রস্তুত করে এবং বাইরে বলে বেড়ায় আজ দেখা যাবে, মাওলানা কতো গভীর পানির মাছ! এশার নামাযের পর আমরা তাদের সেখানে পৌঁছি। প্রায় দুই আড়াইশ লোক উপস্থিত। মাইকতো আছেই। তাছাড়া মাওলানার বক্তব্য টেপ করার জন্য টেপ রেকর্ডারেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাওলানা তাদের সকল প্রশ্ন এবং পরে অন্যান্য প্রশ্নেরও বিস্তারিত জবাব দেন। উপস্থিত সকলের উপর এর শুভ প্রভাব পড়ে। মাওলানার জবাবে

www.pathagar.com

তাদের চিন্তার সংশোধন সাধিত হয়েছে, এমন কথা বলা যায় না। অবশ্য এটা বলা যায় যে, যারা এখনও গোলাম আহমদ পারভেজের ফাঁদে পড়েনি, ভবিষ্যতে তারা তার ফাঁদে পড়বে না।

দাম্মাম

পরদিন ১৪ নভেম্বর আসর পর্যন্ত আমরা বাসায় ছিলাম। এ সময় পরবর্তী সফরের প্রস্তুতিতে মাওলানা পড়ালেখা করছিলেন। মাগরিবের সময় আমরা শিয়ালকোটের চৌধুরী মুহাম্মদ আকবরের পুত্র জনাব আনোয়ার পাশার নিকট দাম্মাম যাই। ব্যবসা উপলক্ষে তিনি বর্তমানে সেখানে অবস্থান করছেন। তিনি মাগরিবের পর আমাদেরকে তাঁর বাসায় খাওয়ার দাওয়াত দিয়েছিলেন। এর ফলে আমাদের দাম্মাম দেখার সুযোগও হয়েছে। দাম্মাম হচ্ছে সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চলের সদর দফতর। এ অঞ্চলের শাসন কর্তার নিবাসও এখানে। আগে এ অঞ্চলের সদর দফতর ছিলো হাফুফ। কিন্তু তেল আবিষ্কার এবং যাহরানে আরামকোর সদর দফতর স্থাপনের পর দাম্মামের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি আগেও উল্লেখ করেছি, দাম্মাম হচ্ছে সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে বড় বন্দর এবং পাইকারী ক্রয়-বিক্রয় কেন্দ্র। এখান থেকে সড়ক এবং রেল পথে যাহরান, বুকাইক হাফুফ ইত্যাদি হয়ে রিয়াদ যাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। আনোয়ার পাশার বাসায় বেশ কয়েকজন লোক উপস্থিত হন। এরা সকলেই শিয়ালকোটের বাসিন্দা। খোবার, যাহরান, রাস তান্নুরা বুকাইক, রিয়াদ সর্বত্রই শিয়ালকোটের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক থাকেন। আমরা যেখানেই গিয়েছি, শিয়ালকোটের কারো-না-কারো সাথে আমাদের সাক্ষাত হয়েছে। কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে তাদের সম্পর্কে একটা কৌতুক প্রচলিত আছে। কৌতুকটি হলো: কয়েক ব্যক্তি রকেট যোগে চাঁদে গিয়ে দেখে, সেখানে কিছু লোক ঘোরা-ফেরা করছে। তাদের জিজ্ঞেস করা হয়, তোমরা কোথাকার লোক? জবাব আসে, কেন, আমরা শিয়ালকোটের বাসিন্দা!' খুব সম্ভব শিয়ালকোটের লোকদের এত বিপুল সংখ্যায় প্রবাস জীবন যাপনের কারণ হলো, দেশ বিভাগের পর শহরের বিপুল সংখ্যক শিল্প কারখানা ধ্বংস হয়েছে। এর ফলে অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা খুব অস্থির।

এশার পর আমরা দাম্মামের এক স্থানীয় অধিবাসী শেখ জাসেমের বাসায় যাই। একদিন আগে তিনি মাওলানার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন এবং তাঁর সেখানে যাওয়ার জন্য মাওলানার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেন। সেখানেও দেখি, কয়েকজন আরব নওজোয়ান উপস্থিত। বর্তমান যুগে ইসলামী দাওয়াতের কাজ করার ব্যাপারে তারা মাওলানার নিকট হিদায়াত চান। এই সিলসিলা চলে রাত সাড়ে ১১টা পর্যন্ত। এরপর আমরা খোবার ফিরে আসি।

www.pathagar.com

গভর্ণরের সাথে সাক্ষাত এবং রাজকীয় মেহমানদারী

১১ থেকে ১৪ নভেম্বর– এই চারদিন আমরা এতোটা ব্যস্ত ছিলাম যে, পরবর্তী সফরের প্রস্তুতি নেয়ার কোনো সুযোগই পাইনি। ১৫ নভেম্বর মাওলানা কারো সাথে সাক্ষাতের জন্য বাইরে যেতে সম্পূর্ণ অসম্মতি জানান এবং পরবর্তী সফরের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। রাও আখতার সাহেবকে দু'টি কাজের জন্য প্রেরণ করেন। করাচি থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় সৌদি রাষ্ট্রদূত আমাদের হাতে যেসব চিঠি দিয়েছিলেন, তার একটিতে আমাদেরকে যাবতীয় কর মুক্ত করা হয়েছে। আমি এবং রাও সাহেব তখন এ চিঠি সম্পর্কে জানতাম না। তাই আমরা বিমান বন্দর এবং সমুদ্র বন্দরে সৌদি আরবে প্রবেশ ফি ৫০ রিয়াল করে পরিশোধ করেছি। মাওলানা রাও সাহেবকে পত্রটি দিয়ে বিমান বন্দর এবং সমুদ্র বন্দর গিয়ে একশত রিয়াল ফেরত আনার জন্য বলেন। দাম্মামে চৌধুরী গোলাম মুহাম্মদ সাহেবের পাসপোর্ট আটক করা হয়। তাও ফেরত আনা দরকার। এছাড়া পরামর্শ হয় যে, খোবার থেকে রিয়াদ রওয়ানা হওয়ার আগে পূর্বাঞ্চলের গভর্ণর আমীর সউদ ইবনে জিলবীর (তিনি বাদশাহ সউদের মামা) সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎকারে– (আরবিতে এটাকে বলা হয় যিয়ারাতুল মুহাসালাহ–) মিলিত হওয়া দরকার। এ উদ্দেশ্যে রাও আখতার সাহেবকে প্রেরণ করা হয় দারুল ইমারাহ অর্থাৎ আমীর প্রাসাদে গিয়ে সাক্ষাৎকারের সময় নির্ধারণ করে আসার জন্য। রাও সাহেব আমীর প্রাসাদে পৌঁছলে তাঁর বড় ছেলে আমীর আবদুল আযীয জানান, মাওলানার খোবার পৌঁছার খবর আমরা পাইনি। পেলে বিমান বন্দর হোটেলে আমরা তাঁর অবস্থানের ব্যবস্থা করতাম। কারণ, তিনি রাষ্ট্রীয় অতিথি। তাঁকে সব রকম সুযোগ-সুবিধা দেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর তরফ থেকেও নির্দেশ এসেছে। আমীর আবদুল আযীয মাওলানাকে তাঁর কাছে রাখার জন্য রাও সাহেবকে দায়ী করেন। যাইহোক, রাও সাহেবের সাথে আমীরের পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি আসেন এবং এয়ারপোর্ট হোটেলে স্থানান্তরের জন্য তিনি মাওলানাকে অনুরোধ করেন। তিনি আমীরের পক্ষ থেকে মাওলানার বাইরে অবস্থানের জন্য দুঃখও প্রকাশ করেন। ভদ্রলোক ১২টার দিকে এই খবর নিয়ে আসেন। তাড়াহুড়া করে প্রস্তুতি নিয়ে বেলা দুটার দিকে আমরা হোটেলে পৌঁছি। এয়ারপোর্টের এ বিলাস বহুল হোটেলটি সম্পূর্ণ আধুনিক কাঠামোতে নির্মিত। বেশির ভাগ রাষ্ট্রীয় অতিথি এই হোটেলে অবস্থান করেন। এর তুলনায় যাহরান, দাম্মাম এবং খোবারে যেনো কোনো হোটেলই নেই।

বিকাল সাড়ে চারটায় আমীর সউদের সাথে সাক্ষাতের জন্য আমরা আমীর প্রাসাদে যাই। এক বিরাট শানদার কক্ষে তাঁর আসন। রাজকীয় সাজ-শয্যা।

www.pathagar.com

তখন তাঁর স্বাস্থ্য তেমন ভালো যাচ্ছিলো না। তিনি সালাম-কালাম মুসাফাহা ছাড়া মাওলানার সাথে নিজে কোনো আলাপ করতে পারেননি। সচিবের মাধ্যমে কিছু কথাবার্তা হয়। মাওলানা তাঁকে চারটি আরবি কিতাব-মাবাদিউল ইসলাম (ইসলাম পরিচিতি), আল হিজাব (পর্দা), আর-রিবা (সুদ), নাযরিয়াতুল ইসলাম আল-খুলুকিয়াহ (ইসলামের নৈতিক দৃষ্টিকোণ) উপহার দেন এবং করাচি থেকে নিয়ে আসা এক কৌটা মোহন ছালুয়াও তাঁর খেদমতে পেশ করেন। তিনি মাগরিবের পর তাঁর সেখানে খাওয়ার জন্য আমাদের দাওয়াত দেন। আমরা মাগরিবের পর আমীর ভবনে পৌঁছলে স্বাস্থ্যগত কারণে আমীর আমাদের খানায় যোগ দিতে না পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। অবশ্য তাঁর বড় ছেলে আমীর আবদুল আযীয তাঁর প্রতিনিধিত্ব করেন এবং তিনি আমাদের সাথে খাবারে শরীক হন। অনেক শেখও উপস্থিত ছিলেন। কাতারের উযীরে আযমের বড় পুত্র এবং জনৈক মার্কিন নাগরিকও শরীক ছিলেন। খানা ছিলো সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য কায়দার, পাশ্চাত্য ধারায় ছুরি কাঁটা দিয়েই খাওয়া হয়। এ দাওয়াতে আমাকে এবং রাও আখতার সাহেবকে নিয়ে এক মজার কান্ড ঘটে। অবশ্য অন্যদের জন্য এটা মজার কান্ড হলেও আমাদের জন্য লজ্জার কারণ হয়েছে। মজার কান্ডটি ছিলো এই– খাদেমরা একের পর এক সকল মেহমানের সামনে খাবারের ডিশ নিয়ে আসছিল। তারা পরের বার মুরগীর গোশতের ডিশ নিয়ে আসে। মাওলানা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি গোশত প্লেটে তুলে নেননি। কিন্তু আমি এবং রাও সাহেব বুঝতে পারিনি। তাই আমরা তা পাতে তুলে নেই। খাদেমরা ছিলো হিন্দুস্থানী। তারা পরে আমাদের জানায় যে, এগুলো হচ্ছে টিনজাত করা মুরগী। এজন্য আমরা পরে ভীষণ অনুতাপ করেছি।

দাম্মামে পাকিস্তানের গুজরাটের আবদুল মজীদ হাসান নামে একজন ডাক্তার থাকেন। তিনি বিগত ১৬ বৎসর যাবত এখানে আছেন। আমীর সৌদর ব্যক্তিগত চিকিৎসক এবং আরামকোর চোখের ডাক্তার। এছাড়াও তিনি প্রাইভেট প্র্যাক্টিস করেন। তিনি মাওলানার সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করেন। আর এ সাক্ষাতের কারণ হচ্ছে, তার মনে ইসলাম সম্পর্কে কিছু খটকা ছিলো। তিনি এসব খটকার নিরসন চাচ্ছিলেন। চৌধুরী সাহেবেরও তার কাছ থেকে ঔষধ নেয়ার দরকার ছিলো। খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা তার কাছে গেলাম। সালাম কালামের পর তিনি মাওলানার সাথে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। চা পান করার জন্য আমরা তার বাসার উপর তলায় যাই। তার ছেলেরা তখন সেখানে টেলিভিশন দেখছিল। টেলিভিশনে তখন যাহরান বিমান বন্দরের কর্মসূচী এবং ফুটবল ম্যাচ দেখানো হচ্ছিল। চায়ের অপেক্ষায় আমরাও টেলিভিশনে ম্যাচ দেখছিলাম। আমার জীবনে এটা ছিলো টেলিভিশন দেখার প্রথম সুযোগ। ভালো হয়েছে যে, তখন কেবল ফুটবল ম্যাচ চলছিল, অন্য কোনো প্রোগ্রাম ছিলোনা।

www.pathagar.com

যাহরানে টেলিভিশনের দু'টি কেন্দ্র আছে, একটা আরামকো সদর দফতর আর দ্বিতীয়টা বিমান বন্দরে। বিমান বন্দর কেন্দ্র থেকে শুধু ইংরেজিতে অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। আর আরামকোর কেন্দ্র থেকে অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় আরবি এবং ইংরেজি উভয় ভাষায়। এসব প্রোগ্রাম কেবল একাডেমিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং সব রকম প্রোগ্রাম প্রচারিত হয়। আরব নওজোয়ানদের কাছে পয়সার অভাব নেই, অভাব নেই অতিরিক্ত পয়সারও। নৈতিক দিক থেকে কোনো বিধি-নিষেধ এবং কড়াকড়িও নেই তাদের উপর। তাদের উপর টেলিভিশনের এসব প্রোগ্রামের যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে, তা অতি সহজেই অনুমান করা যায়। আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার বিভাগের কর্মকর্তারা সিনেমার উপর তো কড়াকড়ি আরোপ করতে পারেন। কিন্তু টেলিভিশনের মাধ্যমে আরব নওজোয়ানদের মনে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকৃতির যে বিষ বাষ্প ছড়ানো হচ্ছে, তার অশুভ প্রতিক্রিয়া থেকে তারা নওজোয়ানদের কিভাবে রক্ষা করবেন? তার বাসায় চা পান শেষে আমরা হোটেলে ফিরে আসি। মাওলানার দেয়া সময় অনুযায়ী ডাক্তার আব্দুল মজীদ হাসান সেখানে নয়টায় মাওলানার সাথে সাক্ষাত করতে আসেন। তিনি দোয়ার তাৎপর্য সম্পর্কে মাওলানাকে অনেকগুলো প্রশ্ন করেন এবং মাওলানা বিস্তারিতভাবে তার প্রশ্নের জবাব দেন। রাত একটা পর্যন্ত বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি যুবক মাওলানার কাছে বসা ছিলেন। তারা বিভিন্ন বিষয়ে মাওলানাকে প্রশ্ন করছিলেন আর মাওলানা তার জবাব দিচ্ছিলেন। রাত দেড়টার দিকে আমরা ঘুমাতে যাই।

খোবারের বাজার

১৬ নভেম্বর আমাদের প্রোগ্রাম ছিলো বাজার থেকে প্রয়োজনীয় কেনাকাটা করা এবং আরামকোর লাইব্রেরি দেখা। আগাম অনুমতি ছাড়া লাইব্রেরি দেখা যায় না। তাই রাও আখতার সাহেবকে প্রেরণ করা হয়েছে আমীরের সেক্রেটারির নিকট আমাদের জন্য লাইব্রেরি দেখার ব্যবস্থা করার জন্য। তিনি ফিরে এসে জানান, দশটার সময় আমীরের একজন লোক আসবেন। তিনি আমাদের নিয়ে যাবেন লাইব্রেরি দেখাতে। সাড়ে দশটায় রাও সাহেব সহ মাওলানা লাইব্রেরি দেখতে যান। আমরা নয়টায় বাজারে যাই প্রয়োজনীয় কোনো-কাটার জন্য। আমি এবং চৌধুরী সাহেব সাড়ে ১২টা পর্যন্ত বাজারে ছিলাম। খোবারের বাজারে ঘুরে আমাদের ধারণা হয়, এখানে জিনিস পত্রের দাম অনেক বেশি। বাহরাইন থেকে অন্তত দ্বিগুণ। দোকানে বেচা-বিক্রি অনেক। আমেরিকান, আরব এবং অন্যান্য কর্মচারীরা নিশ্চিন্তে কেনা-কাটা করছে। তাদের কাছে পয়সার তো আর কোনো অভাব নেই। তাই চড়া দামের কোনো পরওয়াই করে না তারা। খোবারের বাজারেও মহিলাদের বেপর্দা ঘোরাফেরা করতে খুব কমই দেখেছি। অবশ্য আমেরিকা, সিরিয়া, ফিলিস্তিন এবং লেবাননের নারীরা বেপর্দা অবস্থায়

www.pathagar.com

ঘোরাফেরা করছিল। 'আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার' বিভাগের কড়াকড়ির ফলে কোনো সৌদি নারী পর্দা ছাড়া বাজারের বেরুতে পারে না। মার্কিনীদের উপরতো কোনো কড়াকড়ি আরোপ করা যায় না। আগে সিরিয়া, ফিলিস্তিন, মিসর এবং লেবাননের নারীদের উপরও কড়াকড়ি ছিলো। অজ্ঞাত কারণে তাদের ব্যাপারে অনেক শৈথিল্য দেখানো হচ্ছে (সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানা যায়, নারীদের বেপর্দা বের হওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে)।

আরামকো লাইব্রেরি

যোহরের পর আমরাও আরমকো লাইব্রেরিতে গিয়ে মাওলানার সাথে মিলিত হই। আরামকোর এ গবেষণা লাইব্রেরি বিশাল। আরব এবং মুসলিম দেশ সম্পর্কে পৃথিবীর যে কোনো ভাষায় প্রকাশিত বইয়ের কপি- এ লাইব্রেরিতে রয়েছে। বিশেষ করে আরব উপসাগরীয় অঞ্চল সম্পর্কে মার্কিনীদের এতো জ্ঞান গবেষণা এবং পুস্তকাদি রয়েছে যে, সেরকম স্বয়ং আরবদেরও নেই। এ ছাড়াও সাহিত্য, হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ এবং অন্যান্য ইসলামী বিষয়েও বিপুল গ্রন্থ এ লাইব্রেরিতে রয়েছে। মাওলানা দীর্ঘ ২ ঘন্টা ধরে লাইব্রেরির ক্যাটালগ ঘেটে তাঁর প্রয়োজনীয় কিতাবের নাম নোট করেন। এরপর আমরা হোটেলে ফিরে আসি।

আরামকোর সদর দফতর

এ লাইব্রেরি যে ভবনে অবস্থিত, তা আরামকোর সদর দফতর। বহুতলা বিশিষ্ট এ ভবনটি সম্পূর্ণ ইস্পাতের কাঠামোতে তৈরি এমন ভাবে নির্মিত যে, আগুন বা ভূমিকম্প এর কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবেনা। শুনেছি, এ ভবনটির নির্মাণ কাজে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৭৫ মিলিয়ন অর্থাৎ কিনা ৭ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার। মার্কিনীরা বাহ্যত সৌদি সরকার এবং নাগরিকদের সমীহ করে। সময়ে-অসময়ে তাদের অনেক নরম-গরমও সহ্য করে। কিন্তু এ সবই হচ্ছে সেই বেনিয়ার মতো, যে গ্রাহক বা ঋণ গ্রহীতার প্রতি ভক্তি দেখায়। কিন্তু নিজের স্বার্থ ছাড়ে না। মার্কিনীরা আরব-ভূমিতে এতো শক্তভাবে থাবা বিস্তার করেছে যে, তারা নিজেরা স্বেচ্ছায় যদি কখনো আরবভূমি ছেড়ে যায়, সেটা ভিন্ন কথা, কিন্তু তাদেরকে জোরপূর্বক সেখান থেকে বের করা সম্ভব নয়। আরব যুবকেরা যখন এক দিকে আরামকোর এ বিশাল বিস্তৃত এবং সুনিয়ন্ত্রিত শৃংখলের প্রতি তাকায় আর অপর দিকে তাদের সরকারের বিত্ত বৈভব এবং শাসন ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি দেয়, তখন চেতন বা অবচেতনভাবে মার্কিনীদের প্রভাব এবং তাদের সভ্যতার প্রাধান্যের অনুভূতি মনে জাগ্রত হয়। #

www.pathagar.com

৫

রিয়াদ সফর

১৭ নভেম্বর আমাদের প্রোগ্রাম ছিলো রিয়াদ রওয়ানা হওয়ার। আমরা ভোরে উঠে নামায শেষ করে আসবাব-পত্র গুছাতে থাকি। সকাল সাড়ে ৮টায় ট্রেন ছাড়ার কথা। আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। সাড়ে ৭টার দিকে ইসমাইল খান সাহেব টেলিফোনে জানান, হাফুফ-এর নিকটে রেল লাইন নষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই ট্রেন ৮টার পরিবর্তে ১০টায় ছাড়বে। দশটায় তিনি আবার জানালেন, লাইন এখনও ঠিক হয়নি, কাজেই ট্রেন ১২টায় ছাড়বে। ১২টায় আবার জানান, ট্রেন তিনটায় ছাড়বে। আর তিনটার সময় খবর আসে, আজকে আর গাড়ি ছাড়বেনা। শুধু শুধু গাড়ির অপেক্ষায় আমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত হোটেলেই কাটাই। মাগরিবের আগে আমরা যাহরান রেল ষ্টেশনে যাই। সেখানে আমাদের জানানো হয়, আগামীকাল গাড়ি ছাড়তে পারে। আপনারা সকাল ৭টায় খোঁজ নেবেন।

এখানকার গাড়ির ব্যবস্থা চমৎকার। দাম্মাম থেকে রিয়াদ ২টি গাড়ি ছাড়ে। একটা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। এর সকল বগি প্রথম শ্রেণীর। দাম্মাম থেকে ৮ ঘন্টায় রিয়াদ পৌঁছে (দাম্মাম এবং রিয়াদের দূরত্ব ৩৭০ মাইল)। এ ট্রেনটি রিয়াদ পৌঁছে ১৪ ঘন্টায় এবং ছাড়ে সপ্তাহে ৩/৪দিন। গাড়ি ছাড়ার দিন-স্থান নির্দিষ্ট থাকলেও নির্ধারিত সময়ে তা ছাড়বেই– নিশ্চিত করে এমন কথা বলা যায়না। সব কিছুরই পরিবর্তন হতে পারে। এখানে বিমানেরও প্রায় একই অবস্থা। এ কারণে আমাদের পাকিস্তানি বন্ধুরা এর নাম রেখেছেন 'ইউমকিনু এয়ার লাইনস' আর 'ইউমকিনু রেলওয়েজ।' আর অনেক সময় সৌদি নাগরিকরাও এগুলোকে এ নামেই স্মরণ করে থাকে। এ নামকরণের কারণও আছে। গাড়ি যখন বিলম্ব হয়, তখন দায়িত্বশীলদের গাড়ি ছাড়ার সঠিক সময় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে জবাবে তারা বলেন– ইউমকিনু বা'দা সাআতিন, ইউমকিনু বা'দা নিসফি সা'আতিন, ইউমকিনু বা'দা রুবয়ে সাআতিন-হতে পারে এক ঘন্টা পর, হতে পারে আধ ঘন্টা পর, হতে পারে সিকি ঘন্টা অর্থাৎ ১৫ মিনিট পর। এখানকার সিকি বা আধা ঘন্টাও অনেক সময় কয়েক ঘন্টা দীর্ঘায়িত হয়। বিগত সফর কালে এই ইউমকিনু'র চক্কর দামেশক বিমান বন্দরে আমাদের ৬ ঘন্টা আটকে রেখেছিল।

www.pathagar.com

১৮ নভেম্বর সকালে খবর নিয়ে জানলাম, আজও গাড়ি ছাড়ার সম্ভাবনা নাই। তাই আমরা ধীরে-সুস্থে নিজেদের কাজ করছিলাম। কিন্তু সাড়ে নয়টার দিকে হঠাৎ খবর আসে, আজ ১১টায় যাহরান স্টেশন থেকে গাড়ি ছাড়বে। তাড়াহুড়ো করে সাড়ে দশটায় আমরা স্টেশনে পৌঁছি। কিন্তু ১২টার আগে গাড়ি ছাড়া সম্ভব হয়নি। সাড়ে ১১টার দিকে আমীর সউদের সেক্রেটারি আসেন এবং আমাদের জন্য তিনটি আসন রিজার্ভ করান। তিনি আমাদের জানান, রিয়াদে আপনাদের আগমনের সংবাদ দেয়া হয়েছে। আপনারা রিয়াদ পৌঁছে স্টেশন থেকে সোজা 'দারুস যিয়াফাতিল মুলকিয়্যাহ'– 'রাজকীয় অতিথি ভবনে চলে যাবেন। গাড়িটি ছিলো চার বগির। আমাদের দেশের রেলের মতো। গোটা গাড়িটাই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। মরুভূমিতে এয়ারকন্ডিশন্ড গাড়ি বিরাট নেয়ামত। তা না হলে এখানে এতো ধূলা-বালি উড়ে যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই মানুষের চেহারা পরিবর্তন হয়ে যায়। একটার দিকে আমরা বুকাইক পৌঁছি। মাওলানাকে বিদায় অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য স্টেশনে প্রায় ২০ জন পাকিস্তানি বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। ২টার দিকে আমরা হাফুফ পৌঁছি। এই হাফুফ এক সময়ে পূর্বাঞ্চলের সদর দফতর ছিলো। গাড়িতে বসে আমরা মনোরম প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করছিলাম। মাইলের পর মাইল বিস্তৃত খেজুরের বাগান। পাঁচটা পর্যন্ত আমরা এখানেই আটকা ছিলাম। কারণ সামনে রেল লাইন খারাপ। মেরামতের কাজ চলছে। পাঁচটার সময় আমরা হফুফ থেকে রওয়ানা হলাম। কিন্তু সেখানে রেল লাইন খারাপ ছিলো, ৬টার দিকে গাড়ি সেখানে এসে থেমে গেলো। মেরামতের কাজ চলছিল পূর্ণ উদ্যমে। কারণ, বাদশাহ সউদ পরদিন ১৯ নভেম্বর এ পথ দিয়ে দাম্মাম যাবেন। বিভিন্ন স্টেশনে তাঁকে সম্বর্ধনা জানাবার প্রস্তুতি চলছিলো। বাদশাহ সউদের এ সফরের কর্মসূচী না থাকলে মেরামত কাজে কতোদিন লাগতো, আর আমাদের কতোদিন আটকা পড়ে থাকতে হতো, বলা মুশকিল। দেড় ঘন্টা পর গাড়ি ছাড়া সম্ভব হয়েছে। সামনে কোন্ কোন্ স্টেশন আছে, জানিনা, আমরা কেবল হারাম এবং খারাজ এর নাম জানতে পেরেছি। কিন্তু অন্ধকারে তাও দেখতে পাইনি। রাত ১টায় যখন রিয়াদ পৌঁছি তখন আমরা ক্ষুধায় কাতর। গাড়িতে উঠার সময় আমরা লোকদের জিজ্ঞেস করেছিলাম গাড়িতে খাবার পাওয়া যায় কিনা। তারা হাঁ সূচক জবাব দেয়। তাই আমরা সাথে খাবার নেইনি। কিন্তু গাড়িতে গিয়ে দেখি সেখানে একটা মাত্র ছোট দোকান। তাতে চা এবং টোস্ট ছাড়া আর কিছুই নেই। দোকানদার চা-ও ঢেলে রেখেছিল একটি আরমাসে। মাত্র কয়েক পেয়ালা চা ছিলো যা তৎক্ষণাৎ শেষ হয়ে যায়। দুপুরে ভীষণ ক্ষুধা লাগলে আমরা দু'টি টোস্ট এনে খেয়ে নেই। বিকেলে এবং রাতে তাও আর পাওয়া যায়নি। মন্টোগোমারী স্টেশন অতিক্রমকালে শেখ মোহাম্মদ আমিন তার নিজস্ব ফ্যাক্টরীর তৈরি কয়েক টিন বিস্কিট মাওলানার খেদমতে পেশ করেছিলেন। এগুলো এখানে কাজে লেগেছে।

www.pathagar.com

সেগুলো খেয়ে পানি পান করে কোনো রকমে কাটিয়েছি। কিন্তু এসবে কি আর ক্ষিধে মেটে। যাই হোক, সহি সালামতে পৌঁছার জন্য আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি এবং স্টেশন থেকে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে যাওয়ার কথা চিন্তা করতে থাকি।

রিয়াদ

১৮-১৯ নভেম্বর ১৯৫৯

ওয়াদীয়ে হানীফার নিকটে অবস্থিত রিয়াদ সৌদি আরবের রাজধানী। নাজদ এর যে অঞ্চলে রিয়াদ অবস্থিত তাকে বলা হয় 'আরেয'। আর এ 'আরেয' বনু তমীম কবীলার প্রাচীন নিবাস। ১৮১৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত রিয়াদ ছিলো আরেযের অন্যান্য কসবার মতো একটা মামুলী কসবা– গুরুত্বহীন সাধারণ গ্রাম মাত্র। কিন্তু দেরইয়ার ধ্বংসের পর আলে সউদ যখন একে তাদের রাজধানীতে পরিণত করে, তখন গোটা নাজ্‌দের মধ্যে এর গুরুত্ব বেড়ে যায়। তখন থেকে এখন পর্যন্ত এ রিয়াদই আলে সউদের রাজধানী রয়েছে। অবশ্য ১৮৯৬ সালে হায়েলের আমীররা (আলে রশীদ) তা অধিকার করে সাময়িকভাবে সৌদি সরকারের অবসান ঘটান। কিন্তু এর কয়েক বছরের মধ্যেই বর্তমান শাসনকর্তা বাদশাহ সউদের পিতা আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুর রহমান মুষ্টিমেয় সাথী নিয়ে ১৯০২ সালে তা পুনরুদ্ধার করেন। শস্য-শ্যামল এ শহরটি বাগ-বাগিচার জন্য শুরু থেকেই প্রসিদ্ধ ছিলো। আর এ জন্যই এর নাম হয়েছে রিয়াদ– অর্থাৎ বাগান।

১৮ এবং ১৯ নভেম্বরের মধ্যবর্তী রাতে আমরা রিয়াদ পৌঁছি। রাত তখন ১টা। আমরা ভাবছিলাম, এখানে তো আমরা সম্পূর্ণ অপরিচিত। কোনো উপযুক্ত হোটেল সম্পর্কেও আমাদের কোনো ধারণা নেই। এ জন্য আগে আমরা রাজকীয় অতিথি ভবন হয়ে যাবো। সেখানে দায়িত্বশীল কাউকে পাওয়া গেলোতো ভালো কথা। না হয় নিকটে কোনো হোটেলে গিয়ে উঠবো। তাই মাওলানা স্টেশনেই অবস্থান করছিলেন, আর চৌধুরী সাহেবকে নিয়ে আমি রাজকীয় অতিথি ভবনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। পথে চোখে ছিলো প্রশস্ত সড়ক আর বড় বড় বাজার। সবই আলোয় ঝলমল। দোকান বন্ধ থাকলেও অনুমান করতে কষ্ট হয়নি যে, বিগত কয়েক বছরে রিয়াদ অনেক বিস্তৃত, প্রসারিত এবং আধুনিক কাঠামোর শহরে পরিণত হয়েছে। ১৯৪৯ সালে মরহুম মাওলানা মাসউদ আলম নদবীর সাথে যখন প্রথমবার রিয়াদ আসি তখনও এটা ছিলো একটা সাধারণ শহর। না, শহরও বলা যায় না। আমাদের গ্রাম দেশের হাট-বাজারের মতো সেখানে ছিলো না সারি সারি দোকানরাজী আর পাকা সড়ক। অবশ্য একটা মাত্র পাকা সড়ক ছিলো– শহর থেকে বিমান বন্দর পর্যন্ত বিদ্যুৎ ছিলো বটে, কিন্তু তা কেবল বাদশা

www.pathagar.com

এবং রাজবংশের লোকদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিলো। সীমিত সংকীর্ণ চিপা গলিতে মামুলী ধরনের দোকান-পাট ছিলো আর তখন একেই বলা হতো বাজার। তখন এখানে কোনো হোটেল-রেষ্টুরেন্ট ছিলো না, ছিলো না ভাড়ায় কোনো যানবাহন। সকল বাড়ি-ঘর– এমন কি বাদশা এবং আমীর ওমরাদের বাড়ি-ঘরও ছিলো তখন কাঁচা। অবশ্য নূতন নূতন ভবনের নির্মাণ কাজ তখন শুরু হয়েছিল। তা ছিলো রাজ পরিবারের খাস মহলে সীমাবদ্ধ।

আর এখন? সব কিছুই যেন পালটে গেছে! দেখে চেনাই মুশকিল, এই সেই রিয়াদ। আমার মনে হয়, অতিথি ভবনও তাই ছিলো, যাতে আমি এবং মাওলানা মাসউদ আলম নদবী অবস্থান করেছিলাম। কিন্তু তার চেহারা আর রং-রূপের পরিবর্তন হয়েছে– রীতিমতো আমূল পরিবর্তন। তখন কাঁচা এবং ক্ষুদ্র পরিসর ছিলো আর এখন পাকা, বিশালয়তন– চমৎকার। আমরা কড়া নাড়লে একজন কর্মচারী বেরিয়ে আসে। সে জানায়, ব্যবস্থাপক এখন নেই। আপনারা সকালে আসেন অথবা এখন তার সাথে বাসায় দেখা করতে পারেন। রাতের বেলা তার বাসায় যাওয়া আমরা সমীচীন মনে করিনি। তাই ট্যাকসীওয়ালাকে বললাম, আমাদের কাছের কোনো হোটেলে নিয়ে যেতে। সে আমাদের শারে' আল বাতহায়– বাতহা সড়কে-ফুন্দুকুস সালাম– শান্তি হোটেলে নিয়ে যায়। একটা সাধারণ হোটেল কিন্তু ভাড়া অনেক বেশি –দৈনিক দশ রিয়াল। কিন্তু এতো রাতে এটাকেই আমরা গনীমত মনে করে সেখানেই উঠলাম। পরে চৌধুরী সাহেব গিয়ে মাওলানাকেও এই হোটেলে নিয়ে আসেন।

রিয়াদের শান-শওকত

সকালে নাশতা করার পর মনে হলো, এখানে যাদের সাথে আমাদের দেখা করার দরকার, তাদের সাথে যোগাযোগ করা যাক। ওস্তাদ আব্দুল হাকীম আবেদীন সম্পর্কে আগেই জানতাম, তিনি 'যাহরাতুশ শারফ' হোটেলে অবস্থান করছেন। খোবারে সাক্ষাতকালে তিনি তার কক্ষ নাম্বারও আমাদের দিয়েছিলেন। তাই ভাবলাম, আগে তার সাথে সাক্ষাত করে কিছু প্রোগ্রাম ঠিক করা যাক। মাওলানা হোটেলেই অবস্থান করছিলেন। আমি চৌধুরী সাহেবকে নিয়ে হোটেল যাহরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলাম। রিয়াদের সবচেয়ে সুন্দর সড়ক শা'রে আল-মাতার-বিমান বন্দর সড়কে অবস্থিত এ হোটেলটি রিয়াদের সবচেয়ে উন্নত, সবচেয়ে সুন্দর হোটেল। এ হোটেলের সকল কক্ষই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। এক দিনের জন্য ভাড়া ৬০ রিয়াল। শান-শওকত এবং সৌন্দর্যের দিক থেকে আমার ধারণায় এর সমকক্ষ কোনো হোটেল পাকিস্তানেতো নেই'ই বরং মিসর, সিরিয়া এবং ইরাকেও নেই। বিমান বন্দর সড়কের সৌন্দর্যের কথা আর কি বলব। আমাদের করাচি বা লাহোরের কোনো সড়কই এর কমকক্ষ নয়। সড়কের দু'ধারে কৃষি, অর্থ, শিক্ষা,

www.pathagar.com

যোগাযোগ ইত্যাদি মন্ত্রণালয়ের পৃথক পৃথক দফতর। নয়নাভিরাম প্রাসাদ। এক একটার নির্মাণ কাজে ব্যয় হয়েছে লক্ষ লক্ষ ডলার। এর সবগুলো ভবন নির্মিত পাশ্চাত্যের সর্বাধুনিক ডিজাইনে। এক একটার নির্মাণ সৌকর্য এক এক রকম। গত কয়েক বছরে সৌদি সরকারের সকল দফতর রিয়াদে স্থানান্তরিত হয়েছে। কেবলমাত্র পররাষ্ট্র এবং স্বরাষ্ট্র দফতর এখনও যথাক্রমে জেদ্দা এবং মক্কা মুয়াযযামায় রয়েছে। মনে হয় আরও কিছুকাল সেখানেই থাকবে।

ওস্তাদ আব্দুল হাকীম আবেদীন সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, তিনি অপর একটি হোটেলে ফান্দাকুল ইয়ামামাহ- আল ইয়ামামাহ হোটেলে স্থানান্তরিত হয়েছেন। বিমান বন্দর সড়কের নিকটেই অবস্থিত এ হোটেলটিও হোটেল যাহরার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। হোটেলে তাকে পেয়ে গেলাম। তিনি যখন জানতে পারলেন, আমরা একটা সাধারণ হোটেলে উঠেছি, তিনি আমাদের রাজকীয় অতিথি বানানোর চেষ্টা করতে চাইলেন। কিন্তু চেষ্টা করে রাজকীয় অতিথি হওয়া আমাদের পছন্দনীয় নয়। ওস্তাদ আবেদীনকে সাথে নিয়ে আমরা মাওলানার কাছে ফান্দাক আল-সালাম-এ গেলাম। সেখানে সিদ্ধান্ত হয়, যতোদিন রিয়াদে অবস্থান করতে হয়, আমরা এ হোটেলেই থাকবো। জানতে পারলাম, রিয়াদে এ ধরনের মামুলী হোটেল মাত্র গুটি কতেক। যাহ্‌রা আর ইয়ামামার মতো নামকরা হোটেলে অবস্থান করা আমাদের সাধ্যের অতীত। ওস্তাদ আব্দুল হাকীম আবেদীন নিজে আল-ইয়ামামাহ হোটেলে অবস্থানের জন্য বারবার দুঃখ, লজ্জা আর ক্ষমা চাচ্ছিলেন। তিনি জানালেন, আমি এখানে নিজের ব্যয়ে থাকছিনা, বরং আমার মক্কেল যিনি মামলা পরিচালনার জন্য আমাকে বৈরুত থেকে এনেছেন তিনি নিজেও এ হোটেলে অবস্থান করছেন এবং আমাকেও সেখানে তার সাথে রেখে দিয়েছেন।

এই দিন আসরের দিকে মক্কা মুয়াযযামায় আমাদের বন্ধু আব্দুল্লাহ কুলাইব আসেন আমাদের হোটেলে। একটা ব্যক্তিগত কাজে তিনি বর্তমানে রিয়াদে অবস্থান করছিলেন। ওস্তাদ আবদুল হাকীম আবেদীনের কাছে আমাদের সম্পর্কে জানতে পেরে তিনি তৎক্ষণাৎ দেখা করতে চলে আসেন। তার সাথে আরো দু'জন ছিলেন, যাদের সাথে আমাদের পূর্ব পরিচয় ছিলো না। তাদের একজন ছিলেন রিয়াদের কুল্লিয়াতুশ শারিয়াহ- শরিয়া কলেজের অধ্যাপক শেখ মানে আল- কাত্তান। আসলে তিনি মিসরের অধিবাসী। ইখওয়ানের সাথে সম্পর্কের কারণে তাকে মিসর থেকে নির্বাসিত করা হয়েছে। আর অপর জন হচ্ছেন হাযরামাওত এর অধিবাসী আহমদ বাহশূন। রিয়াদের একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। শেখ মানে আল-কাত্তান পরদিন সকালে আমাদেরকে তার বাসায় নাশতার দাওয়াত দেন। আমরা তা কবুল করি।

www.pathagar.com

শেখ আবদুল আযীয ইবনে বায্

মাগরিবের পর মাওলানার সাথে হোটেলে সাক্ষাত করতে আসেন নজদের মশহুর আলিম শেখ আব্দুল আযীয বিন বায্। তাঁর সাথে ছিলেন আরও কয়েকজন। তিনি রিয়াদে আমাদের অবস্থানের কথা জানতে পেরেছেন ওস্তাদ আবেদীনের কাছে। জন্মান্ধ শেখ আব্দুল আযীযের বয়স তেমন বেশি না হলেও সৌদি আরবের বড় বড় কয়েকজন আলিমের মধ্যে তিনিও একজন। জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা, সরলতা ও পরমুখাপেক্ষাহীনতা, ছাত্রসুলভ মেযায এবং সবচেয়ে বড় গুণ সত্য কথা বলার সাহস গোটা দেশে তাকে খ্যাত এবং প্রিয় করে তুলেছে। বর্তমানে তিনি কোনো সরকারি পদে নিয়োজিত নেই। শরীয়া কলেজে পড়ান এবং সেখান থেকে ভাতা পান। মদীনা মুনাওয়ারায় জামেয়া ইসলামিয়া- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর তাকে ভাইস চ্যান্সেলর করা হয়। তার সত্য কথা বলার একটা ঘটনা আমি কখনো ভুলতে পারবো না। ১৯৪৯ সালে আমি মরহুম মাওলানা মাসউদ আলম নদবীর সাথে রিয়াদ আসি। তখন আমরা একদিন সৌদি আরবের প্রধান মুফতী শেখ মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীমের বাসায় উপস্থিত ছিলাম। আলে শেখ অর্থাৎ শেখ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাবের খান্দানের ওলামা-মাশায়েখও সেখানে হাযির। স্বয়ং শেখ আবদুল আযীয বিন বাযও মজলিসে উপস্থিত। তখন পাকিস্তানে সৌদি সরকারের রাষ্ট্রদূত ছিলেন সাইয়্যেদ আবদুল হামীদ আল-খতীব। মজলিসে উপস্থিত সকলে তার দীন-দারীর তারিফ করছিলেন। শেখ আবদুল আযীয বললেন, আমিও সাইয়্যেদ আবদুল হামীদের সম্মান করি। বিশেষ করে পাকিস্তানে তার কর্মতৎপরতার কথা শুনে তো বড়ই আনন্দিত হয়েছি। কিন্তু তিনি রমযানের ইমসাকিয়ায় (সেহরী-ইফতারের ক্যালেন্ডার) বাদশা এবং যুবরাজের ছবি ছেপে খুব খারাপ কাজ করেছেন। এটা তিনি ঠিক করেননি। এর অর্থ দাঁড়ায়, ভবিষ্যতে তার পূজা শুরু হবে। এখানে বলে রাখা ভালো, অন্যান্য আরব দেশের আলিমরা ছবিকে হালাল মনে করলেও নাজদের আলিমরা ছবি হারাম হওয়া সম্পর্কে এখনও একমত। দ্বিতীয়ত, সৌদি আরবে বর্তমানে ওলামাদের মর্জী উপেক্ষা করে ছবি ব্যাপকভাবে প্রচলিত। তা দিন দিন আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবশ্য এটা ওলামাদের প্রভাবই বলতে হবে যে, রিয়াদে কোনো রইস বা কোনো সরকারি কর্মকর্তার বাস ভবনে, হোটেল বা দোকানে প্রকাশ্যে কোনো ছবি নজরে পড়েনি। শেখ বিন বায এতটা জনপ্রিয় যে, সৌদি আরবে বা তার বাইরের অন্যান্য আরব দেশের ছোট-বড় সকলকে তার জ্ঞান, নিষ্ঠা এবং সত্যবাদিতার প্রশংসা করতে শুনেছি। পাকিস্তানে বর্তমান সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ওস্তাদ মুহাম্মদ আহমদ আশ-সুবাইলী আমাদের একখানা চিঠি দিয়েছিলেন তাঁর নামে। চিঠি নিয়ে তাঁর কাছে যাওয়ার ইচ্ছা ছিলো আমাদের।

www.pathagar.com

কিন্তু তিনি নিজেই মাওলানার সাথে সাক্ষাত করতে এসেছেন। আসলে আরব দেশে মেহমানদারীর নীতিই হচ্ছে আগে মেহমানের সাথে সাক্ষাত করে পরে তাকে দাওয়াত দিতে হয়। শেখ আবদুল আযীয আগে থেকেই মাওলানা এবং তাঁর অবদান সম্পর্কে জানতেন। মাওলানার কয়েকটি গ্রন্থও তিনি পড়েছেন। কিন্তু ইতোপূর্বে তাদের সাক্ষাত বা পত্রালাপ হয়নি কখনো। সালাম, দোয়ার পর তিনি বারবার জানতে চাচ্ছিলেন মাওলানা কেমন আছেন।

নাজ্‌দ বাসীদের অভ্যাস, তারা মেহমানকে বারবার কাইফা হালুকুম- কেমন আছেন? আসাকুম তায়্যেবীন-আসাকুম বিখাইরিন- আশা করি ভালো আছেন, আশা করি কুশলে আছেন ইত্যাকার প্রশ্ন করে থাকেন। এসব প্রশ্ন শুনে একজন অনারব মেহমান অস্থির হয়ে যায়। এছাড়াও তারা মেহমানকে বারবার দোয়া করে থাকেন। রিয়াদে তালা উমরুকা- আপনার হায়াত দারাজ হোক- তো প্রতিটি লোকের মুখে মুখে থাকে। এরা নিজেদের ভাষায় প্রতিটি দোয়ার একটা বিশেষ জবাবও দিয়ে থাকে। কিন্তু অসুবিধা দেখা দেয় আমাদের মতো ভিনদেশীদের ক্ষেত্রে। তাদের দোয়ার জবাবে কিছু না বললে তা হয় বেয়াদবী। আর বারবার ঘুরিয়ে কিছু বলার ভাষাতো আমাদের জানা নেই।

সৌদী রাষ্ট্রদূতের পত্রটি আমরা শেখের নিকট হস্তান্তর করলে তিনি এক শাগরেদকে দিয়ে তা পড়িয়ে শুনেন, এরপর সফরের উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচী সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করেন। আলাপ শেষে তিনি মাওলানাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি আমীর আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমানের (বাদশা সউদের চাচা) কাছে যাওয়া পসন্দ করবেন? শেখ জানান যে, বর্তমানে রাজ পরিবারে তিনিই হচ্ছেন সবচেয়ে প্রবীণ ব্যক্তি। মাওলানা যেতে রাজি হলে আমরা শেখের গাড়িতে করেই তাঁর প্রাসাদে পৌঁছি। কিন্তু সেখানে পৌঁছে জানতে পারি আমীর বাসায় নেই। আমরা তাঁর ছোট ভাই আমীর মুসায়েদ ইবনে আবদুর রহমানের (বাদশাহ ফয়সলের অনুপস্থিতিতে যিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে থাকেন) সাথে সাক্ষাত করার জন্য রওয়ানা হই।

প্রাচীন রিয়াদ

পথে বুঝতে পারলাম, রিয়াদের অনেক কিছুই পরিবর্তন হয়েছে। বিরাট বিরাট প্রাসাদ গড়ে উঠেছে, কিন্তু বিশাল ইমরাত আর প্রশস্ত সড়কের পাশাপাশি প্রাচীন রিয়াদের চিহ্ন এখনও বর্তমান রয়েছে। আমাদের জানানো হয়, যে সব বাড়ি-ঘর কাঁচা দেখা যাচ্ছে, ইচ্ছা করেই তা কাঁচা রাখা হয়েছে। কারণ, সেখানকার আবহাওয়া অনুযায়ী কাঁচা ঘরই উপযুক্ত। পাকা বাড়ি-ঘর এয়ারকন্ডিশন্‌ড না করা হলে শীত-গ্রীষ্ম উভয় মৌসুমেই তাতে খুব কষ্ট হয়। কিন্তু পুরাতন বাড়ি-ঘর

www.pathagar.com

ভেঙ্গে নতুন ইমারত তৈরির কাজ শুরু হয়েছে এবং আগামী কয়েক বছরের মধ্যে নতুনভাবে গড়ে উঠবে, নয়া সাজে সজ্জিত হবে। প্রাচীন রিয়াদের একটি গলিতে আমীর মুসায়েদের বাস ভবন। বাস ভবনে পতাকা বা বিশেষ কোনো চিহ্ন নেই, নেই কোনো শান্ত্রী পাহারাদার। তাই শেখের ড্রাইভার আমীরের বাড়ি চিনতে না পেরে অপর এক আমীরের বাড়িতে গিয়ে ওঠেন। আমরা যে ভুল করে অন্য জায়গায় চলে এসেছি, তা বুঝে উঠতে পারিনি। কিন্তু শেখ আব্দুল আযীয এবং ওস্তাদ আব্দুল হাকীম আবেদীন সেখানে পৌঁছেই বুঝতে পেরেছিলেন, আমাদের ভুল হয়েছে। যাই হোক, তাঁরা যাতে আমাদের ভুলের কথা বুঝতে না পারেন এ জন্য আমরা সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করে চা-কফি পান করি, সেখানে কিছু সময় কাটাই। সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পর ওস্তাদ আব্দুল হাকীম আবেদীন আমাদের ব্যাপারটি জানালেন। পরে আমরা আমীর মুসায়েদের বাসায় যাই, কিন্তু তিনি বাসায় ছিলেন না। পরে শেখ আব্দুল আযীয আমাদেরকে তাঁর বাসায় নিয়ে যান। সেখানে শিষ্য-শাগরিদ এবং ভক্তদের ভিড় ছিলো। তাঁর মজলিস ছিলো একান্ত সাদা-সিদা। মেঝেতে কার্পেট পাতা। সালাম মোসাফাহার পর উপস্থিত সকলের সাথে আলাপ পরিচয় হলো। সকলেই তাদের পাকিস্তানি ভাই-এর কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। কোনো পাকিস্তানি বা হিন্দুস্তানি মুসলমানের সাথে নাজদের কোনো আলিমের সাক্ষাত হলে সেখানকার আহলে হাদীসদের সম্পর্কে অবশ্যই খোঁজ-খবর নেবেন। আমরা সংক্ষেপে আহলে হাদীসদের সম্পর্কে তাদের অবহিত করি। এখানে মাওলানা শেখকে তাঁর চারটি আরবি কিতাব উপহার দেন- ইসলাম পরিচিতি, ইসলামের জীবন পদ্ধতি, মুসলমানদের অতীত বর্তমান এবং কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা।

নাজদীদের আতিথেয়তা

এসময় শেখ লোবানের (বুখূর) ধোয়া, কফি এবং চা দিয়ে আমাদের আপ্যায়ন করান। ইতোপূর্বে আরবি এবং সংস্কৃতি এবং তার রীতি-নীতি সম্পর্কে আমাদের সঠিক ধারণা ছিলো না। আজ নাজদের এ মজলিসে আমরা এ সম্পর্কে ধারণা করতে পেরেছি। প্রথমে তাঁর এক খাদেম মিজমার নিয়ে শেখের নিকট গিয়ে দাঁড়ায়। মিজমার কাঠের তৈরি অঙ্গার দান। নানা কারুকার্যে শোভিত এ মিজমারের উপরিভাগ সোনালী রঙ্গে রঞ্জিত। তার উপরে আছে কয়লা রাখার স্থান। শেখ তাঁর পকেট থেকে এক খণ্ড লোবান বের করে কয়লার উপর রাখেন। লোবান জ্বলে ধোঁয়া নির্গত হতে থাকে। খাদেম মিজমার হাতে নিয়ে মজলিসে উপস্থিত সকলের সামনে দু'তিন দফা চক্কর দেয়। আর মজলিসে উপস্থিত সকলে হাত দিয়ে ধোঁয়া আহরণ করে গায়ে মুখে এবং কাপড়ে মাখছিল। কেউ কেউ তো মিজমার হাতে নিয়ে দু'এক মিনিট জামা-কাপড় ও রুমালের ভেতরে রেখে পরে

www.pathagar.com

ফেরত দিতো। আমাদের জন্য দৃশ্যটি ছিলো অত্যন্ত উপভোগ্য। অন্যদের দেখাদেখি আমরাও মিজমারের ধোঁয়া আহরণ এবং উপভোগ করি। লোবানের এ প্রথা আরবদের মধ্যে সুপ্রাচীন। এটাকে মেহমানদের খাতির-তোয়াজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে মনে করা হয়। কিতাবুল আগানী এবং আরবি সাহিত্যের অন্যান্য গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, আব্বাসীয় খলীফাদের দরবারে এভাবে বুখূরের প্রচলন ছিলো।

এরপর শুরু হয় কফির পালা। তার ধরণ ছিলো এ রকম, খাদেম এক হাতে কফি ভর্তি একটা পাত্র এবং অপর হাতে দোয়াতের মতো ছোট ছোট পেয়ালা নিয়ে উপস্থিত হয়। সে চারিদিকে ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকের হাতে একটা করে পেয়ালা দিয়ে তাতে সামান্য কফি দেয়। কফি পান শেষ করে সকলে পেয়ালা খাদেমের হাতে দেয়। এভাবে এক চক্কর শেষ হলে শুরু হয় দ্বিতীয় চক্কর। এক বিশেষ ভঙ্গিতে পেয়ালা হেলিয়ে খাদেমের হাতে ফেরত দেয়ার আগ পর্যন্ত এ ধারা চলতে থাকে। এরপর আসে দুধ বিহীন চা। এরপর আরও এক দফা কফি চলে। নাজদীরা মেহমানের জন্য যে আয়োজন করে, এ হচ্ছে তার সামান্যতম অংশ মাত্র। নাজদীরা কফিতে এলাচি এবং বুন-ইয়ামন বা আবিসিনিয়া থেকে আমদানীকৃত ভূট্টার দানার মতো এক ধরনের জিনিস- গুঁড়া করে মিশ্রিত করে। এ কফি এতোটা কড়া হয় যে কয়েক ফোঁটার বেশি মুখে দেয়া যায় না। আরবদের মধ্যে কফি পানের এ ধারা কবে থেকে শুরু হয়েছে, তা জানা যায়নি। কিন্তু এখন তো তারা দেদার কফি পান করে। অনেকে তো ভোর বেলা কফি পান না করলে সুস্থবোধ করেন না। একবার এক আরবকে অতি প্রত্যুষে কফি তৈরি করতে দেখে মাওলানা বলেন, কফি প্রীতি দেখে আমাদের দেশের পান এবং তামাকখোরদের লজ্জিত হওয়ার কথা। এদের কফির প্রতি আসক্তি আমাদের দেশের পান এবং ধুমপায়ীদের চেয়েও বেশি।

শাহ সউদের নাসেরিয়া প্রাসাদ

শেখ আবদুল আযীয বিন বাযের বাসায় এশার নামায আদায় করে আমরা হোটেলে ফিরে আসি। শেখের ড্রাইভার রাস্তায় আমাদের রিয়াদ দেখান। প্রথমে আমাদেরকে শারে আল-মাতার-বিমান বন্দর সড়ক এবং পরে শারে আল-জামেয়া-বিশ্ববিদ্যালয় সড়ক দেখানো হয়। আলোয় ঝলমল প্রশস্ত রাস্তা রাতের অন্ধকারে চমৎকার দেখাচ্ছিল। বলা হয়ে থাকে, সৌদি সরকার বিগত চার বছরে শুধু সড়ক উন্নয়নেই প্রায় ৭ কোটি বিয়াল ব্যয় করেছে। পরে আমাদের বাদশাহ সউদের নাসেরিয়া প্রাসাদ নিয়ে যায়। এ প্রাসাদের সৌন্দর্য বর্ণনা দেয়ার ভাষা আমার জানা নেই। অন্তত এক মাইল দীর্ঘ এবং অর্ধমাইল প্রস্থ বাগানের ভেতর বিশাল প্রাসাদ। উল্লেখ্য, বাগানে প্রবেশ এবং বাসার আশে পাশে ঘুরা ফেরা করতে কোনো বাধা নেই। যে কোনো ব্যক্তি যখন খুশী এ বাগানে বেড়াতে যেতে পারে। এখানে এসে আমাদের দেশের শাসকদের কথা মনে পড়ে।

www.pathagar.com

পরদিন ২০ নভেম্বর ভোরে রিয়াদের শরীয়া কলেজের তিনজন ছাত্র হোটেলে আমাদের সাথে সাক্ষাত করতে আসে। আরবি ভাষায় প্রকাশিত মাওলানার সব কিতাবই তারা পড়েছে। তারা জানায়, মাওলানার সমস্ত আরবি কিতাব পড়েছে- শরীয়া কলেজে এমন ছাত্রের সংখ্যা কুড়িজনের বেশি। তারা কেবল নিজেরাই এ সব কিতাব পড়েনা, বরং দামেশক থেকে কিতাব আনিয়ে অন্যান্য ছাত্রদের মধ্যে বিলি এবং বিক্রয়ও করে থাকে। আসলে এরা এসেছিল আমাদেরকে একটি অনুষ্ঠানে দাওয়াত করার জন্য। ঐ দিন আসরের পর মাওলানার সাথে সাক্ষাতের জন্য এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। পূর্ব থেকে মাওলানা সম্পর্কে জানে এবং তাঁর কিতাব পড়েছে কেবল এমন ছাত্ররাই এ অনুষ্ঠানে হাজির থাকবে।

পর্দানশীন মহিলাদের বাজার

ওয়াদা অনুযায়ী সকাল নয়টায় আমরা শেখ মান্না আল-কাত্তানের বাস ভবনে যাই। সব্জী বাজারের কাছেই তার বাসা। আমরা দেখতে পেলাম সেখানে মহিলাদের একটা স্বতন্ত্র বাজার বসেছে। ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ই মহিলা। সেখানে পর্দাবিহীন বা নেকাববিহীন কোনো নারী আমাদের চোখে পড়েনি। বোরকা নেকাব পরিহিতা এ সব মহিলা নির্ঝঞ্ঝাটে কেনা-বেচা করছিল। ১৯৪৯ সালে কুয়েতেও আমরা একই দৃশ্য দেখেছি। যারা বলে থাকে, পর্দা সহকারে নারীরা কোনো কাজ করতে পারেনা- এ দৃশ্য দেখে আমরা উল্লেখিত বক্তব্যের অন্তসারশূন্যতা বুঝতে পেরেছি।

আরব জাতীয়তাবাদের পরিণাম

নাশতার পর শেখ মান্না আল কাত্তান-এর সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনায় বিভিন্ন আরব দেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে তিনি গভীর শংকা প্রকাশ করেন। তিনি আমাদেরকে একজন প্রসিদ্ধ জাতীয়তাবাদী আরব কবি 'আল কারবীর একটি কাসীদাও শোনান। কাসীদায় তিনি বলেন ঃ

"তোমার দেশকে স্থান দাও সকল দীন-ধর্মের উর্ধ্বে,
তার জন্যেই রোযা রাখো, তার জন্যেই রোযা খোলো।
সালাম সে কুফরকে, যা আমাদের করে ঐক্যবদ্ধ,
এরপর জাহান্নাম নছীব হলে তাকেও স্বাগত জানাও।
এসব ধর্মতো আমাদের করেছে শতধা বিভক্ত,
পিষ্ট করেছে আমাদের উটের দাঁত আর খুরার তলে।"

আমাদের এ কাসীদা শুনিয়ে তিনি বললেন, আরব জাতীয়তাবাদের এ আন্দোলন কোনো মামুলী আন্দোলন নয় বরং এ হচ্ছে মুসলমানদের ধীরে ধীরে দীন সম্পর্কে উদাসীন করে নাস্তিক্যবাদের দিকে নিয়ে যাওয়ার আন্দোলন। এ আন্দোলনের

www.pathagar.com

নেতৃত্ব দিচ্ছে লেবাননের খ্রিস্টান বা এমন সব মুসলমান, যারা ফিরিঙ্গিদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে দীনকে নিজেদের পথের সবচেয়ে বড় বাধা মনে করে। জানা যায়, এ কাসীদা রচনার জন্য মিসরের বর্তমান সরকার কবি আল কারবীকে নিশানুল কাদাসাহ (Medal of Holiness) খেতাবে ভূষিত করেছে। তিনি এখন আরব জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে কাদীসুল কাওমিয়্যাতিল আরাবিয়াহ- আরব জাতীয়তাবাদীদের মহা পুরোহিত (High priest) খেতাবে ভূষিত।

সেদিন ছিলো শুক্রবার, জুমার দিন। নামাযের সময় হওয়ার একটু আগে ওস্তাদ আব্দুল হাকীম আবেদীন তার এক বন্ধু শেখ আব্দুল্লাহ আল-মিসয়ারীকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। ইনি সৌদি সরকারের আইন বিভাগের সেক্রেটারি। তাদেরকে নিয়ে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটে একটি মসজিদে নামায পড়তে যাই। মসজিদে একজন নওজোয়ান খোতবা পড়ছিল। একটা কাগজে লিখে নিয়ে এসেছে অথবা কোথাও থেকে কপি করে নিয়ে এসেছে আর তাই দেখে দেখে পড়ছিল। শুনেছি রিয়াদে বড় বড় আলিমরাও এরকমই করেন। এমনকি বড় মুফতী শেখ মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীমও মাজমুয়ায়ে খুতাবে আইয়্যামিল জুময়াহ নামক কিতাব থেকে একটি খুতবা মুখস্থ করে এসে শুনিয়ে দেন। এটাও শুনেছি, বড় বড় ধর্মীয় পদগুলো আলে শেখ-শেখ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাবের খান্দানের লোকদের জন্য নির্দিষ্ট। এ পরিবারের কোনো উপযুক্ত লোক পাওয়া না গেলে কেবল তখন অন্য লোককে নিয়োগ করার প্রশ্ন ওঠে। মিশরের শেখ আবদুল মোহাইমেন হারাম শরীফের খতীব বটে, কিন্তু তিনি প্রথম খতীব নন। প্রথম খতীব হচ্ছেন আলে শেখের একজন শেখ আবদুল আযীয ইবনে হাসান। তিনি আগে শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারি ছিলেন, বর্তমানে মন্ত্রী হয়েছেন। সারা বছর রিয়াদেই থাকেন। অবশ্য মাঝে-মধ্যে মক্কা মুয়ায্যামায় গিয়ে হারাম শরীফে খোতবা দিয়ে আসেন।

শরীয়া কলেজের ছাত্রদের সমাবেশ

কর্মসূচী অনুযায়ী আসরের নামাযের পর আমরা শরীয়া কলেজের ছাত্রদের সমাবেশে যাই। প্রায় ৫০ জন ছাত্র উপস্থিত ছিলো। তাদের অধিকাংশই সিরিয়ার অধিবাসী। তাঁরা মাওলানার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রকাশ করে এবং বিভিন্ন বিষয়, বিশেষ করে বর্তমান যুগে ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে প্রশ্ন করে এবং মাওলানা তাদের প্রশ্নের জবাব দেন।

প্রধান মুফতীর সাথে সাক্ষাত

মাগরিবের নামায শেষে আমরা ওস্তাদ আব্দুল হাকীম আবেদীনের সাথে প্রধান মুফতী শেখ মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীমের সাথে সাক্ষাত করার জন্য তাঁর বাসায়

www.pathagar.com

যাই। জন্মান্ধ শেখ ইবরাহীম বর্তমানে আলে শেখের সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে তাঁর সাথে আলোচনা হয়নি। পরে তিনি আমাদের সফর এবং কর্মসূচী নিয়ে আলাপ করেন।

শেখ উমর ইবনে হাসান

পরদিন ২১ নভেম্বর সকালে কয়েকজন আলিমকে সঙ্গে নিয়ে শেখ উমর ইবনে হাসান মাওলানার সাথে সাক্ষাত করতে আসেন। তিনিও আলে শেখ-এর লোক এবং গোটা সৌদি আরবে আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার বিভাগের চেয়ারম্যান। শরীয়ার নিষিদ্ধ কাজ বন্ধ করা এবং সিদ্ধ কাজ চালু করার জন্য এখানে যথারীতি একটা বিভাগ রয়েছে, এটা সৌদি সরকারের একান্ত প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য। এ বিভাগের স্বতন্ত্র পুলিশ এবং জেলখানা আছে। এ বিভাগের প্রতিবন্ধকতার ফলে অন্যান্য মুসলিম দেশের তুলনায় সৌদি আরবে পাশ্চাত্যের সয়লাব ততোটা জোরদার নয়। শেখ উমর অত্যন্ত হাসি-খুশী এবং মিষ্টভাষী। যতোক্ষণ তিনি আমাদের সাথে কাটান, অতিশয় সুমিষ্ট ও প্রভাবশালী ভাষায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা বলেন। তাঁর কথা শুনে মনে হয়েছে, আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করা এবং জনগণকে সংশোধন করার একটা গভীর আগ্রহ রয়েছে তাঁর অন্তরে। পরে তিনি মাওলানাকে নিয়ে যান প্রধান মুফতীর ছোট ভাই শেখ আবদুল লতীফ ইবনে ইবরাহীমের সাথে সাক্ষাতের জন্য শরীয়া কলেজে। তিনি শরীয়া কলেজ এবং দীনী শিক্ষার অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তা। এ দিন আমার এবং চৌধুরী সাহেবের বাজারে একটা জরুরী কাজ ছিলো। তাই আমরা মাওলানার সাথে শরীয়া কলেজে যেতে পারিনি।

মাওলানা শরীয়া কলেজে শেখ আবদুল লতীফ ছাড়া অপরাপর শিক্ষকের সাথে সাক্ষাত করেন এবং তাঁদের পাঠদান শুনেন। তিনি সেখান থেকে ফিরে এসে বলেন, সেখানে বিশুদ্ধ ভাষায় পাঠদান হয় এবং শিক্ষকরা ভালভাবে প্রস্তুতি নিয়ে লেকচার দেন। শেখ মান্না আল-কাত্তান এবং শেখ আবদুর রায্যাক আফিফীর লেকচার মাওলানার বিশেষ মনঃপুত হয়েছে। শেখ আফিফী সেখানে ফিকাহর শিক্ষক। মূলত তিনি মিসরের অধিবাসী কিন্তু বর্তমানে সৌদি নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন। শেখ মুহাম্মদ হামিদ আল ফক্কীর ইনতেকালের পর তিনি মিসরের জমিয়াতুস সুন্নাতিল মুহাম্মাদিয়াহ আমাদের দেশের আহলে হাদীসের অনুরূপ একটা দীনী সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হন। বিশাল জ্ঞানের অধিকারী অথচ অতি বিনয়ী এবং গম্ভীর। মিসরের হলেও দাড়ি দেখে মনে হয় যে, পাকিস্তান বা হিন্দুস্তানের আলিম তিনি।

www.pathagar.com

বাদশাহ সউদ বিশ্ববিদ্যালয় এবং রিয়াদের শরীয়া কলেজ

হিজরী ১৩৭৭ এবং ঈসায়ী ১৯৫৭ সালে রিয়াদে বাদশাহ সউদ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এ যাবৎ রিয়াদে চারটি কলেজ- কুল্লিয়্যাতুল আদাব (সাধারণ কলেজ), কুল্লিয়্যাতুল উলুম (বিজ্ঞান কলেজ), কুল্লিয়্যাতুত্ তিজারাহ (বাণিজ্য কলেজ) এবং কুল্লিয়্যাতুস সাইদালিয়্যাহ (মেডিকেল কলেজ) এবং মক্কা শরীফে কুল্লিয়্যাতুশ শারীয়াহ (শরীয়া কলেজ) চালু হয়েছে। অবশ্য রিয়াদের শরীয়া কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নয়, বরং এর একটা স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র সত্ত্বা রয়েছে। বস্তুত আমরা যতোদূর জানতে পেরেছি, বর্তমানে সৌদি আরবেও আলিম সমাজ এবং আধুনিক শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় এবং শাসনতন্ত্র যাদের অধিকারে রয়েছে- মতদ্বৈততা চলছে এবং তা এক ধরনের দ্বন্দ্ব সংঘাতের রূপ নিচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগে রিয়াদের আলিম সমাজ তাঁদের বাসায় দরসের ব্যবস্থা করতেন এবং তাঁদের সনদই চূড়ান্ত এবং সমাপনী সনদ বলে বিবেচিত হতো। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কলেজ খোলা হলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মিসর এবং সিরিয়ার অনুকরণে আদালতের জন্য উকিল-জজ সৃষ্টি করার মানসে দীনী ইলমের জন্য এক ধরনের দীনী কলেজ কায়েম করতে চান। কিন্তু আলিম সমাজ এক দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যেতে রাজি নন, অন্যদিকে এ যাবৎ যে ধারায় দীনী শিক্ষা চলে আসছে, তাতে পরিবর্তন সাধনকেও তারা সহ্য করতে প্রস্তুত নন। অবশেষে বিষয়টির আপাতত নিষ্পত্তি অথবা বলা চলে দ্বন্দ্বের সাময়িক নিষ্পত্তি এভাবে হয়েছে যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রিয়াদে অন্যান্য কলেজ স্থাপন করলেও শরীয়া কলেজ খুলেছেন মক্কায়। অপরদিকে ওলামাদের দরসের মজলিসকে একটা আইনানুগ রূপ দেয়ার জন্য শরীয়া কলেজ নামে রিয়াদে আর একটি কলেজও খুলেছেন। এর শাসন-শৃংখলা এবং পাঠ্যসূচী সবকিছুই আলিম সমাজের মর্জী অনুযায়ী গৃহীত ও নির্ণীত হয়। রিয়াদ এবং মক্কার শরীয়া কলেজের মধ্যে পার্থক্যও রয়েছে। রিয়াদের শরীয়া কলেজের প্রত্যেক ছাত্রকে মাসিক তিনশ' রিয়াল এবং তার অধীনস্থ দীনী মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে মাসিক ১শ ৫০ রিয়াল করে ভাতা দেয়া হয়। কিন্তু পাশ করে বের হওয়ার পর তাদের জন্য চাকুরীর কোনো নিশ্চয়তা নেই। কোনো মসজিদে খতীবের কোনো পদ বা কোনো মাদ্রাসায় শিক্ষকের কোনো পদ খালি হলে এবং ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে তা পেতেও পারে। কিন্তু মক্কা মুয়ায্যামার শরীয়া কলেজের ছাত্রদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কলেজের মতো ছাত্রাবস্থায় কোনো ভাতা দেয়া হয় না। কিন্তু পাশ করে বেরুবার পর তাদের জন্য চাকুরীর নিশ্চয়তা রয়েছে। চাকুরী না পাওয়া পর্যন্ত তারা মাসে ১২শত রিয়াল ভাতা পাবে অবশ্যই। এমনিভাবে সৌদি আরবেও যেনো দীনী শিক্ষা এবং দুনিয়াবী

www.pathagar.com

শিক্ষার দু'টি স্বতন্ত্র ধারা গড়ে উঠছে। এখনতো মিশ্র অবস্থা চলছে। কয়েক বছর পর অবস্থা এই দাঁড়াবে যে, সরকারী প্রশাসনযন্ত্রের জন্য কর্মচারী বেরুবে বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার অধীনস্থ কলেজগুলো থেকে, আদালতের জন্য কাযী এবং উকিল বেরুবে মক্কা মুয়াযযামার কুল্লিয়্যা শরীয়া থেকে আর মসজিদের জন্য ইমাম এবং খতীব নেয়া হবে রিয়াদের কুল্লিয়্যাহ শরীয়া থেকে। অর্থাৎ অন্যান্য আরব দেশের মতো ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী সৃষ্টি হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের মধ্যে কমিউনিজম এবং অন্যান্য নাস্তিক্যবাদী চিন্তাধারা প্রভাবিত ছাত্রদের সংখ্যা কম নয়। দীন এবং তার সুস্পষ্ট বিধানকে তারা উপহাস পর্যন্ত করে- এ কথা জানতে পেরে আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছি। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

ওস্তাদ আহমদ আল-জাসের

শরীয়া কলেজ থেকে ফেরার পথে মাওলানা ওস্তাদ আহমদ আল-জাসেরের সাথে তাঁর প্রেসে সাক্ষাত করেন এবং দীর্ঘ বৈঠকে মিলিত হওয়ার জন্য পরের দিন সময় নেন। তিনি রিয়াদের সবচেয়ে বড় আদীব (সাহিত্যিক)। বরং সত্যকথা বলতে কি, তিনি সকল সাহিত্যিকের গুরু বলে পরিচিত। তাঁর সম্পর্কে আলোচনা ছাড়া রিয়াদ সম্পর্কে কোনো আলোচনা বা কোনো নিবন্ধ সম্পূর্ণ হয় না। তিনি নাজদের অধিবাসী। আরবের ভৌগলিক বিবরণ সম্পর্কে যে কয়েকজন লোক নির্ভরযোগ্য বলে স্বীকৃত, তিনি তাদের অন্যতম। ভূগোল সম্পর্কে তাঁর গবেষণামূলক নিবন্ধ মাসিক গবেষণা পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হয়। তিনি কয়েক বছর আগে রিয়াদে 'রিয়াদ প্রেস' নামে প্রথম প্রেস স্থাপন করেন। এ প্রেস থেকেই তিনি সাপ্তাহিক 'আল-ইয়ামামা' প্রকাশ করেন। কয়েক বছর আগ পর্যন্ত তাঁর এ পত্রিকা ছিলো রিয়াদের একমাত্র পত্রিকা। কিন্তু বর্তমানে রিয়াদ থেকে সাপ্তাহিক 'আল-কাসিম' এবং মাসিক 'আল-জাযীরা'ও প্রকাশিত হয়। মাওলানা তাঁর সাথে সাক্ষাত করে সফর সম্পর্কে তথ্য এবং ঐতিহাসিক স্থান সম্পর্কে বাড়তি কিছু জ্ঞান লাভ করতে চান। এমনিতেই তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ, তাছাড়া প্রেসের খটখট শব্দে সেখানে কোনো বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাই বিস্তারিত আলোচনার জন্য তিনি পরদিন মাওলানাকে বাসায় সময় দেন।

আলিমদের সরলতা

দুপুর তিনটার পর আমরা শেখ আবদুল আযীয বিন বাযের বাসায় যাই। তিনি আমাদের দুপুরে খাওয়ার দাওয়াত দিয়েছিলেন। আরব দেশ বিশেষ করে নাজ্‌দ, হিজায এবং সিরিয়ার লোকেরা দুপুরের খাবার খুব দেরিতে খায় অর্থাৎ তিন-চারটার মধ্যখানে। শুনেছি তারা রাতের বেলা প্রায়ই খায় না, বা খেলেও খুব সামান্য। তাই তারা দুপুরেই খাবার দাওয়াত দিয়ে থাকে। শেখ আবদুল আযীয

www.pathagar.com

এ উপলক্ষে আরও কিছু লোককে দাওয়াত করেন। এদের অধিকাংশই তাঁর ছাত্র এবং ভক্ত। খানা একে বারেই সাদা সিধে এবং সম্পূর্ণ আরবি ধাঁচের। এখানে ওলামাদের সরলতা এবং শান-শওকত দেখার মতো। অধিকাংশ আলিম এখনও সাদা-সিধে জীবন যাপন করছেন। বিশেষ করে শেখ আবদুল আযীয তো একান্ত সাদা-সিধে জীবনযাপনে অভ্যস্ত। অবশ্য কোনো কোনো আলিম বর্তমানে ধীরে ধীরে আমীরানা শান-শওকতের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন।

আসরের পর আমরা হোটেলে ফিরে আসি। ইচ্ছা ছিলো কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার। কিন্তু তখনই শরীয়া কলেজের কয়েকজন ছাত্র এসে উপস্থিত। এসেই তারা মাওলানার সাথে নানা বিষয়ে আলোচনা জুড়ে দেয়। তাদের মুখে জানতে পারলাম, আরব জাতীয়তাবাদের বিষ কেবল রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়েই নয়, বরং শরীয়া কলেজেও সংক্রমিত হচ্ছে। এদের একজন আরব জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে লিখিত তার একটি নিবন্ধও পড়ে শোনায় এবং এ ব্যাপারে মাওলানার সাথে পরামর্শও করে। কিছুক্ষণ পর হাযরা মাওতের দু'ব্যক্তি আসেন, একজন আসেন ইন্দোনেশিয়ার। মাগরিবের নামাযের পর আরও ৯/১০ জন পাকিস্তানি আগমন করেন। শিক্ষা এবং চাকুরী উপলক্ষে এরা রিয়াদে অবস্থান করছেন। আমাদের কক্ষ তখন কানায় কানায় পূর্ণ। কিছুক্ষণ এদের সাথে আলাপ-আলোচনা হয়। যেহেতু মাগরিবের পরই আমাদের প্রোগ্রাম ছিলো শেখ আব্দুল লতীফ ইবনে ইব্রাহীম এবং আমীর আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমানের বাসায় যাওয়ার, তাই ধন্যবাদ জানিয়ে এবং ক্ষমা চেয়ে এদের সকলকে বিদায় করি। এরপর আগে আমরা শেখ আব্দুল লতীফের বাসায় যাই। শরীয়া কলেজের শিক্ষাব্যবস্থা এবং শিক্ষকদের সম্পর্কে তাঁর সাথে আলোচনা হয়। তিনি আমাদের শরীয়া কলেজের পাঠ্য তালিকা দেয়ার ওয়াদা করেন। কিন্তু পরে বোধ হয় তিনি ভুলে যান এবং আমাদেরও স্মরণ করিয়ে দেয়ার সুযোগ হয়নি। তাই আমরা পাঠ্য তালিকা সংগ্রহ করতে পারিনি।

আমীর আব্দুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান

এরপর আমরা আমীর আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমানের বাসভবনে যাই। তিনি বাসায় ছিলেন। আমাদের আন্তরিক সম্বর্ধনা জানান। পাকিস্তান ও হিন্দুস্তান প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনা থেকে বুঝতে পারলাম, তিনি বিপুল জ্ঞানের অধিকারী। সকল বিষয়ে খবর রাখেন এবং পত্র-পত্রিকা ও বই-পুস্তক নিয়মিত পড়েন। আমরা জানতে পারলাম তার ব্যক্তিগত পাঠাগার বিশাল এবং তাতে গ্রন্থের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। তিনি মাওলানার কিছু কিতাবতো আগেই পড়েছেন এবং অন্যান্য কিতাব পড়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। আমরা তাঁকে

www.pathagar.com

মাওলানার এক সেট আরবি কিতাব দেয়ার ওয়াদা করি। পরবর্তী সাক্ষাতে এই ওয়াদা আমরা পূরণ করেছি।

আলোচনা প্রসঙ্গে দেরইয়ার কথা উঠলে তিনি বলেন ঃ দেরইয়া এখান থেকে ১৫ মাইল দূরে। সেখানে আমার নিজস্ব প্রাসাদ আছে। আমরা আপনাদের আগামী পরশু সেখানে যাওয়ার এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত অবস্থান করার দাওয়াত দিচ্ছি। আপনারা সেখানে অবস্থান করে দেরইয়ার ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাবেন এবং আমার বাগানে বেড়াতেও পারেন। আমরা আনন্দের সাথে তাঁর দাওয়াত কবুল করি।

এশার নামাযের পর আমরা শেখ উমর ইবনে হাসানের বাসায় যাই। অপরাপর আলিমের তুলনায় তাঁর বাসা পাকা এবং জাঁকজমকপূর্ণ। কোনো চিপা গলিতে নয়, বরং বিশাল সড়কের পাশে। তখন তাঁর বাসায় উপস্থিত ছিলো আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার বিভাগের একদল সিপাহী। সম্ভবত তিনি তাদের কাছ থেকে সারা দিনের কাজের হিসেব নিচ্ছিলেন। আমাদের দেখেই তিনি তাদের বিদায় করলেন। আলোচনা চলাকালে তিনি মাওলানার অবদান তাঁর ভাষায় জিহাদ ও মুজাহিদদের বিরাট পুরস্কারের উল্লেখ করেন এবং মাওলানাকে বার বার দোয়া করেন। এরপর তার আলোচনার ধারা পরিবর্তন হয়। তিনি তাকলীদের নিন্দা ও প্রতিরোধে চারি ইমামের উক্তি উদ্ধৃত করতে থাকেন। সুখের বিষয় এরাতো অন্তত তাত্ত্বিক দিক থেকে তাকলীদের পক্ষপাতী নন। যদিও কার্যত তাঁরা হাম্বলী ওলামাদের প্রাচীন গ্রন্থ পড়েন এবং পড়ান আর তাদের জ্ঞানের বৃত্ত তাদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। আসলে তাঁরা বলতে চান, আমরা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের তাকলীদ করিনা, তাঁর ইত্তেবা-অনুসরণ করি। তাঁর বা ইমাম ইবনে তাইমিয়া এবং ইমাম ইবনে কাইয়্যেমের কোনো উক্তি হাদীসের পরিপন্থী দেখতে পেলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করেন। স্বয়ং ইমাম ইবনে কাইয়্যেম তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ আ'লামুল মুওকেঈন-এ এবং ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব ইমামদের তাকলীদ করতে বারণ করে তাঁদের ইত্তেবা করার দাওয়াত দিয়েছেন।

ওস্তাদ হামদুল জাসেরের লাইব্রেরি

পরদিন ২২ নভেম্বর ভোরে ওস্তাদ হামদুল জাসের আমাদের হোটেলে আসেন এবং তাঁর গাড়িতে করে আমাদের তাঁর বাসায় নিয়ে যান। বাসায় দু'টি কক্ষে ঠাঁসা অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থে সমৃদ্ধ তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরি। সেখানে দেখতে পাই তাঁর আলেমানা শান। কিতাব দেখলে তিনি সব কিছুই ভুলে যান, কোনো কিছুর কথাই খেয়াল ছিলোনা তাঁর। অন্দর মহল থেকে চা আসে, কিন্তু তা একদিকে রেখে দিয়ে কিতাব দেখানোর কাজে ডুবে যান। এমনকি চা ঠাণ্ডাও হয়ে যায় বরং কিতাবের ধাক্কা লেগে একটা পেয়ালা পড়ে ভেঙ্গেও যায়। তাঁর কোনো দিকেই খেয়াল নেই

www.pathagar.com

বিন্দু মাত্র। কোনো স্থান সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞেস করলে তিনি তৎক্ষণাৎ বলে দেন স্থানটি কোথায় অবস্থিত, তার পুরাতন নাম কি, এখন কি নামে প্রসিদ্ধ। কখনো কোনো স্থান সম্পর্কে সন্দেহ হলে কোনো প্রাচীন আরব কবির কবিতা আবৃত্তি করে সে সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত নিতেন। আমরা তাঁর সাথে দীর্ঘ তিন ঘণ্টা সময় কাটাই। আরবের বিভিন্ন স্থান এবং নিদর্শন সম্পর্কে মাওলানা তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু জেনে নেন। কিছু নিজে নোট করেন আর কিছু আমাকে নোট করতে বলেন। বিদায়ের জন্য অনুমতি চাইলে তিনি পায়ে হেঁটে এসে আমাদের বিদায় জানান।

যোহরের পর শেখ আবদুল আযীয ইবনে বাযের এক ছাত্র শেখ মুহাম্মদ হাসানের বাসায় আমাদের খাওয়ার দাওয়াত ছিলো। শেখ আবদুল আযীয এবং তাঁর অপরাপর শিষ্য ও ভক্তবৃন্দেরও দাওয়াত ছিলো। শেখ মুহাম্মদ হাসান ফিলিস্তিনী মুহাজির। নাবলুসের কাছে ছিলো তাঁর বাড়ি।

আমীর মুসায়েদ ইবনে আবদুর রহমান

এরপর আমরা ওস্তাদ আবদুল হাকিম আবেদীনকে নিয়ে আমীর মুসায়েদ ইবনে আবদুর রহমানের সাথে সাক্ষাতের জন্য তাঁর বাসভবনে যাই। আমীর মাওলানার সাথে মিলিত হয়ে অত্যন্ত খুশী হন। তিনি আগে থেকেই মাওলানাকে ভালোভাবে জানতেন। ১৯৪৯ সালে হজ উপলক্ষে তিনি মক্কা মুয়ায্যামায় উপস্থিত ছিলেন। হজের আগে তিনি একদিন মরহুম মাওলানা মাসউদ আলম নদবীকে অতি আগ্রহের সাথে তাঁর বাসায় দাওয়াত দেন এবং মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন। তখন পর্যন্ত মাওলানার যেসব কিতাবের আরবি তরজমা প্রকাশিত হয়েছিল, মাওলানা নদবী তাঁকে সেগুলোও উপহার দিয়েছিলেন। এবারের সাক্ষাতে তিনি মাওলানার নতুন কিতাবের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। আমরা তাঁকে কথা দেই এবং পরবর্তী সাক্ষাতে তা তাঁর খেদমতে পেশ করি। আমীর মুসায়েদ জানান, শাহ সউদ যখন পাকিস্তান গিয়েছিলেন, তখন আমিও তার সাথে ছিলাম। মাওলানা মওদূদী তখন জেলে ছিলেন। বাদশাহ সউদ পাকিস্তানের তদানীন্তন গবর্নর জেনারেল জনাব গোলাম মোহাম্মদের নিকট সুপারিশ করেন মাওলানাকে মুক্তি দেয়ার জন্য। জবাবে তিনি জানান, মাওলানা ক্ষমা ভিক্ষা করলে আমরা তাঁকে মুক্তি দেবো। কিন্তু মাওলানা ক্ষমা চাইতে অস্বীকার করেন। এজন্য তিনি মুক্তি পাননি। আমীর মুসায়েদ মাওলানার অটল মনোভাবের জন্য তাঁর প্রশংসা করেন, এর পুরস্কারের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। তিনি বলেন, তখন ক্ষমা চাওয়ার অর্থ হতো, মাওলানা নিজেকে অপরাধী বলে স্বীকার করে নেয়া।

www.pathagar.com

আমাদের সফর সম্পর্কে আলোচনাকালে আমীর আমাদের নিশ্চয়তা দিয়ে বলেন, সফরে সুযোগ-সুবিধা এবং এ সম্পর্কে স্থানীয় আমীরদের নির্দেশ দানের ব্যাপারে যতদূর সম্ভব তিনি এবং সৌদি সরকারের অন্যান্য কর্মচারীরা আদৌ ত্রুটি করবেন না। আমীর মুসায়েদকে একেবারেই কম বয়সের দেখাচ্ছিল। যেহেতু তিনি দাড়িবিহীন ছিলেন, তাই তাঁর বয়স সম্পর্কে কোনো অনুমান করা সম্ভব হয়নি। হয়তো তাঁর শরীরের গঠনই এমন, অথবা সত্যি সত্যিই তাঁর বয়স কম। কারণ, তাঁর পিতা আবদুর রহমান ইবনে ফয়সলের ইনতেকাল হয়েছে ১৯৩২ সালে। কিছুক্ষণ তাঁর সাথে কাটিয়ে অনুমতি নিয়ে আমরা হোটেলে ফিরে আসি।

আসরের পর হফূফের মাশায়েখের চার পুত্র মাওলানার সাথে দেখা করতে আসেন। তারা মাওলানার অধিকাংশ আরবি কিতাব আগেই পড়েছিলেন। পূর্ব থেকেই তারা মাওলানাকে ভালোভাবে জানতেন। তারা জানান, হফূফের আলিম সমাজ অধীর আগ্রহে মাওলানার আগমনের প্রতীক্ষায় ছিলেন। মাওলানা সরাসরি রিয়াদ পৌঁছেছেন জানতে পেরে তারা ভীষণ আফসোস করেন। হফূফের ঐতিহাসিক নির্দশন সম্পর্কে মাওলানা তাদের সাথে আলোচনা করেন। মাওলানার আরবী কিতাব 'আল-হিজাব' (পর্দা গ্রন্থের আরবি তরজমা) প্রসঙ্গে আলোচনাকালে তারা আরব দেশে পর্দাহীনতা প্রতিরোধ সম্পর্কেও আলোচনা করেন। আল-হামদুলিল্লাহ, পর্দা সম্পর্কে নাজদের আলিম সমাজ মাওলানার সাথে একমত। অন্যান্য আরব দেশের আলিম সমাজ তো এ ব্যাপারে তত্ত্ব এবং বাস্তব উভয় দিক থেকেই আত্মসমর্পণ করেছেন।

মাগরিবের পর শরীয়া কলেজের ছাত্রদের একটি বিরাট দল এসে হাযির হয়। এদের মধ্যে পাকিস্তান এবং হিন্দুস্তানের ছাত্রও আছে। বিপুল সংখ্যায় ছাত্র এবং শেখদের আগমনে হোটেল মালিকেরও চোখ খুলেছে। প্রথম দু'তিন দিন হোটেল মালিক আমাদের তেমন কোনো গুরুত্বই দেননি। কিন্তু এখন তিনি আমাদের বেশ খেয়াল রাখেন। তিনি আমাদের কক্ষে অতিরিক্ত চেয়ারের ব্যবস্থা করেন। যদিও প্রয়োজনের তুলনায় তাও ছিলো অপ্রতুল। চেয়ারের অভাবে অনেক ছাত্রকে খাটের উপর বসতে হয়।

শেখ আবদুল্লাহ্ ইবনে খামীস

এশার নামাযের পর রিয়াদের আদালতের উচ্চ পদে আসীন শেখ আবদুল্লাহ্ ইবনে খামীস আগমন করেন। বর্তমানে তিনি প্রতিমন্ত্রী। সাহিত্যে তাঁর বিশেষ অনুরাগ। সাহিত্য বিষয় তাঁর কিছু গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। ফিকাহ, ইতিহাস এবং ভূগোলেও তাঁর ভালো দখল। তিনি দেরইয়ার অধিবাসী এবং এখনও সেখানে বেশ যাতায়াত করেন। তিনি ফিকাহ্ এবং ইতিহাস প্রসঙ্গে অনেক আলোচনা

www.pathagar.com

করেন। পাকিস্তান এবং কাশ্মীর সম্পর্কেও মাওলানাকে অনেক প্রশ্ন করেন। তাঁর এবং ছাত্রদের উপর মাওলানার জবাবের শুভ প্রভাব পড়ে। রাত ১২টার পর এরা ফিরে যান। এমনকি এ রাতে আমরা খাওয়ারও সুযোগ পাইনি।

দেরইয়া

পরদিন ২৩ নভেম্বর দুপুর ১১টায় আমাদের দেরইয়া যাওয়ার প্রোগ্রাম। আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য আমীর আবদুল্লাহর গাড়ি হোটেলে এসেছে। আমীর নিজে খুব ভোরে দেরইয়া রওয়ানা হয়েছেন। আমরা যে গাড়িতে রওয়ানা করেছি, তা চালাচ্ছিলেন তাঁর সেক্রেটারি কামাল আন-নাজ্‌ম। কামাল একজন ফিলিস্তিনী মুহাজির। গত ৮/৯ বছর ধরে তিনি আমীর আবদুল্লাহর এখানে চাকুরী করছেন। সে বৈরুতে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তাই অন্য আরবদের তুলনায় ভালো ইংরেজি বলে কামাল।

ওয়াদিয়ে হানিফা এবং মুসাইলামা কায্‌যাবের জন্মস্থান

রিয়াদ থেকে দেরইয়া পর্যন্ত চমৎকার পাকা রাস্তা। রিয়াদ থেকে বৈরুতেই আমরা ওয়াদিয়ে হানীফায় পৌঁছি। শুনেছি এ ওয়াদী (মাঠ) নাকি দৈর্ঘে দেড়শ মাইল বিস্তৃত। এই ওয়াদী ছিলো বনু হানীফা গোত্রের আবাসভূমি। তাই এই নামকরণ। এই ওয়াদীতে রিয়াদ থেকে প্রায় ৪৫ মাইল এবং দেরইয়া থেকে প্রায় তিরিশ মাইল দূরত্বে আকরাবা নামে একটা স্থান আছে। এ স্থানে হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রাঃ) শাসনকালে হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ এবং মুসাইলামা কায্‌যাবের মধ্যে যুদ্ধ হয়। এ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে যে সব সাহাবী শহীদ হয়েছেন, এখনও সেখানে তাঁদের কবর রয়েছে। আকরাবারই একাংশের নাম জুবাইলা। মুসাইলামা কাযযাব এখানেই সর্বপ্রথম নবুয়তের দাবি করে। এর দক্ষিণ-পশ্চিমে কয়েক মাইল দূরে 'ওয়াইনা'- মুসাইলামা কায্‌যাবের জন্ম স্থান। এ ঐতিহাসিক স্থানগুলো দেখার আমাদের একান্ত আগ্রহ ছিলো। কিন্তু সেদিকের রাস্তা সম্পূর্ণ কাঁচা। আর গত কয়েক দিন ধরে একটানা বৃষ্টি হচ্ছিলো। উপত্যকায় পানি গড়িয়ে রাস্তা একেবারেই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তাই এ ঐতিহাসিক স্থানগুলো দেখার কোনো সুযোগ আমরা করতে পারিনি।

দেরইয়ার ঐতিহাসিক নিদর্শন

১২টার দিকে আমরা দেরইয়ার পৌঁছি। এটা অত্যন্ত শস্য-শ্যামল জায়গা। বেশ কিছু খেজুর বাগান আছে এখানে। এসব বাগানে পানি সেচ করা হয় কূপ থেকে। ১৮১৮ সাল পর্যন্ত এ স্থানটি ছিলো আলে সউদের রাজধানী এবং বিপ্লবী সংস্কারক শেখ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাবের সংস্কার আন্দোলনের কেন্দ্র। কিন্তু ১৮১৮

www.pathagar.com

সালে মিশরের তুর্কী শাসনকর্তা মুহাম্মদ আলী পাশার পুত্র ইব্রাহীম পাশা হামলা চালিয়ে দেরইয়ার সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। এরপর সেখানে ধ্বংস্তূপ ছাড়া আর কোনো চিহ্নই ছিলো না। এ হামলার মুখে আলে সউদ সেখান থেকে পলায়ন করে রিয়াদে আশ্রয় নেয়। আমরা সেখানে পৌঁছেই প্রথমে এর ধ্বংসস্তূপ প্রত্যক্ষ করি। গোটা এলাকায় মাত্র কয়েকটি ঘর রয়েছে। বাকী বিশাল এলাকা বিরান পড়ে আছে। আলে সউদের আমীর-ওমরাদের রাজপ্রাসাদের দেয়াল ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজা-জানালাসহ। অনেক দেয়াল বেশ উঁচু। ভাবতে অবাক লাগে, কাঁচা দেয়ালগুলো এতোদিন কি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এর কারণ হয়তো এ হতে পারে যে, সেখানকার মাটি খুব শক্ত এবং সেখানে বৃষ্টিও খুব কম হয়। একটা স্থান সম্পর্কে আমাদের বলা হয়, এখানে শেখ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাবের মসজিদ ছিলো। চৌধুরী সাহেব এখানে মসজিদ এবং আলে সউদের আমীরদের চারটি চিত্র গ্রহণ করেন। এরপর আমরা আমীর আব্দুল্লার প্রাসাদে যাই। ওস্তাদ আবদুল হাকীম আবেদীনও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। মাওলানার সাথে সাক্ষাত-পরিচয়ের জন্য তাঁরা দেরইয়ার অনেক শেখকেও দাওয়াত করেছিলেন। তাদের মধ্যে শেখ আব্দুল্লাহ ইবনে খামীসও ছিলেন। চীন-ভারত সম্পর্ক এবং কাশ্মীর সম্পর্কে পণ্ডিত নেহেরুর নীতি নিয়েও আলোচনা হয়। পাকিস্তানের ধর্মীয় সম্প্রদায় বিশেষ করে শিয়াদের সম্পর্কেও তারা অনেক প্রশ্ন করেন।

আরব জাতীয়তাবাদের ফিতনা

প্রায় তিনটার দিকে দুপুরের খাওয়া হয়। খানা ছিলো সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য রীতির। খাওয়ার সময় আলোচনাকালে মাওলানা আরব জাতীয়তাবাদের ফিতনা সম্পর্কে আলোচনা করে বলেন, ইসরাইল আরবদের সাথে যে আচরণ করছে, তা হিন্দুস্তানে মুসলমানদের সাথে আচরণের চেয়ে মোটেই ভিন্ন নয়। কিন্তু আরব জাতীয়তাবাদের পরিণতি হচ্ছে এই যে, পণ্ডিত নেহরু যখন এখানে আসেন, তখন আপনাদের অনেক পত্রিকাই তাঁকে রাসূলুস সালাম (শান্তির দূত) উপাধি দিয়ে বিপুল সম্বর্ধনা জানায়। কিন্তু আপনারাই বলুন, পাকিস্তানের জনগণ যদি বেনগুরিয়ানকে (ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী) পাকিস্তানে দাওয়াত করে তেমনি বিপুল সম্বর্ধনা জানায়, তখন আপনাদের মনের অবস্থা কেমন হবে? কোনো কোনো আরব দেশ সত্যি সত্যিই হিন্দুস্তানকে পাকিস্তানের উপর প্রাধান্য দেয়। আমীর আবদুল্লাহ একথার প্রতিবাদ করে তাঁর দেশ সম্পর্কে বলেন, যাই হোক, এখানে পাকিস্তানকে অগ্রগণ্য মনে করা হয়।

www.pathagar.com

খাওয়ার পর আমরা আমীর আবদুল্লাহর বাগানে ভ্রমণ করি। সুন্দর সাজানো খেজুর বাগান। এছাড়াও তাতে রয়েছে মালটা, জাম্বুরা এবং আঙ্গুর গাছ। কমলাকে এরা বলে ইউসুফ আফেন্দী। আফেন্দী তুর্কী শব্দ। উর্দুতে যেমন কারো নামের সাথে সাহেব বা হিন্দীতে বাবু ব্যবহার হয়, তেমনি তুর্কীতে ব্যবহার হয় আফেন্দী। জর্দান, সিরিয়া এবং মিশরেও কমলা লেবুর জন্য এ শব্দটি ব্যবহার হয়। খুব সম্ভব ইউসুফ নামে কোনো ব্যক্তি কমলা লেবুর গাছ সে দেশে প্রথম নিয়ে যায় বলে তা এ নামেই পরিচিত হয়েছে।

আছরের নামাযের পর আমরা রিয়াদ ফিরে আসি। পথে কামাল আন-নাজ্‌ম এর কথাবার্তায় মনে হলো সেও আরব জাতীয়তাবাদে প্রভাবিত। মাওলানা তাকে জিজ্ঞেস করেন, ফিলিস্তিনে আরব খ্রিস্টানদের কি অবস্থা? তিনি জানান, এরা অতি সহজে ইহুদি এবং আরব এলাকার মধ্যে যাতায়াত করে। অথচ তাদের এলাকায় মুসলমানদের যাতায়াত কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়। মাওলানা তাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনারা কি আশা করেন যে, ভবিষ্যতে কখনো আরব এবং ইহুদিদের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধলে খ্রিস্টানরা মুসলমানদের সাথে থাকবে? জবাবে কামাল জানায়, এতে সন্দেহ রয়েছে। মাওলানা বলেন, কিন্তু মুসলিম জাহানের সকল অ-আরব মুসলমানই আপনাদের সাথে থাকবে। এরপর কামাল কিছু বলেননি। কিন্তু আশা করা যায়, হয়তো তিনি এটা উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, আমাদের আরব ভাইরা কিসের বিনিময়ে কাদের সহানুভূতি হারাচ্ছে।

মূল্যবান বই উপহার

এশার পর আমরা ওস্তাদ আবদুল হাকীম আবেদীনের সাথে প্রধান মুফতীর বড় সন্তান শেখ আবদুল আযীয ইবনে মুহাম্মদের বাসায় যাই। তিনি আমাদের জন্য ফলের আয়োজন করেছিলেন। রিয়াদে অধিকাংশ ফল আসে লেবানন থেকে বিমানযোগে। এরা যেহেতু দুপুরের খানা অনেক দেরীতে খায়, তাই রাতে সামান্য ফল খেয়ে নেয়। শেখ আবদুল আযীযের বাসায় আরও কিছু লোক উপস্থিত ছিলেন। সৌদি আরবে সরকারী ব্যয়ে হাদীস, ফিকাহ এবং আকায়েদ সংক্রান্ত অনেক কিতাব প্রকাশ করা হয়। শেখ আবদুল আযীয এসব কিতাব প্রকাশের দায়িত্বে আছেন। তিনি মাওলানাকে এসব কিতাবের এক একটি কপি উপহার দেন। মাওলানা তাকে এবং তার মাধ্যমে তার পিতাকে ধন্যবাদ জানান এবং তার প্রকাশিত আরবী কিতাবগুলো শেখকে উপহার দিয়ে ভবিষ্যতে প্রকাশিত আরবী কিতাবও তার খেদমতে পেশ করার প্রতিশ্রুতি দেন।

পরদিন ২৪ নভেম্বর শেখ উমর ইবনে হাসানের বাসায় যোহরের পর আমাদের খাওয়ার দাওয়াত ছিলো। আমরা যখন তার বাসায় পৌঁছি, তখন তিনি শেখ

www.pathagar.com

আবদুল লতীফের ফতোয়া এবং মাওলানার 'রাসায়েল ও মাসায়েল' পড়ছিলেন এবং সেখানে উপস্থিত কয়েক ব্যক্তিকে শুনাচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ আমরাও শুনি। পরে তিনি ফতোয়ার কিতাবটি মাওলানাকে উপহার দেন।

সৌদি সরকারের উদারতা

খাওয়া দাওয়া শেষে শেখ আবদুল আযীয বিন বা'যকে দেখার জন্য আমরা তাঁর বাসায় যাই। তিনি জানান, মাওলানা সম্পর্কে গত পরশু আমি বাদশা সউদের (বর্তমানে যিনি দাম্মাম অবস্থান করছেন) নিকট তারবার্তা পাঠিয়েছিলাম। আজ তাঁর কাছ থেকে জবাব এসেছে। তিনি জানতে চেয়েছেন, মাওলানার সাথে আর কতজন লোক আছে এবং তিনি কোন্ কোন্ স্থান দেখতে চান। এসময় শেখ আমাদের কাছ থেকে দর্শনীয় সকল স্থানের নাম জেনে নিয়ে বাদশাহর তারবার্তার জবাব দেন। সেখানে আমরা এটাও জানতে পারি, উপ-প্রধানমন্ত্রী আমীর মুসায়েদ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে তারবার্তা পাঠিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে এ তারবার্তার কপিও দেন।

আসরের পর আমাদের চায়ের দাওয়াত ছিলো শেখ আব্দুল্লাহ ইবনে খামীসের বাসায়। শেখ আমাদেরকে তাঁর সদ্য প্রকাশিত দু'টি আরবি কিতাবও উপহার দেন। তিনি আমাদের জানান, রিয়াদ থেকে একটা মাসিক আরবি পত্রিকা বের করার কথা তিনি ভাবছেন গত দু'মাস থেকে। পত্রিকাটির জন্য তিনি মাওলানার কাছে লেখা চান। আমরা পাকিস্তান প্রত্যাবর্তন করে লেখা পাঠাবার ওয়াদা করি। পরে ১৯৬০ সালের মার্চ মাস থেকে পত্রিকাটি "আল-জাযীরাহ" নামে যথারীতি প্রকাশিত হয় এবং এর কপি আমাদের কাছেও নিয়মিত আসছে।

ফিলবীর সাথে সাক্ষাত

এশার পর আমীর আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমানের বাসায় আমাদের খাওয়ার দাওয়াত ছিলো। আমীর মাওলানার সম্মানে অপরাপর আমীর ও শেখদের দাওয়াত করেন। আমীর আবদুল্লাহ এই দিন দুপুরে মাওলানার 'সুদ' বই-এর আরবি তরজমা 'আল রিবা' পড়েছেন। বেশ কিছুক্ষণ তিনি সুদ বই নিয়ে আলোচনা করেন এবং এর ভূয়সী প্রশংসা করেন। সুদ হারাম হওয়া সম্পর্কে মাওলানা ইনজীল থেকেও প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইনজীলের ঐতিহাসিক মূল্য সম্পর্কেও আলোচনা হয়। পরে ইবনে জারীরের তাফসীর এবং ইতিহাস নিয়ে আলোচনা চলে। আমরা বুঝতে পারলাম, প্রাচীন গ্রন্থ সম্পর্কেও আমীর আবদুল্লাহর গভীর পড়াশুনা আছে।

খাওয়ার সময় জানতে পারলাম, খানার টেবিলে মিঃ সেন্ট জন ফিলবীও উপস্থিত রয়েছেন। তিনি একজন বিশিষ্ট ইংরেজ প্রাচ্যবিদ। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে তিনি

www.pathagar.com

ছিলেন ঝিলামের ডেপুটি কমিশনার। যুদ্ধ উপলক্ষে ১৯২১ সালে ইরাক যান। আরবের ভূগোল সম্পর্কে তার মনে বেশ কৌতুহল জাগে। ১৯২০ সালের দিকে তিনি রিয়াদ যান এবং সেখানে বাদশাহ আবদুল আযীযের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে আবদুল্লাহ ফিলবী নাম ধারণ করেন। তখন থেকে রিয়াদে তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। পরে বৈরুতে তিনি ইনতিকাল করেন। আরবের ভৌগলিক বিবরণ সম্পর্কে জন ফিলবীর বেশ কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। পাশ্চাত্য দেশে এ গ্রন্থগুলো এতোটা জনপ্রিয় এবং গবেষণামূলক বলে স্বীকৃত যে এগুলোর সাহায্য ছাড়া আরবের ভৌগলিক অবস্থান সম্পর্কে পাশ্চাত্যের কোনো লেখক কিছু লিখতে পারেনা। ফিলবী রিয়াদে আছেন, আমরা তা জানতাম না। আমরা যখন জানতে পারলাম যে, তিনি আমীর আবদুল্লাহর দাওয়াতে উপস্থিত হয়েছেন তখন আমরা তাকে খুঁজতে লাগলাম। তিনি আরবি লেবাস পরে আমাদের কাছেই বসা ছিলেন। তাঁর গায়ের রংও ইংরেজদের মতো লাল নয়। মুখে বেশ দাঁড়িও ছিলো, তাই আমরা তাকে চিনতে পারিনি। খানা শেষে আমীর আবদুল্লাহ তাঁকে মাওলানার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি মাওলানার সাথে কিছুক্ষণ কথা বলেন। মাওলানার ভাষায় তিনি আরবের বদ্দুদের ভঙ্গিতে কথা বলেন। সাম্প্রতিককালে মাওলানা তাঁর সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ 'ইন দ্যা ল্যান্ড অব মাদইয়ান' পড়ছিলেন। এতে তিনি মাদইয়ানের বিবরণ দিয়েছেন। এ বই সম্পর্কে মাওলানা তাঁর সাথে আলাপ করেন। পরদিন সকালে বিস্তারিত আলোচনার জন্য সময় নির্ধারণ করেন। কারণ, সফর সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান কাজে লাগতে পারে। আমীর আব্দুল্লাহ আর ফিলবীর মধ্যে রসিকতাচ্ছলে অনেক বাকযুদ্ধ চলে। আমীর আবদুল্লাহ বলেন, তাওরাতে-ইনজীলে যেসব বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে, ঐতিহাসিক নিদর্শন দ্বারা তা প্রমাণ করতেই এরা সচেষ্ট। এরা কুরআনও বুঝেনা, হাদীসও না। আর ফিলবী দাবি করেন, ইনি আমার চেয়ে বেশি আরবি জানেননা, অথচ তার আরবি আমার ইংরেজির মতো। আমীর আব্দুল্লাহ তাঁর অজ্ঞতা-আসলে চতুরতার দু'টি দৃষ্টান্তও দেন।

একঃ তিনি বলেন, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বাদশাহ ছিলেন। কারণ, কুরআন বলে–

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَاجَّ اِبْرٰهِيْمَ فِىْ رَبِّهٖ اَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ

"তুমি কি তাকে দেখনি, যে ইবরাহীমের সাথে ঝগড়া করছিল তার রব সম্পর্কে? এজন্য যে, আল্লাহ তাকে রাজত্ব দিয়েছিলেন"। আর ইনজীল থেকেও জানা যায় যে, তিনি ধনী ছিলেন।

www.pathagar.com

দুইঃ বিলকিস (সাবার রাণী) এবং হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের মধ্যে হাজার বছরের ব্যবধান ছিলো।

খাওয়া-দাওয়া শেষে এক এক করে সকলে যখন অনুমতি নিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, আমীর তখন মাওলানাকে যেতে দেননি। প্রথমে তিনি ফিলবী সম্পর্কে বললেন, আমরা জানি, তার ইসলাম নিছক ভৌগলিক ধরণের। তার চিন্তাধারা এখনোও খ্রিস্টানদের মতো। তা সত্ত্বেও আমরা তাকে অবিশ্বস্ত বা ইংরেজদের গোয়েন্দা বলে মনে করিনা। আমাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, তার পেটে কোনো কথা থাকেনা, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিগত চল্লিশ বছরে তার দ্বারা এমন কিছু প্রকাশ পায়নি, যদ্বারা তাকে অবিশ্বস্ত বা ইংরেজদের চর বলে সন্দেহ করা যেতে পারে। মাওলানা বলেন, আমার মনে হয় নিছক আরব ভূমির প্রতি কৌতুহলের কারণেই তিনি মুসলমান হয়েছেন। মুসলমান না হয়ে আরব জাযিরায় ঘুরাফেরা করা সম্ভব ছিলোনা বলেই তিনি মুসলমান হয়েছেন। মাওলানা বলেন, আমি তার অনেক বই পড়েছি। কোনো একটি বই থেকেই এটা প্রকাশ পায়না যে, ইসলামের সাথেও তার কোনো সম্পর্ক আছে। বর্তমানে আমি তার 'মাদইয়ানের পুণ্য ভূমিতে' গ্রন্থটি পড়ছি। এই বইয়ের তিন চার স্থানে তিনি আরবের মরু প্রান্তরে খ্রিস্টানদের বড়দিন পালনের কথা উল্লেখ করেছেন। আরও উল্লেখ্য যে, তার সব বইই প্রকাশিত হয় আসল নামে- সেন্ট জন ফিলবী নামে, আবদুল্লাহ ফিলবী নামে নয়। ফিলবী সৌদি সরকারের কাছ থেকে মাসিক ভাতা পায়। এ সম্পর্কে আমীর আব্দুল্লাহ বলেন, এ ভাতা নেহায়েত নগণ্য। লোকটিতো একেবারেই ফকীর! মাওলানা বলেন, অবাক কথা। আপনারা কি জানেন না যে, তার অনেক বই প্রকাশিত হয়, আর সেগুলো থেকে প্রচুর অর্থও আসে?

সৌদী আরবের অর্থনৈতিক সমস্যা

অনেক রাত হয়ে যাচ্ছিলো। তাই মাওলানা আবার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু আমীর তখনও অনুমতি দিতে রাজি নয়। তিনি আরও কিছুক্ষণ বসার জন্য মাওলানাকে অনুরোধ করেন। এবার আলোচনা চলে ইসকান্দার মির্জা এবং জাফরুল্লা খান সম্পর্কে। পরে আলোচনার মোড় ঘুরে সৌদি আরবের কৃষি ও শিল্পের দিকে। মাওলানা দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, দেশকে অন্তত খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার চেষ্টা চালানো উচিত। আমরা যতোটুকু জানতে এবং দেখতে পেয়েছি, বর্তমানে খাদ্যদ্রব্য, কাপড় চোপড় এমনকি গোশত, ডিম, তরকারী, লবণ, মরিচ, রসুন, পেঁয়াজ- সবকিছুই বিদেশ থেকে আনতে হয়। মাওলানা ভালোভাবে একথাও বুঝাবার চেষ্টা করেন যে, কেবল পেট্রোলের উৎপাদন ও তার মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানীর উপর নির্ভরশীলতা শেষ

www.pathagar.com

পর্যন্ত আরবদেরকে ভীষণ অস্থির অবস্থায় নিক্ষেপ করতে পারে। মাওলানার কথা সমর্থন করে আমীর বলেন, কৃষির উন্নতির জন্য আমরা অনেক চেষ্টা করেছি। অনেককে জমি দিয়েছি, সবরকম সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু এরা কৃষিকাজে খাটতে চায় না। তার পরিবর্তে তেল কোম্পানীতে চাকুরী নেয়াকে প্রাধান্য দেয়। কারণ, সামান্য কাজ করে অনেক পয়সা পাওয়া যায়। যাই হোক, আমরা চেষ্টা করছি এবং এ ব্যাপারে আমরা খুব চিন্তিত।

কিছুক্ষণ পর মাওলানা আবার অনুমতি চাইলে আমীর মাওলানাকে বিদায় দেয়ার জন্য প্রাসাদের বাইরে আসেন এবং আমাদের গাড়ি ছাড়া পর্যন্ত তিনি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন। ওস্তাদ আব্দুল হাকীম আবেদীন জানান, আমীর আব্দুল্লাহ প্রধানমন্ত্রীকে বিদায় জানাবার জন্যও প্রাসাদের বাইরে আসেননা। আমীর আব্দুল্লাহ মাওলানার সাথে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনা করেন।

আদর্শিক দ্বন্দ্ব

একই রাতে অপর এক বৈঠকে আরবের দু'জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের মধ্যে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং গরম আলোচনা শোনার সুযোগ হয়েছে আমাদের। এ আলোচনার মধ্য দিয়ে সৌদি আরবের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছি। তাদের একজন আলিমদের প্রশংসা এবং তাদের সমর্থন করছিলেন আর অপরজন বলছিলেন, সাধারণ নও-জোয়ানদের দৃষ্টিতে এসব আলিমদের কোনো মূল্যই নেই। নওজোয়ানরা মনে করে, আলিমরা ইসলামের সত্যিকার প্রতিনিধি নয়। অপর পক্ষ থেকে শেখ আব্দুল আযীয বিন বা'যের নাম উল্লেখ করা হয়। উত্তরে প্রতিপক্ষ বলেন- সন্দেহ নেই যে, সাহসী পুরুষ নিষ্ঠাবান এবং অনেকাংশে আলিমও। কিন্তু তার জ্ঞানের পরিধি অনেক সংকীর্ণ। ফিকাহ্‌র ছোট খাটো মাসআলা বাতানো ছাড়া ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান যুগের বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান তিনি দিতে পারেননা। স্বীকার করি এসব আলিমরা বেঈমান নয়, কিন্তু অক্ষম অবশ্যই। প্রথম ব্যক্তি বলছিলেন- যাই হোক, এসব আলিমের দ্বারাই সংশোধন হতে পারে। প্রয়োজন হচ্ছে, তাদের কাছ থেকে কঠিনভাবে কাজ আদায় করে নেয়া। অপর ব্যক্তি বলছিলেন- এখানে সংস্কার সংশোধনের কাজ হবে নওজোয়ানদের দ্বারা। বর্তমানে ইসলাম বিমুখতা, বে-দীনী এবং পাশ্চাত্যের অনুকরণের যে প্রবণতা বিস্তার লাভ করেছে, তা প্রতিরোধ করা আমাদের সাধ্যাতীত। এসব আলিম ইংরেজি শিক্ষা লাভ বর্তমান যুগের নানাবিধ কল্যাণকর বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার ভোগ-ব্যবহার থেকে জনগণকে বারণ করে থাকে। ইংরেজি শিক্ষা বিস্তার লাভ করবেই। তখন আলিমরা কিছুই করতে

www.pathagar.com

পারবে না। তাদের প্রতি জনগণের ঘৃণা-বিদ্বেষ বৃদ্ধি ছাড়া কিছুই হবে না। অপর পক্ষে এসব আলিম শাসক শ্রেণীর বিলাসপ্রিয়তা দেখছেন। কিন্তু তারা কিছুই করতে পারছেন না। শেখ আব্দুল আযীয অত্যন্ত নির্ভীকতা এবং সাহসিকতার সাথে বাদশাহ এবং অন্যান্য আমীরদের সমালোচনা করেন। সন্দেহ নেই, বাদশাহ এবং কোনো কোনো আমীর তাঁকে অনেক গুরুত্ব দেন, কিন্তু ধনীক ব্যক্তিরা এবং ক্ষমতাসীন মহল ভালো করেই জানেন, তাঁর সমালোচনার দাম কতোটুকু আছে। তাই তারা তাঁকে খুশী করার জন্য ছোট-খাট ব্যাপারে তাঁর কথা মেনে নেন।

আমীর আব্দুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান এবং আমীর মুসায়েদ ইবনে আবদুর রহমানকে বাদ দিয়ে অন্যান্য ঘরে প্রায় সেসব কিছুই হয়, যা বর্তমান যুগে একটা পাশ্চাত্য ঘেঁষা পরিবারে হওয়া সম্ভব।

এই ব্যক্তিদ্বয়ের মুখে একথা জানতে পেরে আমরা অত্যন্ত অস্থির হয়ে যাই। এসব আমীর ওমরার ছেলে-মেয়েরা ইংরেজি এবং ফরাসী ভাষা পড়ে এবং সে ভাষায়ই তারা কথা বলে। এদের পরিবারে নারীদের পোশাক এবং চাল-চলন সবকিছুই পুরোপুরি পাশ্চাত্য ধাচের। অনেকে তো এতদূর অগ্রসর হয়ে গেছে যে, তারা তাদের ছেলে-মেয়েদের আমেরিকাতেই লেখা পড়া করান এবং তাদের শিক্ষয়িত্রী এবং সুপারভাইজার সবই আমেরিকান মহিলা। এসব নূতন কুঁড়ি যখন বড় হবে, দণ্ডমুণ্ডের হর্তাকর্তা যখন এরাই হবে তখন দেশের কি অবস্থা হবে, তা একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন। রাত ১১টার দিকে আমরা হোটেলে ফিরে আসি এবং অনুক্ষণ এ পরিস্থিতি নিয়ে দুঃখ করতে থাকি।

ফিলবীর সাথে আবার সাক্ষাত

পরদিন ২৫ নভেম্বর সকাল ১০টায় জন ফিলবীর সাথে সাক্ষাতের জন্য আমরা তাঁর বাসায় যাই। পুরাতন রিয়াদের একটি গলিতে তাঁর বাসা। দোতলা বাসাটি অতি পুরাতন এবং জরাজীর্ণ। সেখানে তিনি বাস করছেন একেবারে আরবদের মতোই। সামাজিকতায় ইংরেজিপনার কোনো ছাপই দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনি আমাদেরকে তাঁর লাইব্রেরিতে বসান এবং অনেকক্ষণ যাবত বিভিন্ন কিতাব দেখান। ইংরেজি সাময়িকীতে সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত তাঁর নিবন্ধও দেখান। এবারের সাক্ষাতকারে আলোচনা হয় ইংরেজিতে। আলোচনাকালে তিনি জানান, কয়েক বছর তিনি সে মাদ্‌ইয়ান সফর করেন, এজন্য বর্তমান বাদশাহ সউদের পিতা বাদশাহ আবদুল আযীয তাঁকে পনর হাজার রিয়াল এবং একটা জীপ ও একটা কার দিয়েছিলেন। ইসলাম গ্রহণের বিষয়ও তিনি উল্লেখ করেন। ঝিলামের ডেপুটি কমিশনার থাকা কালে তাঁর অফিসে এক হাফেজ সাহেবের নিকট তাঁর

www.pathagar.com

নামও তিনি বলেছিলেন কিন্তু মনে রাখতে পারিনি- কুরআন মজীদের তরজমা পড়া শুরু করেন আর এভাবেই তাঁর মনে সৃষ্টি হয় ইসলাম সম্পর্কে জানার আগ্রহ। তিনি এও জানান, কেম্ব্রিজে তিনি পণ্ডিত নেহরুর ক্লাস ফেলো ছিলেন। এরপর নানা বিষয়ে আলোচনা হয় এবং সফর সম্পর্কে তিনি মূল্যবান পরামর্শও দেন। কখনো পাকিস্তান আগমন করলে যাতে সাক্ষাত করতে পারেন, এজন্য তিনি মাওলানা এবং চৌধুরী সাহেবের ঠিকানাও নোট করেন।

আরবি খাবার

যোহরের পর বড় মুফতীর বাসায় আমাদের খাওয়ার দাওয়াত ছিলো। তিনটার দিকে আমরা তাঁর বাসায় পৌঁছি। মুফতী সাহেব দাওয়াতের বিশেষ ব্যবস্থা করেন এবং আলে শেখের প্রায় সকলকেই দাওয়াত করেন। এদের মধ্যে তাঁর বড় ভাই শেখ আব্দুল্লাহ ইবনে ইব্রাহীমও ছিলেন। তিনি অন্ধ এবং অনেক দুর্বল হয়ে যাওয়ার কারণে কোনো পদে নিয়োজিত নেই। প্রথমে আমরা এক কক্ষে বসি পরে খাওয়ার জন্য অন্য কক্ষে যাই। সেখানে একটা বড় ডিশে আস্ত বকরী পাকিয়ে রাখা হয়েছিল। মাওলানা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন, আস্ত বকরী কিভাবে পাকানো হয়েছে। মুফতী সাহেব জবাব দেন, আস্ত বকরী পাকানো তো এমন বড় কিছু নয়। দু'বছর আগে হেযাজে বাদশাহর এক দাওয়াতে সুদানের এক বাবুর্চি আস্ত উট পাকিয়ে হাযির করেছিল। মাওলানা বললেন, হাতি যদি হালাল হতো, তা হলে বোধ হয় এরা আস্ত হাতিও পাকিয়ে নিতো? মুফতী সাহেব বলেন, আমাদের নাজদে এতো বড় হাঁড়িও আছে, তিনটি উট এক সাথে পাকানো যায়। মাওলানা বললেন, এ হাঁড়িগুলো বোধ হয় হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের যামানা থেকে চলে এসেছে। এ দাওয়াতে একটা মজার কাণ্ড ঘটেছে। ওস্তাদ আবদুল হাকীম আবেদীন দস্তরখানে মাওলানার পাশে বসেছিলেন। আরবদের অভ্যাস হচ্ছে তারা মেহমানের সামনে গোশতের টুকরা কেটে কেটে রাখেন। ওস্তাদ আবদুল হাকীম আবেদীন বকরীর চোখ বের করে মাওলানাকে জিজ্ঞেস করলেন, মাওলানা, আপনি কি এটা খাওয়া পছন্দ করবেন! মাওলানা গা ঝাড়া দিয়ে তা গ্রহণ করতে অসম্মতি জানান। জানা যায়, আরবরা চোখকে বড়ই স্বাদের জিনিস মনে করে এবং অতি আগ্রহের সাথে খায়। আমাদের জন্য এটা ছিলো এক অবাক কাণ্ড।

খাওয়া শেষে এক জায়গায় বসে নানা বিষয়ে আলোচনা চলে। এ বৈঠকেও মুফতী সাহেব পুনরায় বলেন, ইবনে তাইমিয়া এবং মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাবের কোনো কথা যদি হাদীসের বিরোধী হয়, আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি।

www.pathagar.com

দাসদাসী ক্রয়-বিক্রয়

আসরের পর রিয়াদের শরীয়া কলেজের কতিপয় ছাত্র আমাদের চায়ের দাওয়াত দেয়। তখন বাইরে খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। কিন্তু এরা আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য ঠিক সময় হাযির হয়েছিল। আমাদের যেতে হবে পুরাতন রিয়াদের এক গলিতে। বৃষ্টিতে গলির অবস্থা খারাপ। ছাদ থেকে নালী বেয়ে পানি পড়ছিল আমাদের মাথায়। অনেক কষ্টে আমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছি। অতিজীর্ণ শীর্ণ এবং অন্ধকার ঘর। জানতে পারলাম, শরীয়া কলেজের ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস নেই। ছাত্ররা নিজেরা যে যেখানে থাকার ব্যবস্থা করতে পারে, সেখানে থাকে। রিয়াদের অনেকেই নতুন পাকা বাড়ি নির্মাণ করে পুরাতন বাড়ি ওয়াক্‌ফ করেছে। সাধারণত এসব স্থানে ছাত্ররা থাকে। আমরা যে ঘরে গিয়েছি, তাও এধরণেরই একটা ঘর। সেখানে ছাত্ররা ছাড়া শেখ আবদুর রায্‌যাক আফীফীর সাথেও আমাদের সাক্ষাত হয়। তাঁর সাথে দাসী সম্পর্কে আমাদের আলোচনা হয়। সৌদি আরবে বর্তমানেও দাস-দাসীর প্রচলন আছে। শেখ আফীফী জানান, সৌদি আরবের এসব দাস-দাসী আসে মাসকাট, ওমান এবং লেবানন থেকে। এটা জায়েয হওয়ার একমাত্র কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয় যে, এরা এসে বলে, আমরা পুরুষানুক্রমে দাস-দাসী। তাদের একথায় বিশ্বাস করেই তাদেরকে ক্রয় করা হয়। এদেরকে যারা বিক্রয় করতে নিয়ে এসেছে, তাদের কাছ থেকে এটা জানার দরকার মনে করা হয় না যে, তারা এদেরকে কিভাবে কোথা থেকে নিয়ে এসেছে। প্রলোভন দিয়ে, ভয়-ভীতি দেখিয়ে এবং এদের পিতা-মাতার কাছ থেকে ক্রয় করেও আনতে পারে। অবশ্য কেউ যদি বলে, আমাকে জোর করে দাস-দাসীতে পরিণত করা হয়েছে, তাহলে তাকে মুক্ত করে দেয়া হয়। মাওলানা বলেন, একথা সে বলবে কিভাবে? মুক্ত হয়ে সে একা যাবে কোথায়? এতে শেখ আফীফী চুপ হয়ে যান। কিছুক্ষণ পর তিনি বলেন, কেউ কেউ ফিকাহ্‌র কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, কাফেরদের দাস-দাসী হিসাবে ক্রয় করা যায়। কাফের নিজেও নিজেকে বিক্রি করতে পারে। নিজের ছেলে-মেয়েদেরও বিক্রি করতে পারে। সুতরাং কোনো কোনো ফকীহর মতে দাস-দাসীর ক্রয়-বিক্রয় জায়েয। এ যেন সব দোষ মোল্লার ঘাড়ে চাপানোর মতো আরকি! এ বিষয়ে মরহুম মাওলানা মাসউদ আলম নদবীও বড় মুফতী শেখ মোহাম্মদ ইব্‌রাহীমের সাথে আলোচনা করেছেন। (আরব দেশে কয়েক মাস' পুস্তকের ২২০ নম্বর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

এশার পর আমরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শেখ সুলাইমান আল-আবীদের বাসায় দাওয়াতে যাই। পরদিন ২৬ নভেম্বর সকালে শেখ আবদুল আযীয ইবনে

www.pathagar.com

বাকের-এর বাসায় আমাদের নাশতার দাওয়াত ছিলো। শেখ মাওলানার কিতাবগুলো পড়েছেন। তিনি এগুলোর প্রশংসা করেন এবং এ ব্যাপারে সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতারও প্রতিশ্রুতি দেন।

সকাল নয়টার দিকে আমরা ওস্তাদ আল-জামেরের সাথে সাক্ষাত করার জন্য প্রেসে যাই। তখন বৃষ্টি হচ্ছিল। গলির অবস্থা খারাপ কোনো কোনো স্থানে তো আমাদের গাড়ি আটকে যাচ্ছিল। প্রায় দশটার সময় শেখ সুলাইমান আল-আদীবের দাওয়াতে তাঁর আদালতে যাওয়ার প্রোগ্রাম ছিলো। কিন্তু বৃষ্টির জন্য ওস্তাদ আল-জামেরের প্রেসে আমাদের দেরী হয়ে যায়। আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য শেখ সুলাইমানের গাড়ি হোস্টেলে এসে ফিরে যায়। আদালতে গিয়ে সৌদি বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে জানার আগ্রহ ছিলো আমাদের। কিন্তু বৃষ্টির জন্য আমরা যেতে পারিনি।

সরকারি অফিসে নামাযের ব্যবস্থা

সাড়ে ১১টার দিকে আমি একা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যাই। এখান থেকে জাজীরাতুল আরব সম্পর্কে কিছু চিত্র এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন স্কুল এবং কলেজের পাঠ্যতালিকা নেওয়ার ইচ্ছা ছিলো। মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারি শেখ আব্দুল আযীয ইবনে হাসান অফিসে ছিলেন। তিনি আমাদেরকে এগুলি দেয়ার জন্য অধীনস্থদের নির্দেশ দেন। কিন্তু তারা আন্‌তে অনেক দেরি করে ফেলে। ইতিমধ্যে যোহরের নামাযের সময় হয়ে যায়। এটা দেখে খুব ভালো লাগলো যে, অফিসের ভেতরেই একজন আযান দেন। আযান শুনে সকলে হাতের কাজ ফেলে এক বড় কক্ষে উপস্থিত হয়। কক্ষটি নামাযের জন্য নির্দিষ্ট। এ কক্ষের দরজায় সুন্দর অক্ষরে 'আল-মাসজিদ' লেখা ছিলো। শেখ আব্দুল আযীয নামায পড়ান। নামায শেষে সকলে নিজ নিজ কাজে ফিরে যায়। শেখ আব্দুল আযীয আল-আযহার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কুল্লিয়া উসুলুদ-দীন Colege of theocracy) সনদপ্রাপ্ত। তিনি হারাম শরীফের প্রথম খতীব।

নাজদের স্থানীয় ভাষা

রিয়াদের ব্যবসায়ী শেখ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান আশ-শুয়াইয়ের-এর বাসায় দুপুরে আমাদের দাওয়াত ছিলো। তিনি অনেক আয়োজন করেন। অন্য জায়গায় দাওয়াত থাকায় অন্য মেহমানরা শরীক হতে পারবেন না বলে পূর্বেই দুঃখ প্রকাশ করেন। ওস্তাদ আব্দুল হাকীম আবেদীন ঠিক তখনই বিমানযোগে জেদ্দা যাচ্ছিলেন। তাই দাওয়াতে আমাদের সাথে আর কেউ ছিলোনা। শেখ শুয়াইয়ের

www.pathagar.com

সাথে কথাবার্তায় আমাদের যে অসুবিধা হয়েছে, তা মনে থাকার মতো। এ যাবৎ আমরা যাদের সাথে মিশেছি, তারা ছিলেন পড়া-লেখা জানা লোক। শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতেন তারা। তাই তাদের কথা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয়নি। এক দিকে শেখ শুয়াইয়ের তোঁতা ছিলেন, এ ছাড়াও তিনি কথা বলছিলেন নাজদের আঞ্চলিক ভাষায়। স্থানীয় ভাষা আমরা বুঝতে পারছিনে আমরা তাকে এ কথা বলেও ছিলাম। কিন্তু তিনিও বোধ হয় আমাদের ভাষা বুঝতে পারছিলেন না। ঘণ্টা দেড় ঘণ্টার আলোচনায় তাঁর কথার জবাবে 'নায়াম' (হ্যাঁ) আর 'লা' (না) ছাড়া কিছুই বলতে পারিনি। মিসর, সিরিয়া, ইরাক এবং জর্দানের তুলনায় নাজদ এবং হেজাযের স্থানীয় ভাষা অনেকাংশে বুঝা গেলেও তাদের মধ্যে কয়েক মাস কাটানো ছাড়া ঠিকমত তাদের ভাষা বুঝা ততো সহজ নয়।

শেখ আব্দুল্লাহ আল-মিসআরী

মাগরিবের নামাজের পর শেখ আবদুল্লাহ আল মিস-আরীর বাসায় আমাদের দাওয়াত ছিলো। সেখানে তাঁর বন্ধু ওস্তাদ সাঈদ আল জুহুল এর সঙ্গেও আমাদের সাক্ষাত হয়। ইনি মক্কার একটি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। বিশেষ প্রয়োজনে রিয়াদ এসেছেন। তিনি বেশ কিছুক্ষণ ধরে মক্কা মুয়ায্যামায় নব শিক্ষিত যুবকদের দীন সম্পর্কে উদাসীনতা, বরং তাদের বিপথগামীতা ও অবহেলার অভিযোগ করেন।

বাদশাহ সউদের আতিথেয়তা

এশার পর শেখ আবদুল আযীয বিন বায্ আমাদের হোটেলে আসেন। দিনের বেলা তাঁর নামে বাদশাহ সউদের একটি তারবার্তা এসেছে। বাদশাহ তাঁর ব্যক্তিগত তহবিল থেকে আমাদের সফরের ব্যয়ের জন্য তিন হাজার রিয়াল দান করেছেন। শেখ আবদুল আযীয আমাদের জন্য এ রিয়াল নিয়ে এসেছেন। আমরা তখনই শুকরিয়া জানিয়ে তাঁর কাছে তারবার্তা পাঠাই। এটা বাদশাহর বদান্যতা ও মহানুভবতা। আমরা কখনো ইশারা-ইঙ্গিতেও তাঁর কাছে কোনো আর্থিক সাহায্য চাইনি। আমরা চেয়েছিলাম কেবল সুযোগ-সুবিধা।

রিয়াদে ইখওয়ানের পরিমন্ডল

পরদিন ২৭ নভেম্বর ছিলো শুক্রবার। জুমার নামাযের একটু আগে শেখ মান্না আল কাত্তান আমাদের হোটেলে এসে একটি মিশরীয় নির্মাণ প্রতিষ্ঠান শেরকাতুল মিয়ানীল মিসবিল্যায় নিয়ে যান। মিসরের ওস্তাদ আবদুল আযীয এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান। এক সময় ইখওয়ানের সাথে তার সম্পর্ক ছিলো। পরে তিনি রিয়াদ চলে

www.pathagar.com

আসেন। প্রতিষ্ঠানের অফিস এলাকার ভেতরে একটা ছোট সুন্দর মসজিদ আছে। বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী এখানে নামায পড়ে। শেখ মান্না আল-কাত্তান জুমার খোতবা দেন এবং নামায পড়ান। তখন বাইরে বৃষ্টি হচ্ছিলো। বৃষ্টির সাথে সামঞ্জস্য রেখে খোতবার বিষয়বস্তু ছিলো এই– দুনিয়ার বুকে বেঁচে থাকার জন্য যেমনি মানুষের বৃষ্টির প্রয়োজন– তেমনি তার সুসভ্য এবং শান্তি স্বস্তির জীবন যাপনের জন্য দীনের দরকার রয়েছে। খোতবা ছিলো অত্যন্ত তেজোদীপ্ত ও বিশুদ্ধ ভাষায়। মিসরের আলিমদের বক্তৃতার ভাষা এমনিতেই বিশুদ্ধ। কিন্তু যে ব্যক্তি শেখ হাসানুল বান্না শহীদের সাহচর্য লাভ করেছেন, তার ভাষায় বিশুদ্ধতার সাথে আবেগ এবং নিষ্ঠারও সংমিশ্রণ সাধিত হয়।

তিনটায় শেখ আবদুল লতীফের বাসায় আমাদের খাওয়ার দাওয়াত ছিলো। তাই আমরা সেখানে যাই। ফেরার সময় শেখ আমাদের বেশ কিছু কিতাব উপহার দেন। এদিন চৌধুরী সাহেবের স্বাস্থ্য ভালো ছিলোনা। তাই তিনি আমাদের সাথে দাওয়াতে যেতে পারেননি। ফলে তিনি কিতাবের উপহার থেকে বঞ্চিত থাকেন।

রিয়াদ এবং মক্কার মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থা

আমাদের প্রোগ্রাম এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে রিয়াদে বেশি দিন কেটেছে। তাই আমরা যতো শীঘ্র সম্ভব মক্কা মুয়ায্যামা যেতে ইচ্ছুক। রিয়াদ থেকে জেদ্দা বিমান যাতায়াত করে। যাহরান থেকে রওয়ানা করার সময় আমাদের ইচ্ছা ছিলো, আমরা রিয়াদ থেকে টেকসী নিয়ে মক্কা মুয়ায্যামা যাবো। কারণ, কেবল পথ অতিক্রম করা নয়, বরং দেশ এবং ঐতিহাসিক স্থান দেখার জন্য আমরা এসেছি। কিন্তু রিয়াদ এসে জানতে পেলাম, এখান থেকে মক্কা মুয়ায্যামা পর্যন্ত কোনো পাকা রাস্তা নেই। রাস্তায় স্থানে স্থানে পাথর কংকর আবার কোথাও বালির স্তূপ পড়ে। তাই ছোট গাড়িতো দূরের কথা, বড় গাড়িও যাত্রী নিয়ে যাতায়াত করে না। কেবল মালবাহী বড় ট্রাক যাতায়াত করে। তাতেও সাধারণত তিন-চারদিন সময় লাগে। মালবাহী এসব ট্রাকেই কিছু যাত্রীও নিয়ে যায় এবং ভাড়া নেয়া হয় মাথাপিছু ৪০ রিয়াল। বিভিন্ন স্থান দেখার জন্য আমাদের মনে হলো ট্রাকেই সফর করবো । কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, এসব ট্রাক সাধারণত রাতের বেলা ছাড়ে, দিনের বেলা পথে কোথাও থেমে থাকে। তাই ট্রাকে সফর করে পথে কোনো স্থান দেখা সম্ভব নয়। তাছাড়া রিয়াদ এবং মক্কার মধ্যস্থলে তায়েফ ছাড়া এমন কোনো ঐতিহাসিক স্থান নেই! আমাদের সফরের লক্ষ্যের সাথে যার

www.pathagar.com

সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। কারণ, আমরা তো কেবল কুরআন মজীদ এবং মহানবীর জীবন চরিতের সাথে সম্পৃক্ত ঐতিহাসিক স্থান দেখতে চাই। এছাড়াও তখন বৃষ্টির কারণে রাস্তা আরও খারাপ হয়ে যাওয়ায় কোনো ট্রাকও যাতায়াত করছিল না। ট্রাকে যাতায়াত করতে হলে বাধ্য হয়ে আমাদের আরও কয়েক দিন রিয়াদে অবস্থান করতে হয়। তাই বন্ধু-বান্ধবের পরামর্শ ক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যে, আমরা বিমানযোগে জেদ্দা যাবো এবং সেখান থেকে মক্কা ও তায়েফ সফর করবো। আমাদের ভারি জিনিসপত্র ট্রাকযোগে মক্কা পাঠিয়ে দেবো। কিন্তু এতেও একটা অসুবিধা দেখা দেয়। কোনো ট্রাকওয়ালা মালিক সাথে না থাকলে তার জিনিসপত্র নিতে রাজি নয়। তাই বাধ্য হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে, কিতাবগুলো যাহরান প্রেরণ করা হবে, যাতে সেখান থেকে পাকিস্তানে পাঠানো সহজ হয় আর অবশিষ্ট জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে বিমান যোগে আমরা জেদ্দা রওয়ানা হবো। এ উদ্দেশ্যে বিমানের সময় এবং ভাড়া জানার জন্য আমি বিমানবন্দর যাই। সেখানে শুনে বিস্মিত হই যে, রিয়াদ থেকে জেদ্দার বিমান ভাড়া একজন সৌদি নাগরিকের জন্য একশ রিয়াল আর অসৌদীর জন্য দু'শ রিয়াল। জানিনা এটা সৌদি নাগরিকদের জন্য কনসেশন, না অসৌদীদের জন্য জরিমানা। জাতীয়তার বিচারে ভাড়ায় পার্থক্যের এ অভিজ্ঞতা আমাদের এই প্রথম। আমাদের দেখা এমন পার্থক্যের কথা আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

রিয়াদের সালাফী বন্ধু-বান্ধব

আসরের পর আমরা শেখ আবদুর রায্যাক আফীফীর বাসায় যাই। সেখানে তাঁর অনেক সালাফী বন্ধু উপস্থিত ছিলেন আমাদের মিসর সফরেরও পরিকল্পনা আছে এটা জানতে পেরে তারা আমাদেরকে মিসর এবং আলেকজান্দ্রিয়ার অনেক সালাফী বন্ধুর ঠিকানা দেন যাতে মিসর গিয়ে আমরা তাদের সাথে সাক্ষাত করতে পারি।

জেদ্দার উদ্দেশ্যে রওয়ানা

পরদিন ২৮ নভেম্বর আমাদের জেদ্দা রওয়ানা হওয়ার কথা। রিয়াদে অবস্থানকালে সেখানকার শেখ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যেমন আন্তরিকতার সাথে আমাদের গ্রহণ করেছেন, তার দাবি ছিলো জেদ্দা রওয়ানা করার আগে তাদের সাথে বিদায়ী সাক্ষাতে মিলিত হওয়া। কিন্তু বৃষ্টির কারণে তা সম্ভব হয়নি। এতদসত্ত্বেও আমীর আব্দুল্লাহর সাথে মাওলানা সাক্ষাত করতে যান।

www.pathagar.com

পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতের টেলিফোন

বিমান ছাড়ার সময় দুপুর ১২টা। ১১টার দিকে আমরা হোটেল থেকে জিনিসপত্র বের করছিলাম, এমন সময় জেদ্দা থেকে পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত আলী আকবর খানের টেলিফোন আসে আমাদের কাছে। জেদ্দায় পৌঁছে তার বাসায় অবস্থান করার জন্য তিনি আমাদের বারবার অনুরোধ জানান। তিনি যে আন্তরিকতার সাথে আমাদের আমন্ত্রণ জানান, তাতে তা প্রত্যাখ্যান করা আমাদের জন্য অসম্ভব।

আমরা বিমান বন্দরে পৌঁছে দেখি, মিসরীয় নির্মাণ সংস্থা শোব-কাতুল মাবানিল মিসরিয়্যার পরিচালক ওস্তাদ আবদুল আযীযসহ অন্যান্য বন্ধুরা আমাদের বিদায় অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সেখানে উপস্থিত। আমরা টিকেট করে মাল-সামান ওজন করি। এক একজন যাত্রীর জন্য ৩০ কিলো ওজনের মাল-সামান সাথে নেয়ার অনুমতি আছে। কিন্তু আমাদের জিনিসপত্রের ওজন হয়েছে ১৮৭ কিলো। আমরা অতিরিক্ত জিনিসের ভাড়া দিতে প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু বিমান বন্দরের কর্মচারীরা মাওলানার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পেরে অতিরিক্ত জিনিসের ভাড়া নিতে অসম্মতি জানায়। এটা তাদের অতিথি পরায়ণতার আর একটি দৃষ্টান্ত। সেদিন বিমান বিলম্ব ছিলো। প্রায় আসরের সময় আমরা রিয়াদ থেকে জেদ্দা রওয়ানা হই। #

www.pathagar.com

৬

জেদ্দায়

জেদ্দায় পৌঁছা

রিয়াদ এবং জেদ্দার দূরত্ব প্রায় ৬শ মাইল। বিমানে বসে চারিদিকে এমন কি উপরে-নিচেও কেবল মেঘ আর মেঘ নজরে পড়ছিল। আমাদের বিমান কখনো মেঘের উপর দিয়ে যাচ্ছিলো, কখনো নিচে দিয়ে। আর কখনো অতিক্রম করছিল মেঘের বুক চিরে। দূর থেকে মেঘমালা দেখে একেবারে পেঁজা তুলার পাহাড় মনে হচ্ছিল। বিমান থেকে মেঘমালার এ দৃশ্য ছিলো নয়নাভিরাম। এমন দৃশ্য উপভোগ করার সুযোগ ইতোপূর্বে আমার আর হয়নি। প্রায় দু'ঘণ্টা পর আকাশ পরিষ্কার হয় এবং নিচে মাটি দেখা যায়। মাগরিবের সময় আমরা জেদ্দা পৌঁছি। পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত চৌধুরী আলী আকবর এবং ওস্তাদ আব্দুল হাকীম আবেদীন বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন। তাদের সাথে ছিলেন মাস্টার আবদুল হাকীম। মাস্টার সাহেব যোয়ানপুরের অধিবাসী। পাকিস্তান দূতাবাস পরিচালিত একটি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। বিমান থেকে নেমে জানতে পারলাম, এখানেও জিনিসপত্র চেক করা হবে। কারণ, আসলে আমাদের বিমানটি আসছিল বৈরুত থেকে। যাই হোক, অন্যান্য যাত্রীদের মালামাল চেক করা হলেও আমাদেরটা করা হয়নি। সেখান থেকে আমরা চৌধুরী আলী আকবর সাহেবের কুঠীতে যাই। জেদ্দায় পাকিস্তানি দূতাবাস শহরে হলেও রাষ্ট্রদূতের বাসভবন শহর থেকে তিনচার মাইল দূরে একটি নতুন এলাকায় জেদ্দা-মদীনা সড়কের পাশে।

পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতের ভোজ সভা

এদিন রাতে পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত চৌধুরী আলী আকবর খান মাওলানার সম্মানে এক বিরাট ভোজের আয়োজন করেন। এ ভোজ সভায় তিনি জর্দান, হিন্দুস্তানসহ অন্যান্য দেশের কূটনীতিক ছাড়াও সেখানে অবস্থানরত পাকিস্তানি নাগরিক এবং জেদ্দার অনেক ব্যবসায়ীকেও দাওয়াত করেন। এক দেড় ঘণ্টা পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে অনেক আলোচনা চলে। একজন মিসরীয় ডাক্তারও ছিলেন, যিনি আরব জাতীয়তাবাদের সমর্থন, নুহাশ পাশার প্রশংসা এবং শহীদ হাসানুল বান্নার নিন্দা করছিলেন। চৌধুরী গোলাম মুহাম্মদ সাহেব তার কথাগুলো মেনে নিতে পারেননি

www.pathagar.com

এবং অনেকক্ষণ ধরে তার সাথে তর্ক করেন। এ ভোজ সভায় যেসব পাকিস্তানি বন্ধুর সাথে সাক্ষাত হয়, তাদের মধ্যে সৌদি ষ্টেট ব্যাংকের গভর্নর জনাব আনোয়ার আলী সাহেবও ছিলেন। সৌদি সরকারের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেন।

জেদ্দায় অবস্থান করার ইচ্ছা আমাদের ছিলো না, আমাদের আসল লক্ষ্য ছিলো মক্কা মুয়াযযামা। এ সত্ত্বেও কিছু কাজের জন্য সেখানে অবস্থান করতে হয়।

পরদিন সকালে আমরা পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতের সাথে দূতাবাসে যাই এবং আমাদের পাসপোর্টে কুয়েত, ইয়ামান এবং আরও কয়েকটি দেশের নাম অন্তর্ভুক্ত করি। কুয়েতের বন্ধুদের অনুরোধ ছিলো আমরা এমনভাবে সফরের কর্মসূচী প্রণয়ন করি, যাতে মিসর এবং সিরিয়া সফর শেষে আমরা অবশ্যই কুয়েত পৌঁছি। ইয়ামান সফরেরও সম্ভাবনা ছিলো। তাই পাসপোর্টে এসব দেশের নাম অন্তর্ভুক্ত করি।

মিসরীর দূতাবাস

এরপর পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত চৌধুরী আলী আকবর খানকে নিয়ে আমরা সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের দূতাবাসে যাই। মিসরের ভিসাতো আমাদের ছিলো। কিন্তু আমাদের আশংকা ছিলো, মিসর পৌঁছার পর যদি সিনাই উপত্যকায় যেতে কোনো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। কারণ, সিনাই হচ্ছে সামরিক এলাকা। সরকারের বিশেষ অনুমতি ছাড়া সে এলাকায় যাওয়া যায় না। মিসরীয় রাষ্ট্রদূত আমাদের নাম, পেশা এবং কি উদ্দেশ্যে আমরা সিনাই যেতে চাই সব লিখে নেন। মিসরের যেসব লোকের সাথে আমাদের সাক্ষাত করার কথা, তিনি তাদের নামও জেনে নেন। সরকারের সাথে যোগাযোগ করার পর আমাদের জানাবার ওয়াদা করেন তিনি।

মিসরের রাষ্ট্রদূত অনেক কষ্টে আমাদের সাথে কথা বলছিলেন। সম্ভবত এ অসুবিধার কারণ ছিলো, তাঁকে বাধ্য হয়ে আমাদের সাথে বিশুদ্ধ আরবিতে কথা বলতে হয়েছে। আরব দেশের শিক্ষিত শ্রেণীও সাধারণত স্থানীয় কথ্য ভাষায়ই কথা বার্তা বলে থাকেন। একবার এ অভ্যাস হয়ে গেলে বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে বেশ অসুবিধা হয়। আমাদের সাথে আলোচনাকালে তিনি বারবার জোর দিয়ে বলেন, ইসলাম হচ্ছে বিশ্বজনীন ধর্ম আর বিশ্বের সকল মুসলমান একই পরিবারভুক্ত। আমাদের জন্য তার এসব কথা ছিলো মূল্যবান। কিন্তু জাতীয়তার ব্যাপারে মিসরে একই সঙ্গে তিনটি ধারণা চালু রয়েছে। মিসরের ভেতরে ধ্বনি তোলা হচ্ছে ফেরাউনী সংস্কৃতির। আরব দেশগুলোতে আরব জাতীয়তাবাদের পতাকা বহন করা হচ্ছে। আর অনারব মুসলমানদের সামনে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের উল্লেখ করা হচ্ছে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনার সাথেই।

www.pathagar.com

শেখ মুহাম্মদ নাসীফ

মিসরীয় দূতাবাস থেকে বেরিয়ে আমরা শেখ মুহাম্মদ নাসীফের সাথে সাক্ষাত করতে যাই। কেবল জেদ্দায়ই নয়, বরং গোটা হিজাযে শেখ নাসীফ একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জ্ঞান ধন, সুন্দর চরিত্র এবং বিনয়– সর্বপ্রকার নেয়ামতে ভূষিত করেছেন। বর্তমানে তাঁর বয়স প্রায় ৮০ বছরের কাছাকাছি। সারা দুনিয়ার আলিমদের সাথে তাঁর সম্পর্ক রয়েছে। বাইরে থেকে যে সব জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তি হজ্জ করতে আসেন, জেদ্দায় তারা তাঁর বাসায়ই অবস্থান করেন। তাঁর বাসা যেন জ্ঞানীদের জন্য মেহমানখানা। তাঁর ব্যক্তিগত পাঠাগার অতি শানদার এবং স্থানীয় জ্ঞানপিপাসুদের জন্য তা যেন পাবলিক লাইব্রেরি। আকীদা বিশ্বাসের দিক থেকে তিনি সালাফী। কিন্তু তাহলেও তাঁর মেজাযে রয়েছে ভারসাম্য। প্রাচীন মনীষীদের গ্রন্থ ছেপে জ্ঞানপিপাসুদের মধ্যে বণ্টন করা তাঁর অতি প্রিয় সখ। ১৯৪৯ সালে মাওলানা মাসউদ আলম নদবী মরহুমও তাঁর বাসায়ই অবস্থান করেন। ১৯৫৬ সালে মাওলানা মওদূদীও এখানেই অবস্থান করেন। এবারও আমরা তাঁর বাসায়ই অবস্থান করতাম। কিন্তু চৌধুরী আলী আকবর খানের আতিথেয়তা আমাদেরকে জোর করে টেনে নিয়ে যায়। চিরাচরিত বিনয় আর ভালবাসা নিয়ে তিনি আমাদের সাথে মিলিত হন। তাঁর বাসায় অবস্থান না করায় তিনি মনে দুঃখ পেলেও চৌধুরী আলী আকবর খানের কারণে তা প্রকাশ করেননি। কেবল এতোটুকু বলেন, সফীর সাহেবের অধিকার অগ্রগণ্য। জানতে পারলাম, তাঁর চোখে অসুখ দেখা দিলে চিকিৎসার জন্য তাঁকে মিসর নেওয়া হয়। মাত্র কিছু দিন আগে সেখান থেকে এসেছেন এখনও সম্পূর্ণ আরোগ্য হননি। ফিরে আসার সময় চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী তিনি মাওলানাকে কিছু কিতাব উপহার দেন এবং জেদ্দা থেকে চলে আসার আগে আরও কিছু কিতাব পাঠিয়ে দেন।

অসুস্থতা এবং বার্ধক্য সত্ত্বেও তিনি মাওলানাকে দেখার জন্য বিকেলে পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে আসেন। আরবদের কাছে প্রতি-সাক্ষাতের গুরুত্ব কতটুকু, তা এ থেকে অনুমান করা যায়। শেখ নাসীফ হিজাযের বিগত পঞ্চাশ বছরের জীবন্ত ইতিহাস। হিজাযে তুর্কী শাসন কালের অবস্থা এবং ঘটনাবলী অতি আগ্রহের সাথে বর্ণনা করেন। সাহিত্য রসিক ব্যক্তিরা এসব কাহিনী শোনার জন্য তাঁর বাসায় ভীড় করেন। হিজাযের বিগত ইতিহাস সম্পর্কে গ্রন্থ বা নিবন্ধ রচনার জন্য তাঁর কাছ থেকে উপাদান গ্রহণ করতে হয়। তাঁর কাছ থেকে উপাদান নিয়ে জেদ্দা এবং মক্কা মুয়ায্যামার পত্র-পত্রিকায় অনেক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। তিনি আমাদের সাথে প্রায় এক ঘণ্টা সময় কাটান এবং সুলতান আব্দুল হামীদের শাসন কালের ঘটনাবলী শোনান।

www.pathagar.com

তিনি যেসব ঘটনা শোনান, তাঁর সব তো মনে নেই, অবশ্য অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বলে একটা ঘটনা আমার মনে রয়েছে। তিনি বলেন, দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য তখন রীতিমতো বাজার বসতো। আর মানুষ সেখান থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী দাস-দাসী ক্রয় করতো। তখন আমার যৌবনকাল, কিন্তু বিবাহ হয়নি। বন্ধুদের পরামর্শে একদিন পিতা মরহুম আমাকে ডেকে বলেন ঃ দেখ বাবা, তুমি জোয়ান হয়েছ। কিন্তু তোমাকে বিবাহ করাবার মতো অবস্থা এখনও আমার হয়নি। তাই তুমি মক্কায় গিয়ে কোনো দাসী নিয়ে এসো। প্রথমেই কথাটা আমার ভাল লাগেনি। কিন্তু পিতা-মাতার বন্ধুদের বার বার অনুরোধে শেষ পর্যন্ত রাজি হই। পরদিন মক্কা মুয়ায্যামায় দাস-দাসীদের বাজারে উপস্থিত হই। সেখানে আমি দেখি, বিভিন্ন দোকানে পণ্যের মতো দাসী উপস্থিত। তাদের দাম দস্তুর চলছে। যারা দাম করছে, তারা তার দেহের বিভিন্ন অংশে– একটি অংশ বাদে– হাত দিয়ে পরীক্ষা করেও দেখছে। এ দৃশ্য দেখে আমার মন এতোটা বিষিয়ে উঠে যে, আমি তখনই বাজার থেকে ফিরে আসি। আমি ভাবি, যে নারী অপর পুরুষের হাতের স্পর্শকে বাধা দিতে পারে না, সে নারী দিয়ে আমার কোনো কাজ নেই।

শেখ মুস্তফা আলম

পরদিন ৩০ নভেম্বর আমাদের প্রোগ্রাম ছিলো মক্কা মুয়ায্যামায় রওয়ানা হওয়ার। ফজরের পরই শেখ মুস্তফা আলম আসেন। আসলে তিনি মিসরের অধিবাসী। ইখওয়ানের সাথে সম্পর্কের কারণে তিনি কারাভোগও করেন। ১৯৫৬ সালে মুক্তি পেয়ে মক্কা মুয়ায্যমায় হজ্জ করতে আসেন। আর দেশে ফিরে যাননি। বর্তমানে জেদ্দায় অবস্থান করছেন এবং সেখানে একটা দীনি মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করছেন। তিনি আমাদের সাথে প্রায় এক ঘণ্টা কাটান এবং মিসরের ইখওয়ানের অনেক কথা শোনান।

জেদ্দা থেকে মক্কা মুয়ায্যামা

প্রায় ১০টার দিকে সে মোবারক সময় উপস্থিত। আমরা গোসল করে এহরামের কাপড় পরে দু'রাকাত নামায আদায় করি। অতঃপর লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক... শুরু হয়। জেদ্দা মীকাতের অন্তর্ভুক্ত। তাই আমাদের অবস্থান স্থল থেকেই এহরাম বাঁধা জরুরী। আমরা অধিকাংশ জিনিসপত্র চৌধুরী আলী আকবর খানের বাসভবনে রেখে আসি। শুধু বিছানাপত্র এবং কিছু জরুরী জিনিস নিয়ে মক্কাগামী ট্যাক্সী স্ট্যাণ্ডে পৌঁছি। ওস্তাদ আব্দুল হাকীম আবেদীনও সেখানে ছিলেন। তিনিও আমাদের সঙ্গে মুয়ায্যামা যাচ্ছিলেন। আমরা ২৪ রিয়াল ভাড়ায় সাত আসনের একটি ট্যাক্সী ঠিক করি। হজ্জের সময় ছাড়া অন্যান্য সময় ট্যাক্সীর

www.pathagar.com

এ ভাড়াই থাকে। অবশ্য হজ্জের মওসুমে এর চেয়ে ১০/১২ গুণ বেশি ভাড়া আদায় করা হয়।

জেদ্দা এবং মক্কার দূরত্ব ৪৫ মাইল। রাস্তা বেশ প্রশস্ত। নতুন স্কীম অনুযায়ী তা তৈরি করা হচ্ছে।

পথে ঐতিহাসিক নিদর্শন

জেদ্দা থেকে বেরুতেই প্রায় পনের মিনিট সময় কেটে যায়। শহর কতটা বিস্তৃত হয়েছে, এ থেকে তা অনুমান করা যায়। জেদ্দা থেকে মক্কার দিকে শহর এখনও বিস্তার লাভ করছে। এরপর শুরু হয়েছে পাহাড়ী এলাকা। লোহিত সাগরের তীর দিয়ে ইয়ামান থেকে জর্দান পর্যন্ত এই পর্বতমালা বিস্তৃত। এরপর শুরু হয়েছে বালুময় মরু অঞ্চল। সর্বপ্রথম যে বস্তিটি আমাদের সামনে পড়ে তা হলো উম্মে সালাম। তারপর বাহরা এবং জেদ্দা অতিক্রম করি। প্রায় ৩২ মাইল পথ অতিক্রম করার পর রাস্তার বাম দিকে একটি বস্তি পড়ে যার বর্তমান নাম শুমাইসী। কিন্তু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় এর নাম ছিলো হুদায়বিয়া। এখানেই হুদায়বিয়ার ঐতিহাসিক সন্ধি হয়েছিল। নবী (স.)-এর বাহিনী যেখানে অবস্থান করেছিল, তা রাস্তার একেবারে নিকটে। বর্তমানে সেখানে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। এখানে থাকার ইচ্ছা ছিলো। কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত নেই, আগে ওমরা করে নেবো। পরে কোনো দিন এ মসজিদটি দেখার জন্য মক্কা থেকে আসা যাবে। কিছুটা সামনে অগ্রসর হলে রাস্তার উভয় পার্শ্বে বোর্ড লাগানো ছিলো– এখান থেকে অমুসলিমরা যেন সামনে অগ্রসর না হয়। কারণ, এখান থেকে হেরেমের এলাকা শুরু হয়েছে। আরও অর্ধমাইল অগ্রসর হলে হেরেমের সীমারেখা শুরু হয়। সেখানে রাস্তার উভয় পার্শ্বে আ'লামুল হারাম– হারাম-এর নিদর্শন লাগানো ছিলো। #

www.pathagar.com

৭

মক্কা মুয়ায্যামা

৩০ নভেম্বর- ৪ ডিসেম্বর ১৯৫৯

আ'লামুল হারামের কয়েক মাইল পর থেকে শুরু হয়েছে মক্কা মুয়ায্যামার জনপদ। সামনে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল একটা পাহাড়। ড্রাইভার এবং ওস্তাদ আবদুল হাকীম আবেদীন জানালেন, এ হচ্ছে জাবালে নূর--নূরের পাহাড়। এ পাহাড়েই রয়েছে গারে হেরা– হেরা গুহা। বিগত সফরকালে রাতের বেলা এ পথ অতিক্রম করেছি। তাই জাবালে নূর যে এখান থেকেই দেখা যায়, তা বুঝতে পারিনি।

সামনে অগ্রসর হয়ে দেখি, আবদুল্লাহ ইবনে কুলাইব রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি আমাদের একদিন আগে রিয়াদ থেকে রওয়ানা হন এবং জেদ্দায় একদিন অবস্থান করে মক্কা মুয়ায্যামা চলে আসেন। মসজিদুল হারামের নিকটে যেদিকে সৌদি হাসপাতাল এবং বোহ্‌রাদের কেন্দ্র স্থাপিত, পাকিস্তান দূতাবাস বারতলা ভবনের তৃতীয় তলা ভাড়া নিয়ে রেখেছে। হজ্জের মৌসুমে এটা দূতাবাসের কর্মচারীদের অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হয়, রাষ্ট্রদূতের অনুমতিক্রমে সরকারি বেসরকারি অতিথিরাও এখানে অবস্থান করেন। বছরের অন্যান্য সময় এ ভবনটি প্রায় খালি পড়ে থাকে। এর দেখাশুনা এবং কালেভদ্রে কোনো অতিথি এলে তার জন্য এখানে একজন কর্মচারী রয়েছে। আমরা যখন সেখানে পৌঁছি তখন হারাম শরীফে যোহরের নামাযের আযান হয়েছে, ঠিক জামায়াতের সময়। আমরা নিচে জনৈক দোকানদারের কাছে জিনিসপত্র রেখে জামায়াতে শরীক হওয়ার জন্য হারাম শরীফ অভিমুখে ছুটে যাই। আমরা যখন হারাম শরীফে পৌঁছি, তখন জামায়াত শুরু হয়েছে। কাবা শরীফের প্রতি সম্মান এবং ভালবাসার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জামায়াতে শরীক হই। নামায শেষে ওস্তাদ আবদুল হাকীম আবেদীন তাওয়াফ করার জন্য চলে যান, আর আমরা ফিরে আসি আমাদের অবস্থান স্থলের দিকে। জিনিসপত্র উপরে নিয়ে তুলে রাখি। ফ্লাটের দেখা-শোনার কাজে নিয়োজিত কর্মচারীও ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) অধিবাসী আবদুল মুসাওয়ের আমাদের চা তৈরি করে খাওয়ায়। আমরা তাকে ধন্যবাদ জানাই।

মসজিদুল হারামের খতীবের সাক্ষাত

চা পান শেষে ওমরা করার জন্য আমরা বেরুচ্ছিলাম, এমন সময় হারাম শরীফের

www.pathagar.com

খতীব শেখ আবদুল মুহাইমেন আগমন করেন। আমাদের ফ্লাটের সামনের গলিতেই তাঁর বাসা। মাওলানার আগমনের খবর শুনেই তিনি চলে আসেন। কুশল বিনিময়ের পর বিগত সফর কালে হজে ব্যস্ততার কারণে সাক্ষাত না হওয়ার জন্য আফসোস করেন। তিনি আমাদেরকে সুযোগ মতো তাঁর বাসায় যাওয়ার দাওয়াত করেন। আমরা আনন্দের সাথে তাঁর দাওয়াত কবুল করি।

ওমরা

এরপর আমরা ওমরার উদ্দেশ্যে বের হই। ওমরার জন্য বাবুস সালাম দিয়ে প্রবেশ করা সুন্নাত। বাবুস সালাম দিয়ে প্রবেশ করার জন্য আমাদেরকে দীর্ঘ পথ ঘুরে যেতে হয়েছে। কারণ, আমরা অবস্থান করছিলাম বাবে ইবরাহীমের দিকে। বাবুস সালাম ছিলো তার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে। আমরা যখন ওমরা-তাওয়াফ, মাকামে ইবরাহীমে দু'রাকাত নামায আদায় করা এবং সাফা ও মারওয়ার মধ্যস্থানে দৌড়ানো থেকে অবসর হই, তখন আসরের নামাযের আযান হয়েছে। হারাম শরীফে আসরের নামায আদায় করে আমরা বাসায় ফিরে যাই। এহরাম খুলে কাপড় পরিবর্তন করি। শরীর যদিও ক্লান্ত ছিলো, কিন্তু আল্লাহর ঘর যিয়ারত এবং ওমরার সুযোগ পেয়ে আমাদের মন আনন্দে ভরে যায়।

আসরের পর শুরু হয় সাক্ষাত প্রার্থীদের সিলসিলা। আবদুল্লাহ ইবনে কুলাইব এবং তার ও আমাদের বন্ধু আবদুল কাফী আগমন করেন। মক্কা আমাদের তাওয়াফ গাইড শেখ আকীল আল-আত্তাসও আসেন। অতি আন্তরিকতা নিয়ে এরা সাক্ষাত করতে আসেন। কুশল বিনিময় শেষে বলেন, এখানে আমার এক বন্ধু শেখ সোলাইমান আসসানী আছেন। তিনি স্থানীয় মজলিশে শূরার সদস্যও। মক্কার প্রধান নিদর্শনাদি সম্পর্কে তাঁর বেশ জানাশুনা এবং প্রচুর আকর্ষণ রয়েছে। আমি তাকে বলে দিয়েছি, নিদর্শনসমূহ দেখার ব্যাপারে তিনি আপনাদের সাহায্য করবেন। প্রথম পদেই এ সুসংবাদ শুনে আমরা স্বস্তি ও আনন্দের নিঃশ্বাস ফেলি। মাগরিবের পর হারাম শরীফে কোনো কোনো পাকিস্তানি বন্ধুর সাথেও সাক্ষাত হয়।

হারাম শরীফে নামায

হজের মৌসুমে মসজিদুল হারামে নামাযীদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায়। অন্য সময়ও এ সংখ্যা খুব একটা কম নয়। যোহর এবং আসরের নামাযে মাতাফ এবং চারি দিকে বারান্দা ভরে যায়, মাগরিব এশা এবং ফজরের নামায মাতাফ এবং বারান্দা ছাড়াও– যেখানে কংকর বিছানা রয়েছে– ইত্যাদিও ভরে যায়। জামায়াতের সাথে নামাযের সময় ছাড়া সারা বছরের একটা মুহূর্তও এমন যায় না যখন আল্লাহর বান্দারা কা'বা শরীফ তাওয়াফ এবং হাজরে আসওয়াদে চুমু দেয়ার জন্য ভীড় করে না। শুনেছি, কয়েক বছর আগে মক্কায় ভীষণ বৃষ্টি হয় এবং মাতাফ অর্থাৎ তাওয়াফ করার স্থান-পানিতে ডুবে যায়। কিন্তু এ অবস্থায়ও

www.pathagar.com

আল্লাহর অনেক বান্দাহ পানিতে সাঁতার কেটেও কা'বা শরীফ তাওয়াফ করেছে। আল্লাহর এক প্রিয় বান্দাহ লতাপাতাহীন বালুময় স্থানে আল্লাহর ঘর নির্মাণ করে সারা বিশ্বের মানুষকে ডাক দেন। এটা সেই ডাকেরই প্রতিধ্বনি যে, সারা বিশ্বের মুসলমান সকল মৌসুমে লাব্বায়েক আল্লাহাম্মা লাব্বায়েক, লা-শারীকালাকা লাব্বায়েক– বলে তাওয়াফের জন্য ছুটে আসছে। আর যে ব্যক্তি আসতে পারছেনা, সে এজন্য ব্যাকুল অস্থির হয়ে আছে। আজ থেকে চার হাজার বছর আগে এ সিলসিলা শুরু হয়েছে, এবং যতো দিন দুনিয়ার বুকে ইসলামের অনুসারী থাকবে, ইনশাআল্লাহ এ ধারাও অব্যাহত থাকবে। ইসলাম যে আল্লাহর মনোনীত জীবন বিধান, এটা তার প্রমাণ ছাড়া আর কি?

পাকিস্তানি হাসপাতাল

পরদিন ১লা ডিসেম্বর মাওলানা বাসায় ছিলেন। চৌধুরী সাহেবের শরীর খারাপ ছিলো। আমি তাঁকে নিয়ে হাসপাতালে যাই। মক্কা মুয়াযযামায় হাজীদের মেডিক্যাল এইডের জন্য পাকিস্তানের পক্ষ থেকে একটা হাসপাতাল চালু আছে। বছরের অন্যান্য সময়ও এই শেফাখানা কাজ করে। চৌধুরী সাহেব সেখান থেকে ঔষধ এবং টিকা নেন। পাকিস্তানি শেফাখানাটি বেশ কাজ করছে দেখে আনন্দিত হয়েছি।

স্বরাষ্ট্র দফতর

এরপর আমি এবং চৌধুরী সাহেব স্বরাষ্ট্র দফতরে যাই। সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদ হলেও স্বরাষ্ট্র দফতর মক্কায় অবস্থিত। দফতরের মুদীর-বড় কর্তা উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানান, আমীর মুসায়েদের তারবার্তা পাওয়ার পর আমরা জন নিরাপত্তা কর্মকর্তাকে (মুদীরুল আমানিল আম) নির্দেশ দিয়েছি। আপনারা তার সাথে দেখা করুন। তার সাথে সাক্ষাত করলে তিনি জানান, আপনাদের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার জন্য আমরা সবস্থানে তারবার্তা পাঠিয়েছি। তাই আপনারা সারা দেশে যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াতে পারেন। কোথাও কোনো অসুবিধা হলে পুলিশের সাহায্য নেবেন। আমীর মুসায়েদের তারবার্তার ফলে এসব সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়েছে। তা নাহলে পাসপোর্টে উল্লেখিত স্থান ছাড়া সৌদি আরবের যত্রতত্র ঘুরাফেরা করা একজন বিদেশী নাগরিকের জন্য অসম্ভব। যারা ওমরা করতে যায়, তারা শুধু মক্কা, মদীনা এবং জেদ্দায় যেতে পারে।

ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহ দর্শন

আসরের পর আমাদের প্রোগ্রাম ছিলো মক্কা মুয়ায্যামার নিদর্শনসমূহ দেখার জন্য বের হওয়ার। শেখ আকীল আত্তাসের সাথে আগেই প্রোগ্রাম চূড়ান্ত করা হয়েছিল। তিনি এবং তার পুত্র মটর গাড়ি নিয়ে যথাসময়ে হাযির হন। তার সাথে

www.pathagar.com

শেখ সুলাইমান আসসানীও ছিলেন। আগেই সিদ্ধান্ত হয়েছে, জাবালে নূর, মিনা এবং আরাফাত থেকে শুরু করা হবে। জাবালে সাওর– যেখানে সাওর গুহা অবস্থিত– এবং অন্যান্য নিদর্শন পরে দেখা হবে।

দারুল আরকাম

সাফা পর্বতের গা ঘেষে যে রাস্তাটি উত্তরে মিনার দিকে চলে গেছে আমরা সে পথ ধরে চলছি। আমরা তখনো সাফা পাহাড়ের কাছেই ছিলাম, এ সময় শেখ সুলায়মান রাস্তায় একটা স্থানের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, নতুন নির্মাণ কাজে দারুল আরকামের অর্ধেক অংশ বর্তমানে এ রাস্তার নিচে পড়ে গেছে। আর অবশিষ্ট অংশ নিকটের দোকানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বলতে গেলে বর্তমানে মক্কা মুয়ায্যামায় দারুল আরকাম নামে কোনো ইমারত নেই।

ইসলামের ইতিহাসে দারুল আরকামের যে গুরুত্ব রয়েছে, তা অপর কোনো স্থানের নেই। হিজরতের আগে নবী (স.) এবং সাহাবায়ে কিরাম মক্কার কাফিরদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এখানে গোপনে সমবেত হতেন এবং আল্লাহর ইবাদত করতেন। নবী করীম (স.) এখানে বসে সাহাবায়ে কিরামকে ধৈর্য-স্থৈর্য অবলম্বন করার দীক্ষা দেন এবং কুরআন মজীদের কোনো আয়াত নাযিল হলে তিনি তাও পাঠ করে শুনাতেন। হযরত উমরের (রা.) ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারেও ঘরটি উল্লেখযোগ্য। সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে নবী (স.) এখানেই উপস্থিত ছিলেন, যখন হযরত উমর ইসলাম গ্রহণের আগে তাঁকে হত্যা করার মতলবে ছুটে আসছিলেন। পথিমধ্যে তিনি খবর পেলেন, তাঁর বোন এবং ভগ্নীপতিও ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাই মোড় ঘুরিয়ে তিনি বোনের বাসা অভিমুখে রওয়ানা হন। আল্লাহ তা'আলা সেখানে তাঁর মনের পরিবর্তন করে দেন। তিনি সেখান থেকে সোজা দারুল আরকাম চলে যান এবং রাসূলে খোদার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলামের ইতিহাসে যে ঘরের মর্যাদা ও গুরুত্ব এতো বেশি, তার নামনিশানা মুছে যাওয়া আমাদের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক। এখানে ইন্নালিল্লাহ পড়া ছাড়া কি-ইবা আমরা করতে পারি। যথাস্থানে ঘরটি রক্ষা করে সড়ক এবং দোকানপাট নির্মাণের জন্য কোনো পরিকল্পনা কি গ্রহণ করা যেতোনা?

মক্কা মুয়ায্যমায় অন্য যে সব নিদর্শন, ঘর এবং মসজিদ রয়েছে- ঐতিহাসিক দিক থেকে তা নিশ্চিত নয়। দারুল আরকামই ছিলো এ সবের মধ্যে সবচেয়ে নিশ্চিত। কয়েক বছর আগেও স্থানটি যথারীতি বহাল ছিলো। অতীতের সকল রাজা-বাদশাহ স্থানটি হিফাযত করেছেন। সকল যুগে সকল সময়ে এখানে কুরআন হাদীস শিক্ষা দানের কোনো না কোনো ধারা অব্যাহত ছিলো। ঘরের কাজে ভাঙ্গা গড়া চললেও স্থানটিতো অন্তত চিহ্নিত-সংরক্ষিত ছিলো। ১৯৪৯ সালে আমরা সেখানে সর্বশেষ যে গৃহটি দেখেছি, সম্ভবত তা ছিলো হিজরী নবম শতকের

www.pathagar.com

নির্মিত। তার দরজায়ও দারুল আরকাম লেখা ছিলো এবং তার ভেতরে রক্ষিত একটি বড় পাথরে একথাগুলো খোদাই করা ছিলো ঃ

فِىْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالاَصَالِ .... هذا مختبأ رسول الله ودار الخيزران وفيها مبدأ الاسلام ـ

অপর একটি পাথরে ইমারতের নির্মাতা হিসাবে সিরিয়া ও মৌসুলের উজীর আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আবুল মনসুর আল ইস্পাহানীর নাম উৎকীর্ণ ছিলো। ১৯৫৬ সালে আমাদের প্রথম সফরকালে হারাম শরীফের বর্তমান খতীবের বড় ভাই শেখ আবুস সামা আব্দুয যাহের এখানেই দারসে কুরআন এবং দারসে হাদীস পেশ করতেন। কিন্তু এখন সেখানে কি দেখছি? আমরা দুঃখ করতে করতে সামনে অগ্রসর হই। ঐতিহাসিক নিদর্শনাদির প্রতি সৌদি সরকারের এ উদাসীনতা যেকোনো মুসলিম পর্যটককে ব্যথিত না করে পারে না। শিরক বিদআতের মতো কাজ বন্ধ করা নিঃসন্দেহে ভালো, কিন্তু ইসলামের ইতিহাসের মহামূল্যবান ঐতিহাসিক নিদর্শনাদি নিশ্চিহ্ন করার কাজকে কিছুতেই ভালো কাজ বলা যায় না।

জাবালে আবু কুবাইস

সামনে অগ্রসর হলেই চোখে পড়ে একটা পর্বতমালা। হারাম শরীফের হাজরে আসওয়াদের দিক থেকেও এটা দেখা যায়। একে বলা হয় জাবালে আবু কুবাইস-আবু কুবাইস পাহাড়। কথিত আছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় এখানে বনু হাসেম গোত্রের বসতি ছিলো। কেউ কেউ বলেন, চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার ঘটনাও ঘটেছিল এ পাহাড়েই। যদিও এটা নিশ্চিত নয়।

সামনে অগ্রসর হলে হলুদ রঙের একটা সুন্দর প্রাসাদ নজরে পড়ে। এখানে একটা বালিকা মাদ্রাসা খোলা হয়েছে। বলা হয় যে, নবী (স.) যেখানে জন্মগ্রহণ করেন, সেস্থানে এ মাদ্রাসাটি খোলা হয়েছে। এখান থেকে একটু সামান্য অগ্রসর হলে রাস্তার ডান দিকে কয়েকটি গলিতে কিছু বাসাবাড়ি এবং দোকান-পাট দেখা যায়। কথিত আছে, এখানেই ছিলো শেবে আবু তালিব। কিন্তু এখন পাহাড় কেটে সমতল ভূমিতে পরিণত করা হয়েছে আর সেখানেই বাড়ি-ঘর, দোকান-পাট ইমারত। এ গলির একটা স্থানে হযরত আলীর (রা.) জন্মস্থান বলে কথিত। শেবে আবু তালিব ছিলো জাবালে আবু কুবাইস পর্বতমালায় একটি ঘাঁটি। হিজরতের আগে নবীর (স.) সাথে বনু হাশেম এ ঘাঁটিতে অবরুদ্ধ ছিলেন। এ সময় মক্কার

www.pathagar.com

কাফিররা হুজুরের (স.) গোটা কবীলার সাথে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বয়কট করেছিল।

মহানবী (স.)-এর জন্মস্থানের সামনে রাস্তার অপর দিকে বিবি খাদীজা (রা.) এবং আবু সুফীয়ান (রা.)-এর ঘর ছিলো বলে জানা যায়। মহল্লা মিসফালায় একটা স্থান সম্পর্কে কথিত আছে যে, এ স্থানটি ছিলো হযরত আবু বকর (রা.)-এর। ১৯৫৬ সালে সফরকালে এ মিসফালা মহল্লায়ই আমরা অবস্থান করি।

মসজিদুর রায়াহ ও মসজিদুল জিন

আরও কিছুদূর সামনে অগ্রসর হলে রাস্তার বাম দিকে একটা ছোট মসজিদ নজরে পড়ে। এ সম্পর্কে আমাদের বলা হয় যে, এটা হচ্ছে মসজিদুর রায়াহ। মক্কা বিজয় উপলক্ষে এ স্থানে নবী (স.) তাঁর রায়াহ (পতাকা) স্থাপন করেছিলেন। তাই সেস্থানে নির্মিত মসজিদকে বলা হয় মসজিদুর রায়াহ। আরও একটু সামনে অগ্রসর হলে আর একটি মসজিদ নজরে পড়ে, যাকে বলা মসজিদুল জিন– জিনের মসজিদ। কথিত আছে যে, জিনেরা সেখানে নবী (স.) -এর কুরআন পাঠ শুনে ঈমান এনেছিল, এ মসজিদটি সেখানে অবস্থিত। কুরআন শরীফে আছে ঃ

قُلْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَّهْدِىْ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا ـ

"আপনি বলুন, আমার কাছে অহী এসেছে যে, একদল জ্বিন (আমাকে কুরআন পাঠ করতে) শুনে বলে : আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি। যা হিদায়াতের পথ দেখায়, সুতরাং আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি। আমাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করিনা আমরা...।" (সূরা জ্বিন)।

অবশ্য সঠিক কথা হলো, জিনদের কুরআন শুনা এবং ঈমান আনার ঘটনা ঘটেছিল নাখলায় ওয়াদিয়ে বতন-এ। এ জায়গাটা মক্কা এবং তায়েফের মাঝখানে অবস্থিত।

আল-মা'লা গোরস্তান

আরও একটু অগ্রসর হয়ে চোখে পড়ে মক্কার কবরস্থান যাকে বলা হয় আল-মা'লা বা আল-মা'লাত। জাহেলিয়াতের যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত আল-মালাই হচ্ছে মক্কাবাসীদের কবরস্থান। নবী (স.)-এর দাদা আব্দুল মুতালিব, চাচা আবু

www.pathagar.com

তালিব, স্ত্রী খাদিজা (রা.) এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবকে এ কবরস্থানেই দাফন করা হয়ে থাকবে। অনেক সাহাবী এবং পরবর্তীকালের অনেক মনীষী, ফকীহ মুহাদ্দীস এ কবরস্থানেই দাফন হয়ে থাকবেন- একথা প্রায় নিশ্চিত করেই বলা যায়। কিন্তু তাদের কবরগুলো চিহ্নিত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। নাজদীদের হিজায অভিযানের আগে এখানে অনেক পাকা কবরের উপর বড় চমৎকার গম্বুজ নির্মিত ছিলো, কোনো কোনোটি বড় বড় সাহাবীদের কবর বলে কথিত এবং চিহ্নিত ছিলো। লোকেরা এ সকল কবরে নানা প্রকার নাযরানা পেশ করত। কিন্তু নাজদীরা হিযাযে আগমন করে এসব ধূলিস্মাৎ করে দেয়, পাকা কবরগুলোকে করে দেয় নিশ্চিহ্ন। বর্তমানে এখানে কোনো পাকা কবর নেই। কোনো কোনো কবরকে এখনও চিহ্নিত করা হয় সাহাবীর কবর বলে, কিন্তু এখন এটা আর নিশ্চিত করে বলা যায় না। এ কবরস্থানে খাদীজা (রা.), মহানবীর দাদা আব্দুল মুত্তালিব এবং চাচা আবূ তালেবের কবর বলে চিহ্নিত ছিলো, কিন্তু সৌদি সরকার এসব কবর নিশ্চিহ্ন করে তার সামনে দিয়ে পাকা দেয়াল নির্মাণ করেছে যাতে কেউ সেদিকে যেতে না পারে।

কুদার রাস্তা

মা'লা কবরস্থান উত্তর-দক্ষিণ দু'দিক থেকেই পাহাড়ে ঘেরা। এসব পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে একটা রাস্তা চলে গেছে। এ রাস্তাকেই বলা হয় তরীকে কুদা-কুদা রাস্তা। মক্কা বিজয় কালে মহানবী (স.) এ পথ দিয়েই মক্কায় প্রবেশ করেন।

জাবালে নূর

সামনে অগ্রসর হয়ে মিনা যাওয়ার সড়ক ডান দিকে দক্ষিণ-পশ্চিমে মোড় নিয়েছে। মোড় থেকে একটু সামনে অগ্রসর হয়ে আমরা জাবালে নূর- নূরের পাহাড় দেখতে পাই। আমরা কিছুদূর রাস্তার উপর দিয়ে চলি, পরে নিচে নেমে যাই। দু'এক মিনিট পরই আমরা পাহাড়ের একেবারে নিকটে পৌঁছে যাই। জাবালে নূর এ পাহাড়ের নতুন নাম। এর পুরাতন নাম জাবালে হেরা। যে গুহায় নবী (স.)-এর উপর সর্বপ্রথম ওহী নাযিল হয়, তা এ পাহাড়েই অবস্থিত। হেরেম শরীফ থেকে এর দূরত্ব আড়াই থেকে তিন মাইল হবে। মাওলানার অনুমান, এটা প্রায় দু'হাজার ফুট উঁচু হবে। হেরা গুহা পর্যন্ত যাওয়ার জন্য দু'বার পাহাড়ে উঠা-নামা করতে হয়। লোকদের মতে এতে প্রায় দু'ঘণ্টা সময় লাগে। আমরা সেখানে আরোহণ করার চেষ্টা করতাম, কিন্তু সময় ছিলো খুব সংকীর্ণ, তাই একাজটি অন্য সময়ের জন্য মুলতবী রাখতে হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পরে আর সুযোগ হয়নি। মনের আক্ষেপ মনেই রয়ে গেছে।

www.pathagar.com

জাবালে নূরের পাদদেশে সৌদি সরকার বর্তমানে একটি বাঁধ নির্মাণ করেছে। এ বাঁধ নির্মাণের ফলে পাহাড়ের বৃষ্টির পানি কাসীম হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। এ বাঁধ নির্মাণের আগে বৃষ্টির পানি হেরেম শরীফ এলাকায় প্রবেশ করত এবং এর ফলে বেশ অসুবিধা হতো।

মিনা থেকে আরাফাত

এরপর আমরা সামনে অগ্রসর হয়ে মিনায় পৌঁছি। স্থানে স্থানে ইমারত আছে, নেই তাতে কোনো লোকজন। মিনা এমন এক শহর, যা সারা বছরে মাত্র তিন-চার দিন আবাদ থাকে। হঠাৎ করে তার জনসংখ্যা আট-দশ লাখে পৌঁছে। এ তিন-চারদিনে বাড়ির মালিকরা হাজীদের কাছ থেকে একটা ভাড়া আদায় করে নেয়, যা বড় বড় শহরে সারা বছরেও আদায় করা সম্ভব নয়।

মিনার মধ্যস্থলে রয়েছে মাসজিদুল খায়েফ। বিদায় হজের সময় নবী (স.) যেখানে অবস্থান করছিলেন, মসজিদটি সেস্থানে নির্মিত। নবী (স.) এখানে সাহাবীদের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করেন। জামরায়ে উলা এবং জামরায়ে সানিয়ার মধ্যস্থলেও একটি ছোট মসজিদ নির্মিত হয়েছে। এটাকে বলা হয় মাসজিদুল মানহার। কথিত আছে, বিদায় হজ উপলক্ষে নবী (স.) এখানে তাঁর কুরবানীর উট জবাই করেছিলেন। অবশ্য এর কোনো প্রমাণ নেই। জামরায়ে আকাবার (জামরায়ে কুবরা) একটু আগে আর একটি ছোট মসজিদ আছে, একে বলা হয়, মাসজিদুল আশারাহ। কথিত আছে, প্রথম বছর মদীনার যে দশ জন লোক নবীর (স.) হাতে বায়আত করেছিলেন, তাঁরা এখানেই সমবেত হয়েছিলেন। জামরার নিকটেই একটু উঁচু স্থান আছে। এ স্থান সম্পর্কে কথিত আছে, দ্বিতীয় বছর মদীনার ৭২ জন লোক এখানেই নবীর (স.) হাতে বায়আত করেছিলেন। ইতিহাসে এটাই বায়আতে আকাবা নামে পরিচিত। আর এ জন্যই এ জামরার নামও করা হয়েছে জামরায়ে আকাবা। কিন্তু এ স্থানটি বর্তমানে নতুন সড়কের নিচে পড়েছে। অথচ একটু লক্ষ্য করলেই বায়আতে আকাবার মতো ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানটি রক্ষা করা যেতো।

মিনার পর ওয়াদিয়ে মুহাস্‌সার হয়ে আমরা মুযদালিফায় পৌঁছি। মহানবীর (স.) জন্মের পূর্বে আল্লাহর নির্দেশে পাখি কংকর নিক্ষেপ করে আবরাহার বিশাল বাহিনীকে ধ্বংস করা হয়েছিল এ ওয়াদিয়ে মুহাসসারে। এটা আযাবের ওয়াদী-শাস্তির উপত্যকা। এ জন্য বিদায় হজ কালে এ স্থানটি দ্রুত অতিক্রম করার জন্য নবী (স.) সাহাবীদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ উপত্যকার দু'ধারে পর্বতমালা এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যে, সত্যি সত্যি এ পথ অতিক্রমকালে ভয় হয়।

আরাফাত থেকে ফেরার পথে হাজীরা মুযদালিফায় একরাত অবস্থান করে এবং রমিইয়ে জিমারের জন্য কংকর সংগ্রহ করে। কুরআন মজীদে এর নাম দেয়া

www.pathagar.com

হয়েছে আল-মাশ আরুল হারাম। এখন এটা শুধু সেখানে নির্মিত একটি মসজিদের নাম। এ মসজিদ ছাড়া সেখানে আর কোনো ইমারত নেই।

মুযদালিফার পর হারাম শরীফের সীমারেখা শেষ। এখানে চিহ্ন দেয়া আছে। নবীর (স.)-এর পূর্বে হজের সময় অন্যান্যরা আরও আগে অগ্রসর হলেও কুরাইশরা মুযদালিফার আগে অগ্রসর হতো না। তারা বলতো, আমরাতো হেরেমের অধিবাসী। তাই আমরা হেরেমের সীমারেখার বাইরে যাবো না। কিন্তু বিদায় হজের সময় নবী (স.) আল্লাহর নির্দেশ[১] অনুযায়ী অন্যান্যদের সাথে তিনি নিজেও আরাফাত পর্যন্ত গিয়েছেন।

মুযদালিফা থেকে আরাফাত যাওয়ার দু'টি রাস্তা আছে। একটা রাস্তা ডানদিক দিয়ে। একে বলা হয় আলদাব। হাজীরা এ রাস্তা দিয়েই মুযদালিফা থেকে আরাফাত যায়। দ্বিতীয় রাস্তাটি বাম দিক দিয়ে। একে বলা হয় তরীকুল মাযেমীন। হাজীরা এ পথ দিয়ে আরাফাত থেকে মুযদালিফা ফিরে আসেন।

আরাফাতে মসজিদুন নামিরা ছাড়া কেবল একটি ইমারত নজরে পড়ে। হজের সময় এটা প্রশাসনিক দফতর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এখানে ইমারতের কোনো দরকারও নেই। কারণ হাজী সাহেবরা এখানে মাত্র কয়েক ঘণ্টা অবস্থান করেন। এ জন্য তাঁবুই যথেষ্ট। কয়েক বছর আগেও আরাফার দিকে মাত্র দুটি রাস্তা ছিলো। তাই হাজী সাহেবদেরকে মাগরিবের পর মুযদালিফায় ফিরে যেতে বেশ কষ্ট করতে হতো। কিন্তু বর্তমানে পাঁচটি সড়ক নির্মাণের ফলে বেশ সুবিধা হয়েছে। ১৯৫৬ সালেও সেখানে দু'টি রাস্তাই ছিলো। তাই মাগরিবের পর বাসে রওয়ানা হয়ে রাত ১২টা ১টায় মুযদালিফায় পৌছা যেতো। এখন এখানে স্থানে স্থানে পানির কলও বসানো হয়েছে। তাই হাজীদেরকে পানির জন্যও আর কষ্ট করতে হয় না।

আরাফাতের সাথেই উত্তর দিকে মসজিদে নামিরার একেবারে সামনেই রয়েছে ওয়াদিয়ে মারনা, হজের সময় এখানে থামা নিষিদ্ধ।

আরাফাতে পৌছে আমরা জাবালুর রাহমাতে আরোহণ করি। এটা নতুন নাম। পুরাতন নাম জাবালুল আলাল। এখানে একটা ক্ষুদ্র পাহাড়ের পাদদেশে নবী (স.) সাহাবায়ে কিরামের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। এখানে একটা ছোট মসজিদ আছে। কথিত আছে যে, এখানে নবী (স.) অবস্থান করতেন। পাহাড়ের উপরের মসজিদে আমরা মাগরিবের নামায আদায় করি। এরপর নিচে নেমে আসি। এখানে বেশ কিছু কফি হাউস আছে। হজ ছাড়া অন্যান্য সময় মক্কার অনেকেই বিকালের দিকে এখানে বেড়াতে আসে। তাই এ কফি হাউসগুলো সারা বছরই চলে। আমরাও এক স্থানে বসে চা পান শেষে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে শারে আল-মানসুর হয়ে মক্কা মুয়ায্যামায় ফিরে আসি। নব নির্মিত শারে আল-মানসুর

১. এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে সূরা বাকারার ১৯৯ নম্বর আয়াতে। - সম্পাদক

www.pathagar.com

সরাসরি মক্কা থেকে আরাফাতে গিয়াছে। এর ফলে আরাফায় অবস্থানের দিন যাতায়াতে বেশ সুবিধা হয়েছে।

ওস্তাদ আহমদ মুহাম্মদ জামাল

পরদিন ৩রা ডিসেম্বর ওস্তাদ আহমদ মুহাম্মদ জামাল আমাদের এখানে আসেন এবং বেশ কিছুক্ষণ অবস্থান করে পাকিস্তানের অবস্থা শুনেন এবং তাঁদের অবস্থা শুনান। ১৯৫৭-৫৮ সালে ইসলামিক কলোকোয়ামে আমাদের দেশের এক শ্রেণীর নব্যপন্থীদের বিরুদ্ধে যারা তাঁর বক্তৃতা শুনেছেন, ওস্তাদ আহমদ মুহাম্মদ জামাল সম্পর্কে তারা নিশ্চিত অবহিত আছেন। তিনি এবং তার বড় ভাই সালেহ মুহাম্মদ জামাল মক্কা মুয়ায্যামা থেকে প্রকাশিত দৈনিক আল-নাদওয়ার সম্পাদক। 'মাকতাবাতুস সাকাফাহ' নামে তাঁর একটি লাইব্রেরিও আছে। এরা দু'ভাই শহীদ হাসানুল বান্নার প্রভাবে প্রভাবিত। তাই এদের চিন্তাধারা অনেক সুস্থ। সালেহ মুহাম্মদ জামাল একটি সাংবাদিক প্রতিনিধি দলে তেহরান গিয়েছেন। তাই তার সাথে আমাদের সাক্ষাত হয়নি।

এ দিন আসরের পর নাসিম হিজাযী এবং তার সাথে রাওয়ালপিন্ডির উকিল নাসির আহমদ সাহেব ওমরা করার জন্য মক্কা আসেন। তাদের সাথেও আমাদের সংক্ষিপ্ত সাক্ষাত হয়েছে। এশার নামাযের পর আমরা শেখ আব্দুল মুহাইমেনের সাথে বিদায়ী সাক্ষাতকারে মিলিত হই।

পরদিন ৩ ডিসেম্বর সকালে আবদুল্লাহ ইবনে কুলাইবের বাসায় আমাদের নাশ্‌তার দাওয়াত ছিলো। তার বাসা হেরেম শরীফ থেকে অনেক দূরে জারওয়াল মহল্লায়। সেখানে তার বন্ধু জাকারিয়া সাহেবের সাথে আমাদের সাক্ষাত হয়। ইনি ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসী। অধ্যয়নের জন্য হিন্দুস্তানের মাদ্রাসাতুল ইসলাহ্‌তেও কয়েক বছর কাটান। তাই ভালো উর্দুও জানেন। আমাদের সাথেও উর্দুতেই কথাবার্তা বলেন। মাওলানার অধিকাংশ কিতাব সম্পর্কে কেবল অবহিতই নন বরং ইন্দোনেশীয় ভাষায় তার কয়েকটি কিতাব তরজমাও করেছেন।

অন্যান্য নিদর্শন

সাড়ে দশটার দিকে আমরা আবার বের হই নিদর্শন দেখার জন্য। এবার আমাদের সাথে ছিলেন মক্কা মুয়ায্যমার ব্যবসায়ী মুহাম্মদ আলম এবং আব্দুল্লাহ ইবনে কুলাইব। হিন্দুস্থানে কোনো এক স্থানে মুহাম্মদ আলমের জন্ম। কিন্তু ছোট বেলায়ই তিনি মক্কায় হিজরত করেন। এখন সেখানে তার আতরের ব্যবসা এবং এ ব্যবসায় তিনি বেশ সফলও। বিগত ১৯৫৬ সালে সফরকালে ওমানে তাঁর সাথে আমাদের দেখাও হয়। আমরা তখন ওমান থেকে দামেস্ক যাচ্ছিলাম আর তিনি বাইতুল মাকদাস যিয়ারত শেষে দামেস্ক যাচ্ছিলেন। তিনি আমাদের সাথে একই গাড়িতে আরোহণ করেন। মাওলানা সম্পর্কে আগে থেকেই জানতেন, কিন্তু

www.pathagar.com

সাক্ষাত হয়নি। হজের সময়ও তার সাথে সাক্ষাত হয়। এবার তিনি নিজেই নিদর্শনাদি দেখবার প্রস্তাব করেন। তার এ প্রস্তাব আমরা কবুল করি।

মসজিদে মুহাসসাব ও মসজিদুল কাবাশ

এবার প্রথমে আমরা মিনা যাই। সেখানে মসজিদে মুহাস্‌সাব, মসজিদুল কাবাশ এবং অন্যান্য মসজিদ বাইরে থেকে দেখি। মসজিদে মুহাসসাব মিনার পথে। জনশ্রুতি অনুযায়ী বিদায় হজ থেকে ফেরার পথে যেখানে নবী (স.) পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করেছিলেন, সেখানে মসজিদটি নির্মিত হয়েছে। মিনার অভ্যন্তরে যেস্থানে মসজিদুল কাবাশ নির্মাণ করা হয়েছে, কথিত আছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) এ স্থানে দুম্বা জবাই করেছিলেন।

তুর্কী শাসনকালে এসব মসজিদ নির্মিত হয়েছে। নাজদী শাসকদের তুলনায় তুর্কী এবং মক্কার শাসকরা অনেক সুস্থ আকীদা-বিশ্বাসের অধিকারী। তাই তারা স্থানে স্থানে বহু মসজিদ নির্মাণ করেছেন। যেখানেই তাদের মনে হয়েছে যে এখানে কোনো ঘটনা ঘটেছিল, সেখানেই তারা একটা মসজিদ নির্মাণ করেছেন। যেসব আলিম ঐতিহাসিক নিদর্শন নিয়ে গবেষণা করেছেন, দারুল আরকাম ছাড়া অন্য কোনো স্থান সম্পর্কে তারা নিশ্চিত নন। জনাব মুহাম্মদ আলম অনেক পাথুরে পথ ডিঙ্গিয়ে আমাদের আরও একটি স্থানে নিয়ে যান। এ স্থানেও হযরত ইবরাহীম (আ) দুম্বা জবাই করেছেন বলে প্রসিদ্ধ।

জাবালে সাওর

এরপর আমরা জাবালে সাওর– যে পাহাড়ে সাওর গুহা রয়েছে- দেখার জন্য শারে আল-মনসুর দিয়ে অগ্রসর হই। রাস্তার মাইল পোস্টের হিসাব অনুযায়ী মক্কা মুয়ায্‌যমা থেকে ৯ মাইল দূরে জাবালে সাওর অবস্থিত। সড়ক থেকে এর দূরত্ব অর্ধ মাইল হবে। জাবালে নূরের তুলনায় এটা অনেক উঁচু। উপরে উঠার পথও বিপদ সংকুল। এর ঠিক উপরে সাওর গুহা অবস্থিত। খুব কম লোকই সে পর্যন্ত উঠার সাহস করে। যারা সে পর্যন্ত উঠার সাহস করে, তারা খাদ্য-পানীয় সাথে নিয়ে খুব ভোরে আরোহণ করে দুপুর পর্যন্ত সেখানে পৌঁছতে পারে। আমরাও সেখানে পৌঁছার চেষ্টা করতাম। কিন্তু বেলা অনেক হয়ে গিয়াছে। সূর্যের প্রখর তাপ। তাছাড়া আমাদের সাথে খাদ্য-পানীয় কিছুই ছিলোনা। আমরা রাস্তা থেকে গাড়ি নামিয়ে এর অনেকটা কাছে যাওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু আমাদের গাড়ি বালুর মধ্যে দেবে যায়। অতি কষ্টে তা তুলে সড়কে ফিরে আসি।

সাওর গুহা। হিজরত উপলক্ষে নবী (স.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) মক্কার কাফিরদের থেকে আত্মগোপনের জন্য এ গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। কুরআন মজীদে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِى الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ـ

"যখন কাফিররা তাকে বের করে দিয়েছিল, দু'জনের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়। যখন তারা দু'জনেই গুহায় ছিলেন যখন তিনি তার সাথীকে বলছিলেন, দুশ্চিন্তায় নিমজ্জিত হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথেই রয়েছেন" (সূরা তওবা : ৪০)

এ সাওর গুহা মক্কা থেকে দক্ষিণে অবস্থিত। প্রাচীনকালে মক্কা থেকে ইয়ামানগামী রাস্তা এর পাশ দিয়ে চলে গেছে। অবাক হতে হয়, নবী (স.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) মদীনা মুনাওয়ারায় যাবার জন্য বেরিয়েছিলেন। আর মদীনা মুনাওয়ারায় তো মক্কা থেকে উত্তর দিকে অবস্থিত। তাই তাঁরা দক্ষিণ দিকে গেলেন কেন এবং বিশেষভাবে এ গুহাটি বেছে নিলেনইবা কিভাবে! পাহাড়ের এতো উপরে এর খোঁজ নেয়াও খুব সহজ কাজ নয়। তাছাড়া আশে-পাশের পাহাড়গুলোও দেখতে প্রায় একই রকম, উচ্চতাও প্রায় একই সমান। খুব সম্ভব আল্লাহ তা'আলা অহীর মাধ্যমে তাঁর নবীকে এ পাহাড় সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন, অথবা মহানবী (স.) এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) মক্কার আশে-পাশের পাহাড়গুলো সম্পর্কে পূর্ব থেকেই অবহিত ছিলেন এবং সাওর গুহা সম্পর্কে তারা পূর্বাহ্নেও ওয়াকিফহাল ছিলেন। যাই হোক, আশ্রয়ের জন্য এ স্থানটি নির্বাচনের মধ্যে কৌশল ছিলো এই যে, মক্কার কাফিররা নবী-কে মদীনার পথে খোঁজ করবে। অথচ এর সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে ইয়ামনের পথে এমন এক গুহায় তিনি আশ্রয় নিয়েছেন, যেখানে আশ্রয় নেয়ার কথা স্বাভাবিকভাবে তারা ভাবতেও পারবে না।

শেখ আকীল আত্তাসের দাওয়াত

এদিন যোহরের পর শেখ আকীল আত্তাসের বাসায় আমাদের দাওয়াত ছিলো। এজন্য তিনি বিশেষ আয়োজন করেন। এ উপলক্ষে তিনি বেশ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকেও দাওয়াত করেন। এদের মধ্যে ছিলেন শেখ মুহাম্মদ নাসীফ, মাসিক 'আল-হজ' সম্পাদক ওস্তাদ সাঈদ-আমুদী, ওস্তাদ আহমদ মুহাম্মদ জামাল, মাসিক 'আল-মিনহাল' সম্পাদক ওস্তাদ আব্দুল কুদ্দুস আনসারী, সাপ্তাহিক 'কোরাইশ' সম্পাদক ওস্তাদ আহমদ সাববাঈ, ভারত-পাকিস্তান সংক্রান্ত বিভাগের প্রধান শেখ আবদুর রহমান মাযহার এবং বাদশাহ সউদের বিশেষ কবি ও মজলিশে সূরার সহ-সভাপতি ওস্তাদ আহমদ আল-গাযযাদী প্রমুখ। ভালোই হয়েছে। এ সুযোগে এদের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সাথে সাক্ষাত ও পরিচয় হয়ে গেল।

www.pathagar.com

মক্কা মুয়ায্যামার ইখওয়ান যুবক

এদিন এশার পর আমরা মকবুল আবদুল কাফীর বাসায় যাই। তাঁর জারওয়ালের বাসায় মক্কা এবং জেদ্দা থেকে অনেক নওজোয়ান সমবেত হয়েছে। শরীয়া কলেজের প্রধান ওস্তাদ আহমদ আলী এবং হেরেম শরীফের খতীব শেখ আব্দুর রাজ্জাক হামযার পুত্রও ছিলো এদের মধ্যে। এরা সকলে মাওলানার কিতাব পড়েছিলেন। খাওয়া শেষে এরা বিভিন্ন বিষয়ে মাওলানাকে প্রশ্ন করেন। তাদের প্রশ্নের ধরণ ছিলো রিয়াদ এবং যাহরানের নওজোয়ানদের প্রশ্নের মতো, আরব জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে এদের আবেগ ছিলো তীব্র। মাওলানা অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে সকল প্রশ্নের জবাব দেন। এদের উপর মাওলানার জবাবে শুভ প্রভাব প্রতিফলিত হয়।

শেখ আবদুল মালেক বিন ইবরাহিম

পরদিন ৪ ডিসেম্বর আমরা শেখ আব্দুল মুহাইমেনকে সঙ্গে নিয়ে শেখ আব্দুল মালেক ইবনে ইব্রাহীমের সাথে দেখা করতে যাই। ইনি বড় মুফতী শেখ মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীমের ছোট ভাই। ১৯৪৯ সালে মরহুম মাওলানা নদবীর সাথে আমি যখন রিয়াদ যাই, তখন ইনি ছিলেন শাহী মসজিদের খতীব। এখন তিনি হিজাযে আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার বিভাগের প্রধান। তার সাথে বিশেষ কোনো বিষয়ে আলোচনা হয়নি। রিয়াদের আলিম এবং আমীরদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা এবং পাকিস্তানের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন। ফিরে আসার সময় তিনি আমাদের বেশ কিছু মূল্যবান কিতাব উপহার দেন।

শেখ আবদুল ওয়াহহাব দেহলবী

ফেরার পথে আমরা শেখ আব্দুল ওয়াহহাব দেহলবী এবং তাঁর চাচা শেখ মুহাম্মদ ইসমাইলের সাথে দেখা করতে যাই। তার খান্দান দিল্লীর মশহুর খান্দান। বিগত ৬০ বছর ধরে মক্কা মুয়ায্যামায় আছেন, কিন্তু বেশ-ভূষা, ভাষা এবং জীবন ধারায় এখনও কঠোর দেহলবীই আছেন। শেখ আব্দুল ওয়াহহাব খুব বড় আলিম এবং মুহাককেকও। বিশাল তাঁর ব্যক্তিগত পাঠাগার। যদিও লেখেন খুব কমই। মাঝে মধ্যে 'আল-হাজ' এবং অন্যান্য সাময়িকীতে তার লেখা দেখা যায়। গত কয়েক বছর থেকে তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ যাচ্ছে।* অন্যান্য অনেক কথা ছাড়াও তিনি মাওলানার নিকট তাফহীমুল কুরআন সম্পর্কে জানতে চান। আলোচনা কালে মরহুম মাওলানা আবুল কালাম আযাদ সম্পর্কে এক বিস্ময়কর কথা বলেন। তিনি বলেন, মাওলানার সূরা ফাতিহার তাফসীর 'উম্মুল কুরআন' যখন বের হয়, তখন দেখি কি 'ইয়্যাকানা'বুদু ওইয়্যাকানাস্তাঈন' এর তফসীর তাতে আদৌ নেই।

* অবশেষে ১৯৬২ সালে তিনি ইনতিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

www.pathagar.com

একবার আমি কোলকাতা গিয়ে মাওলানার সাথে দেখা করে এ দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তিনি জানান, কলেবর বেড়ে যাচ্ছিলো। তাই আমি এ আয়াতের তাফসীর এড়িয়ে গেছি।

হেরেম শরীফের নির্মাণ কার্য

মক্কা মুয়ায্যামায় পাঁচদিন অবস্থান কালে হেরেম শরীফের সম্প্রসারণ এবং নতুন ইমারত নির্মাণ কাজ দেখার সুযোগ হয়েছে আমাদের। এ কাজ চলতো দ্রুত। কাজ এখন পর্যন্ত অর্ধেকও শেষ হয়নি। গোটা ইমারত নির্মাণ করা হচ্ছে দোতলা। সাফা-মারওয়ার মধ্যখানে দৌড়ের রাস্তাও দ্বিমুখী এবং দ্বিগুণ প্রশস্ত করা হচ্ছে। বলা চলে, একাজটি প্রায় সমাপ্তই হয়েছে। যে ব্যাপক আকারে এ সম্প্রসারণ কাজ শুরু হয়েছে, তা দেখে মনে হয় এতে প্রায় এক যুগ লেগে যাবে। কাজটি সমাপ্ত হলে হেরেম শরীফের আয়তন বৃদ্ধি পাবে প্রায় আড়াইগুণ এবং তাতে এক সাথে পাঁচ লক্ষ লোক নামায আদায় করতে পারবে। অনুমান করা হচ্ছে এতে প্রায় দু'শ কোটি টাকা ব্যয় হবে। সমস্ত নির্মাণ ব্যয় বাদশাহ সউদ তাঁর ব্যক্তিগত তহবিল থেকে করেছেন। তাঁর কার্যাবলীর মধ্যে এটা শীর্ষে স্থান পাবে।

মক্কা মুয়ায্যামার আবহাওয়া

এখানে মক্কায় মুয়ায্যমায়ার আমরা জেদ্দা থেকেও বেশি উষ্ণতা অনুভব করি। নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস এমনিতেই শীতকাল। তারপরও এত গরম ছিলো, আমরা রাতে দরজা জানালা খোলা রেখে পাখা ছেড়ে ঘুমাতাম। গরম ছাড়া এখানে মশা-মাছিও অনেক। এ কারণেও পাখা চালাতে হয়। তা না হলে মশা-মাছি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য চাদর গায়ে দিয়ে শুতে হয়। আর চাদর গায়ে দিলে গরমে ঘুমানো মুশকিল। যতোদিন আমরা মক্কায় ছিলাম, এটাই ছিলো আমাদের নিয়ম। ভোরে উঠে অনেককে দেখতাম খোলা ছাদের ওপর মশারী টানিয়ে শুয়ে আছে। ৪ ডিসেম্বর শুক্রবার জুমার নামায শেষে আমরা তায়েফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই।

মক্কা থেকে তায়েফ

মক্কা এবং তায়েফের মধ্যে কোনো নিয়মিত বাস সার্ভিস নেই। কেবল ছোট ছোট ট্যাক্সী যাতায়াত করে। দূরত্ব ১২০ কিলোমিটার প্রায় ৭৫ মাইল। রাস্তা খারাপ বলে ট্যাক্সীওয়ালারা অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করতো। তারা আমাদের কাছ থেকে ৭৫ রিয়াল ভাড়া আদায় করে।

মক্কায় পৌঁছার পরই আমরা ঠিক করেছিলাম, জুমার দিন আমরা তায়েফ যাবো। একদিন সৌভাগ্যক্রমে হেরেম শরীফে আমাদের পাকিস্তানি বন্ধু ফয়েয আলমের সাথে দেখা হয়। তিনি কয়েক বছর থেকে তায়েফ আছেন এবং সেদিনই তিনি সেখানে ফিরে যাচ্ছিলেন। তার মাধ্যমে তায়েফে অবস্থান এবং বিভিন্ন স্থান দেখার

www.pathagar.com

ব্যবস্থাপনায় বেশ সুবিধে হয়েছে। তা নাহলে সেখানে আমরা ছিলাম সম্পূর্ণ অপরিচিত। আমাদের চেনা-শোনা কেউ সেখানে ছিলো না।

যে পথ ধরে আমরা তায়েফ যাই, মক্কা-মিনার পথে কিছুদূর গিয়ে তা বাম দিকে মোড় নিয়েছে। অত:পর জাবালে নূরের পাদদেশ দিয়ে অগ্রসর হয়ে আমরা জা'আরানা'র দিকে মোড় নেই। হোনায়েন ও তায়েফের যুদ্ধ শেষে নবী (স.) এখানে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে বনু হাওয়াযেম এবং বনু সাকীফ কবীলার গনীমতের মাল বণ্টন করেছিলেন। অতি ঢালু পথ হলেও তা ছিলো সম্পূর্ণ কাঁচা। কোথাও শক্ত বালি পড়ে, আবার কোথাও পাথুরে ভূমি। দশ-পনের মিনিট চলার পর রাস্তাটি আবার দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছে। বাম দিকের রাস্তাটি গিয়েছে জা'আরানা, আর ডান দিকের রাস্তাটি গিয়েছে শারায়ে। আমরা শারায়ের পথ ধরে অগ্রসর হই এবং ২০ মিনিট পর শারায়ে পৌঁছি। এটা একটা ক্ষুদ্র জনপদ। একটা পানির কূপকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এ জা'আরানা জনপদটি। এখান থেকে ঠিক উত্তর দিকে জা'আরানা। কথিত আছে জা' আরানা এবং শারায়ের মধ্যস্থলের উপত্যকায় জাহেলী যুগের তিনটি বড় মেলার মধ্যে মাজান্নার মেলা জমতো। জাহেলী যুগের অপর দু'টি বড় মেলা ছিলো ওকায ও যুল মাজায।

শারায়ে থেকে প্রায় আধা ঘণ্টা চলার পর আমরা যাইমা পৌঁছি। স্থানটি বেশ শস্যশ্যামল এবং মনোরম। এখানে বেশ কিছু বাগবাগিচা এবং ঝর্ণা আছে। অন্যান্য গাছ ছাড়া এখানে কাটা গাছও দেখা যায়। আমরা এখানে নেমে আসরের নামায আদায় করে আবার রওয়ানা হই। যাইমার পর যে রাস্তাটি উয়াদিল ইয়ামানিয়াহ- শুরু হয়েছে, তা খুবই কষ্টদায়ক। আরবদের কথ্য ভাষায় একে বলা হয় বাত্তাল। এ রাস্তায় পাথর খণ্ড এমনভাবে ছড়িয়ে আছে যেমনটি করা হয় নতুন রাস্তা নির্মাণের আগে কংকর বিছিয়ে। স্থানে স্থানে পাথর খণ্ড এমনভাবে স্তূপ করে রাখা হয়েছে যে, তার ভেতর দিয়ে গাড়ি অগ্রসর হওয়া খুবই কষ্টকর। বৃষ্টির সময় পানির স্রোত পাহাড় থেকে এ পাথর খণ্ড বয়ে আনে। সরকার এসব পাথর অপসারণের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু বৃষ্টির পানির স্রোত এসব চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। এ পথে আমাদের মোটর গাড়ির টায়ার ফেটে যায়। এর ফলে আমাদের বেশ সময় নষ্ট হয়, প্রায় পনের ষোল মাইল পর্যন্ত রাস্তার এ দশা ছিলো। এরপর রাস্তা কিছুটা ভালো ছিলো। কিন্তু পাহাড়ের মধ্য দিয়ে উপরে উঠে গেছে। ড্রাইভার অনেক শক্তিতে গাড়ি চালাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর পাহাড়ী এলাকা শেষ হয় এবং আমরা আল সাইলুল কাবীর পৌঁছি।

একটা খোলা উপত্যকায় আল-সাইলুল কাবীর অবস্থিত। এখানে স্থানে স্থানে দোকানপাট আছে। হজের মৌসুমে এগুলো ভালো জমে। এখনও আমরা সেখানে বেশ সরগরম দেখতে পেয়েছি। কেউ কেউ বলেন, সাইলুল কাবীরকেই হাদীস

www.pathagar.com

শরীফে নজদবাসীদের মীকাত বলা হয়েছে। এখানেই রয়েছে কারনুল মানাযিল। আবার কেউ বলেন, এর ডাইনে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে একটা পাহাড়ের নাম হচ্ছে কারনুল মানাযিল। এ জন্য তায়েফ এবং নাজদ থেকে আগত হাজীরা এখান থেকেই এহরাম বাঁধে। এখানে অনেক গোসলখানা আছে এবং পয়সার বিনিময়ে তাতে গোসল করা যায়। এখানে একটি সুন্দর মসজিদও নির্মিত হয়েছে। এ মসজিদে আমরা মাগরিবের নামায আদায় করি। নাজদের লোক ইমামতি করেন। তিনি এতো দ্রুতগতিতে নামায পড়ান যে, তার অনুসরণ করা আমাদের জন্য বেশ কষ্টকর হয়ে পড়ে।

সাইলুল কাবীরের পর কিছুদূর পর্যন্ত পাহাড় কেটে রাস্তা করা হয়েছে। যে পাহাড় কেটে এ রাস্তা করা হয়েছে, মিসরের খ্যাতনামা সাংবাদিক মুহাম্মদ হুসাইন হাইকাল তার নাম বলেছেন যাতুল ইরক। হাদীস শরীফে ইরাকবাসীদের জন্য মীকাত হিসাবে যাতুল ইরক-এর উল্লেখ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এখান থেকে উত্তর দিকে উশাইরার নিকটে কোনো এক স্থানের নাম যাতুল ইরক। এ পাহাড় কেটে রাস্তা করা হয়েছে সাম্প্রতিক কালে। ইতোপূর্বে যারা এ পথে যাতায়াত করতো, খুব সম্ভব তাদেরকে পাহাড় ঘুরে আসতে হতো। হুনাইন যুদ্ধের পর নবী (স.) এবং সাহাবায়ে কিরাম তায়েফ অবরোধের জন্য এ পথ দিয়ে এসেছিলেন। তাঁদেরকেও পাহাড় ঘুরেই আসতে হয়েছিল।

অন্ধকারে আমরা দেখতে না পেলেও জানতে পেলাম, এ পাহাড়ের পর রাস্তা দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছে। ডান দিকের পথটি চলে গেছে তায়েফ। আমরা এ পথ ধরেই অগ্রসর হই। আর বাম দিকের রাস্তা উশাইরা হয়ে রিয়াদ চলে গেছে।

একটু পর আর একটি স্থান সামনে পড়ে, যাকে বলা হয় আস-সাইলুস সগীর। এখানে আমরা নামিনি। রাস্তার অবস্থা ছিলো তথৈবচ। কোথাও শক্ত পাথর পড়তো, গাড়ি চলতো খুব ধীর গতিতে। আবার কোথাও রাস্তা কিছুটা সমতল ছিলো, গাড়ি চলতো বেশ দ্রুত গতিতে। এখানেও এক জায়গায় আমাদের গাড়ির টায়ার ফেটে যায়। অন্ধকারে অনেক কষ্ট করে ড্রাইভার নতুন টায়ার লাগায়। আবার আমরা রওয়ানা করি। সুখের বিষয়, ড্রাইভার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে আস্-সাইলুল কবীরে টায়ার মেরামত করিয়ে নিয়েছিল। নতুবা আমাদের কি দশা হতো বলা মুশকিল। আমরা যখন তায়েফ থেকে ২৭ কিলোমিটার দূরে, তখন আমাদের সামনে পড়ে হাওয়াইয়া। এখানেই তায়েফের বিমান বন্দর। এখান থেকে তায়েফ পর্যন্ত বেশ চমৎকার পাকা রাস্তা। এ সড়কে উঠে আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি। #

www.pathagar.com

৮

তায়েফ

৪-৬ ডিসেম্বর ১৯৫৯

রাত প্রায় ১০টার দিকে আমরা তায়েফ পৌঁছি। আমাদের আশংকা ছিলো, বিলম্ব দেখে ফয়েয আলম সাহেব এবং অন্যান্য বন্ধুরা নিরাশ হয়ে যান কি-না? কারণ, আমরা তাদের বলেছিলাম, মাগরিব পর্যন্ত পৌঁছার কথা। আলহামদুলিল্লাহ, তায়েফ শহরে পৌঁছে দেখি ফয়েয আলম সাহেব এবং তোখতা আখুন্দ একখানা গাড়ীতে দাঁড়িয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। তোখতা আখুন্দ একজন তুর্কীস্তানী মুহাজির। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে দারুল ইসলাম, জামালপুর, পাঠান কোটে তিনি মাওলানার সাথে কয়েক বছর কাটান। তারপর হিজরত করে মক্কা মুয়ায্যামায় চলে আসেন। তিনি যে তায়েফে আছেন, আমাদের তা জানা ছিলো না। হঠাৎ ১৪ বছর পর মাওলানার সাথে তাঁর দেখা। তাই অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে কোলাকুলী করেন।

তুর্কী মুহাজির

বোখারীন মহল্লায় তারা আমাদের থাকার ব্যবস্থা করেন। এ মহল্লার অধিকাংশ অধিবাসী ছিলো রুশীয় তুর্কিস্তানের মুহাজির। যে ঘরে আমরা অবস্থান করি, তার পাশেই ছিলো একটা মসজিদ। ইমামও ছিলেন একজন তুর্কী মুহাজির। তার নাম কারী আবদুস সালাম। আমাদের সেখানে পৌঁছা মাত্রই অনেক তুর্কী বন্ধু আসেন এবং আমাদের সাথে বেশ কিছুক্ষণ কাটান। এদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন, যারা রাশিয়ায় কমিউনিস্ট বিপ্লবের পর দেশ ছেড়ে প্রথমে ভারতে এবং পরে আরবে চলে আসেন। হিন্দুস্তানে বেশ কিছুকাল অবস্থানের ফলে তারা ভালো উর্দু জানতেন এবং আমাদের সাথে উর্দুতেই কথাবার্তা বলেন। মরহুম তোখতা আখুন্দের ভাষা ছিলো চমৎকার। তুর্কী, ফার্সী, উর্দু আরবি সব একসাথে মিলিয়ে কথা বলতেন তিনি। যেমন পানি আসেনি- তিনি বলতেন- আব না আয়া। তায়েফে এরাই হচ্ছেন আমাদের সবচেয়ে বেশি পরিচিত, সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ। এদের কাছে আমরা যে আদর-যত্ন পেয়েছি, অন্যখানে তা পাওয়া কঠিন, তারা দু'দিন যাবত অত্যন্ত যত্নের সাথে আমাদের মেহমানদারী করেন। নিষ্ঠা আর আন্তরিকতার চিহ্ন তাদের চেহারায় পরিস্ফুট ছিলো। তাদের দেখে আমরা বিস্মিত আবার কিছুটা আনন্দিতও হয়েছি যে, আরবে দীর্ঘ দিন অবস্থান করেও তারা

www.pathagar.com

নিজেদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক ছাড়েনি। কেবল আরবেই নয়, যেখানেই এরা বাস করে, নিজেদের ঐতিহ্যবাহী লেবাস পরিবর্তন করে না। বহুরূপীদের মতো এরা স্থানে স্থানে পোশাক পরিবর্তন করে না। এদের মধ্যে সুদৃঢ় জাতীয় চরিত্র বর্তমান রয়েছে- এটা তারই প্রমাণ। দেশকে পুনরায় আজাদ করে আবার সেখানে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করার উদ্দীপনা এখনও তাদের অন্তরে আলোড়ন তুলছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের উদ্দীপনা অটুট রাখুন আর বিশ্ববাসীকে তাদের সমস্যা বুঝবার তাওফীক দিন।

তায়েফের আবহাওয়া

মক্কা মুয়ায্যামার তুলনায় তায়েফে বেশ শীত পড়লেও যতোটা আমরা ধারণা করেছিলাম, অতোটা নয়। তায়েফের শীত সম্পর্কে অনেকেই আমাদের ভয় দেখিয়েছিলেন। ডিসেম্বর মাসে সেখানে এতোটা ঠাণ্ডা ছিলো, আমাদের লাহোরে নভেম্বরের মধ্যভাগে যতোটা ঠাণ্ডা অনুভূত হয়।

তায়েফের নিদর্শন

পরদিন ৫ ডিসেম্বর। আমাদের গোটা দিনটিই কেটে যায় স্থানীয় নিদর্শন দেখার কাজে। সকাল নয়টার দিকেই তুর্কী বন্ধু আহমদজান তার গাড়ি নিয়ে আমাদের বাসায় উপস্থিত। আমরা প্রথমে যে রাস্তাটি দেখতে যাই, সে সম্পর্কে বলা হয় যে, হিজরতের আগে নবী (স.) বনু সাকীফের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করার জন্য এ রাস্তা দিয়ে তায়েফ এসেছিলেন। এ রাস্তাটি তায়েফ থেকে তিনটি উপত্যকা- হাদ্দা, কাব্‌রা এবং শাদ্দা অতিক্রম করে আরাফাত হয়ে মক্কা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। কয়েক বছর থেকে রাস্তাটি পাকা করার কাজ চলছে। তায়েফ এবং মক্কা মুয়ায্যামার প্রায় মধ্যস্থানে কাব্‌রা একটা অতি উঁচু পাহাড়। এ পাহাড় কেটে রাস্তা নির্মাণের কাজ চলছে। যেখানে পাহাড় কাটা হচ্ছে আমরা সেখান পর্যন্ত গিয়েছিলাম। কাব্‌রা থেকে মক্কা পর্যন্ত প্রায় সমতল ভূমি। পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে শাদ্দা এবং আরাফাত হয়ে মক্কা সড়ক বেশ নিচু দেখাচ্ছিল। তখন ধারণা ছিলো, ৬/৭ মাসের মধ্যে এর নির্মাণ কাজ শেষ হবে। কিন্তু পরে ১৯৬২ সালের দিকে এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়। এ রাস্তার নির্মাণ কাজ শেষ করার পর মক্কা এবং তায়েফের দূরত্ব কমে দাঁড়িয়েছে ৬৫ কিলোমিটার। আগে এর দূরত্ব ছিলো ১২০ কিলোমিটার। রাস্তাটি চালু হওয়ার পর তায়েফের গুরুত্বও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। মক্কা এবং জেদ্দার সাথে তার সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। নাজদ ওমমান এবং মাসকট থেকে মক্কাগামীদের জন্যও এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। তায়েফ থেকে রিয়াদগামী রাস্তাটিও পাকা করা সরকারের ইচ্ছা। মক্কা থেকে কাব্‌রা হয়েই নবী (স.) তায়েফ পৌঁছেছিলেন। মক্কা থেকে কাব্‌রা হয়ে পায়ে হেঁটে বা উটে করে তায়েফ যাওয়ার পথ এখনও আছে। সম্ভবত এ রাস্তাটি আরববাসীদের শাসনামলে নির্মিত।

www.pathagar.com

কাব্‌রার পথে একটি উপত্যকা পড়ে। একে বলা হয় ওয়াদিয়ে মাহরাম। এই নামকরণের কারণ এই যে, তায়েফ বিজয়ের পর মক্কা ফেরার পথে নবী (স.) এখানে থেকে ওমরার জন্য এহরাম বেঁধেছিলেন। হুসাইন হায়কল তাঁর সফরনামা 'ফী মানযি লিল অহী'- অহী নাযিলের দেশে- গ্রন্থে এটাকেই বলেছেন কারনল মানাযিল। জানিনা, এটা কতোটুকু ঠিক। বর্তমানে এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। একটা ক্ষুদ্র গ্রামও আছে এখানে। ওয়াদিয়ে মাহরামের পর আরও একটি ওয়াদী পড়ে। এটাকে বলা হয় ওয়াদিয়ে হাদ্দা। এটা অত্যন্ত শস্য-শ্যামল উপত্যকা, এখানে বাড়ি ঘর আছে এবং চাষবাসও হয়। ফেরার পথে কিছুক্ষণের জন্য আমরা এখানে অবস্থান করি এবং একটা মাদ্রাসায় গিয়ে পানি পান করি। ওয়াদিয়ে সামইয়া এবং শারায়ে' হয়ে এখান থেকেও একটা রাস্তা মক্কা চলে গেছে। এই পথ ধরেই নবী (স.) প্রথমবার তায়েফের বনু সাকীফ গোত্রের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করতে আসেন। তায়েফের গোত্রপতিরা শুধু তাঁর দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যানই করেনি, বরং তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে আহতও করেছিল। পায়ে হেঁটে বা উটের পিঠে আরোহণ করে এ পথ দিয়েও যাতায়াত করা যায়।

আমরা দুপুরের দিকে কাব্‌রা থেকে তায়েফ ফেরার পথে মাস্‌নাত যাই। বর্তমান তায়েফ থেকে আড়াই/তিন মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এটা একটা ছোট জনপদ। এ জনপদকে তায়েফের অংশ মনে করা হয়। এ জনপদ যেখানে গড়ে উঠেছে, তার আশেপাশেই ছিলো মহানবীর (স.) সময়ের মূল তায়েফ। তাই আমাদের আগ্রহের নিদর্শন এখানেই। এখানে পৌঁছে আমরা একটা বিশেষ ব্যাপার লক্ষ্য করি। এখানে বেশ বড়সড় জনপদ, বাগ-বাগিচা এবং রাস্তাঘাট থাকলেও কোনো লোকজন দেখতে পাইনি যেন গোটা জনপদই ছিলো এক নিঝুমপুরী। এটা কেবল আমরাই লক্ষ্য করিনি, হুসাইন হায়কল তাঁর সফর নামায়ও উল্লেখ করেছেন। তিনিও বলেছেন যে, গোটা জনপদই যেন উজাড়, জনশূন্য, যেন খাঁ খাঁ করছে। এটা কি শেষ নবীর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করা এবং তার উপর নির্যাতন চালানোর পরিণতি নয়?

এখানে দু'টি বাগানে দু'টি ছোট ছোট মসজিদ আছে। একটাকে বলা হয় মসজিদে আলী, অপরটাকে বলা হয় মসজিদে হাবশী। মসজিদ দু'টি সম্পূর্ণ অনাবাদী। একটা বাগানের গেটের কাছে নির্মিত মসজিদে আলীর দরজা খুলে দেখি। মনে হলো, বহুদিন থেকে কেউ এর দরজাও খুলেনি, ঝাড় ও দেয়নি। আযান আর নামাযেরতো প্রশ্নই উঠে না। মসজিদুল হাবশী একটা বাগানের ভেতর। সে পর্যন্ত যাওয়া সহজ ছিলোনা। বাগানের পাচিলের উপর দাঁড়িয়ে দূর থেকে আমরা তা প্রত্যক্ষ করি।

www.pathagar.com

অবশ্য এ দু'টো মসজিদের একটি নির্মিত হয়েছে- যেখানে নবী (স.) আহত হয়ে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। এখানে উক্‌বা ইবনে রবীআ এবং শাইবা ইবনে রবী'আর খ্রিস্টান গোলাম আদাস (রা.) রাসূলের খেদমতে আঙ্গুর পেশ করেছিলেন। অবশ্য সে স্থান এবং সে মসজিদ কোন্‌টি তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। আমাদের সাথে যারা ছিলেন তারাও কেউ নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেন না। স্থানীয় লোকদের জিজ্ঞেস করেও আমরা নিশ্চিত হতে পারিনি। হোসাইন হায়কল তাঁর গ্রন্থে মসজিদে আদাসের কথা উল্লেখ করেছেন। খুব সম্ভব, মসজিদে আদাস বলে তিনি মসজিদে আলীকে বুঝিয়েছেন। উভয় মসজিদের মধ্যখানে পূর্ব-পশ্চিমে একটা কাঁচা রাস্তা আছে। মধ্যখানের বিস্তীর্ণ ফাঁকা জায়গাকে বলা হয় ওয়াদিয়ে দাজ্জ। হাদীস শরীফে এ উপত্যকায় শিকার করতে নিষেধ করা হয়েছে। কথিত আছে, তায়েফ অবরোধকালে নবী (স.) এখানে সাহাবায়ে কিরামকে একত্র করে তাদের সারিবদ্ধ করেছিলেন।

এরপর আমাদের সাথী মাসানার আর একটি স্থানে নিয়ে যান আমাদেরকে। এখানেও একটা মসজিদ আছে, যাকে বলা হয় মসজিদে কোয়া। এ মসজিদের নিকট পাহাড়ের উপর একখানা বড় পাথর এমনভাবে রাখা হয়েছে, যেন পাথরটি ঝুলছে, মাটি থেকে একহাত মাত্র উপরে। তায়েফের জনগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে যে, নবী (স.) যখন পাহাড়ের পাদদেশে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তখন কাফিররা উপর থেকে পাথরটি ছুঁড়ে মারে তাঁর দিকে। নবী (স.) হাতের ইঙ্গিতে পাথরটিকে থামতে নির্দেশ দিলে তা সেখানেই থেমে যায়। এ চমকপ্রদ কথাটি আমাদের কাছে নিছক কল্পকাহিনী মনে হয়েছে। রাসূলের জীবন চরিতের কোনো নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে এর উল্লেখ নেই।

আসরের নামাযের পর আমরা তায়েফের আর একটি মসজিদ দেখতে যাই। একে বলা হয় মসজিদে ইবনে আব্বাস (রা.)। মসজিদটি বেশ বড় এবং পুরাতন। মসজিদের ডান দিকে একটি হুজরায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কবর রয়েছে। হুজরায় তালা দেয়া, উঁকি মেরে দেখারও কোনো পথ নেই। এ মসজিদের সামনে বর্তমানে আরও একটি বড় মসজিদ নির্মাণ করা হচ্ছে।

মসজিদে ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অবস্থান দেখে স্পষ্টই মনে হয় যে, তায়েফ অবরোধকালে যেখানে মুসলিম বাহিনী অবস্থান নিয়েছিল এবং যুদ্ধ করেছিল, ঠিক সেখানে মসজিদটি নির্মিত। এর ঠিক সামনে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে রয়েছে তায়েফ যুদ্ধে শাহাদাত প্রাপ্ত সাহাবীদের কবর। লোকেরা আমাদের জানায় যে, আগে এসব কবরের নাম ফলক ছিলো, এখন তা মুছে ফেলা হয়েছে।

মসজিদে ইবনে আব্বাসের সামনে একটু পশ্চিম দিকে একটা পুরাতন দুর্গের নিদর্শন রয়েছে। খুব সম্ভব, তায়েফের প্রাচীন দুর্গের স্থানে এ কেল্লাটি নির্মিত

www.pathagar.com

হয়েছিল। কেল্লার ভগ্ন নিদর্শন যদিও বনু সাকিফের প্রাচীন কেল্লার নয়, কিন্তু তাদের প্রাচীন কেল্লার স্থানেই এ দুর্গটি নির্মিত হয়েছিল বলা যায়। কারণ, এর নিকটেই রয়েছে নবী (স.)-এর তাঁবু স্থাপন, মুসলিম বাহিনীর অবস্থান এবং শহীদদের কবর।

মসজিদে ইবনে আব্বাসের কাছে রাস্তার উপর একটা বড় পাথর খণ্ড রাখা হয়েছে। এ পাথর সম্পর্কে তায়েফের জনগণের মধ্যে একথাটি মশহুর যে, এটা 'লাত' মূর্তির খণ্ডিত অংশ। তায়েফের বনু সাকীফা এ লাত মূর্তির পূজা করতো। হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.) এ মূর্তিটি ভেঙ্গেছিলেন, কিন্তু পাথর খণ্ডটি যে 'লাত' মূর্তির খণ্ডিত অংশ, তার কোনো প্রমাণ নেই।

মসজিদে ইবনে আব্বাস, শহীদদের কবর এবং তায়েফ দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখে আমরা আর একটি মসজিদে যাই। বাজারের ভেতরে অবস্থিত এ মসজিদটি বেশ বড় এবং প্রাচীন। এ মসজিদকে বলা হয় মসজিদুল হাদী। কথিত আছে যে, নবী (স.) এ মসজিদে সাহাবায়ে কিরামকে উদ্দেশ্য করে ওয়াজ করেন। তাই পরবর্তীকালে এ স্থানে নির্মিত মসজিদকে মসজিদুল হাদী বলা হয়। আমরা এ মসজিদে মাগরিবের নামায আদায় করি।

তুর্কী বন্ধুদের দাওয়াত

রাতে এশার পর তুর্কী বন্ধুরা আমাদের দাওয়াত করেন। এতে তুর্কী আলিম এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। এ সুযোগে তাদের সাথে বসে তাদের কথা শুনার সুযোগ হয়েছে আমাদের। এরা অত্যন্ত কষ্টকর এবং অসহায় অবস্থায় আছে। তাদের সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে, দীর্ঘদিন এরা সৌদি আরবে বাস করলেও এখনও তাদেরকে স্বাধীন নাগরিকত্ব দেয়া হয়নি। এর ফলে প্রায়ই তাদেরকে নানা দফতরে এবং থানায় ঘুরাঘুরি করতে হয়। অবস্থানের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য প্রতিবছর জনপ্রতি ৪০/৪২ রিয়াল গুণতে হয়। নাগরিকত্ব ছাড়া তারা সেখানে বিয়ে-শাদীও করতে পারেনা। বরং এদের কেউ মারা গেলে সাধারণ কবরস্থানে দাফন করতেও বেশ বেগ পেতে হয়। চীনের তুর্কীস্তানী মুহাজেরদের বাধ্য করা হয় চীনের রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকে পাসপোর্ট নিতে। এরপর স্থানীয় ভিসা নিয়ে তার মেয়াদ বাড়িয়ে বাড়িয়ে তাদের অবস্থান করতে হয়। মুসলিম সরকারের জন্য পাশ্চাত্যের জাতীয়তার এহেন ধারণার অনুকরণ ইসলামী চিন্তাধারার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কাফিরদের জুলুম অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এরা মুসলিম দেশে আশ্রয় খুঁজবে নাতো খুঁজবে কোথায়? আর মুসলিম দেশ যদি তাদের আশ্রয় না দেয় তাহলে ঈমানের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের অর্থইবা কি? তুর্কীস্তানের এসব মুহাজির বর্তমান সময়ের সব মুহাজেরদের চেয়ে বেশি সাহায্য সহানুভূতি পাওয়ার যোগ্য। অন্যদের হিজরতের ভিন্ন কারণ থাকতে পারে। কিন্তু এদের হিজরতের কারণ

www.pathagar.com

হচ্ছে- ইসলাম এদের কাছে সবচেয়ে প্রিয়। কমিউনিস্ট বিপ্লবের পর স্বদেশে বাস করে দীন ও ঈমানের হিফাযত করা সম্ভব ছিলো না বলেই বাধ্য হয়ে তাদের হিজরত করতে হয়েছে। এমতাবস্থায় মুসলিম দেশগুলোতেই তাদের সবচেয়ে বেশি নিরাপত্তা লাভ করার কথা। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়, আফগানিস্তান, ইরান, তুরস্ক, আরব কোথাও এরা ইসলামী ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণ পায়নি।

তুর্কী বন্ধুদের খাবার আরবদের থেকে ভিন্ন এবং প্রায় আমাদের দেশের মতো। এদের ব্যাপারে আরবদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হচ্ছে এই যে, শীত-গ্রীষ্ম কোনো মৌসুমেই এরা পানি পান করে না। পানির পিপাসা হলে এরা চা পান করে, তাও আবার চিনি এবং দুধ ছাড়া। অবশ্য এরা আমাদের জন্য দুধ এবং চিনির ব্যবস্থা করেছিল।

তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তন

পরদিন ৬ নভেম্বর সকাল ১০টার দিকে আমরা তায়েফ থেকে মক্কা মুয়ায্যামা রওয়ানা হই। আমাদের বিদায় অভ্যর্থনা জানাবার জন্য অনেক তুর্কী বন্ধু শহরের বাইরে আসেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে বিদায় জানান। তাদের ভালবাসা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং অতিথিপরায়ণতা কখনো ভুলবার নয়।

ওকায

তায়েফ থেকে ফেরার পথে তায়েফের বিমান বন্দর -এর নিকট ডান দিকে একটা উন্মুক্ত উপত্যকা চোখে পড়ে। অধিকাংশ গবেষকদের মতে এখানেই ওকাযের মেলা বসতো। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, এ মেলা বসতো শাইলুল কাবীরে আবার কারো কারো মতে অন্য কোথাও।

হোনাইন

সাইলুল কাবীর পৌঁছে আমরা ওমরার জন্য এহরাম বাঁধি এবং সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সামনে অগ্রসর হই। তায়েফ যাওয়ার সময় আমাদের ড্রাইভার ছিলো একেবারেই মূর্খ। তাই সে পথে আমাদের কিছুই বলতে পারেনি। আসার পথে যে ড্রাইভার পেয়েছি, সে কিছুটা লেখা-পড়া জানে। যাইমা এবং শারায়ের মাঝখানে রাস্তার ডান দিকে একটা খোলা ময়দান সম্পর্কে সে আমাদেরকে জানায় যে, এখানেই হোনাইনের যুদ্ধ হয়েছিল। আমরা গাড়ি থেকে নেমে এ স্থানের কয়েকটি ছবি নেই। দু:খের বিষয় এখানেও কোনো চিহ্ন নেই। #

www.pathagar.com

৯

মক্কা মুয়ায্যমায় দ্বিতীয়বার

৬-৮ ডিসেম্বর ১৯৫৯

যোহরের পর আমরা মক্কা মুয়ায্যামায় পৌঁছি। বাসায় জিনিসপত্র রেখে ওমরা করার জন্য বের হই। এক দেড় ঘণ্টা পর আবার ঘরে ফিরি।

হোদায়বিয়া

৭ই ডিসেম্বর আসরের পর শেখ সুলায়মান আসসানী, এবং শেখ আকীল আত্তাসকে নিয়ে আমরা হোদায়বিয়া মসজিদ দেখার জন্য বের হই। আগেই উল্লেখ করেছি, মক্কা এবং জেদ্দার মধ্যস্থলে একেবারে রাস্তার পাশে এ মসজিদটি। মক্কা থেকে এর দূরত্ব ২২ কিলোমিটার। হোদায়বিয়া সন্ধির সময় সাহাবায়ে কিরামের বাহিনী যেখানে অবস্থান করেছিলেন ঠিক সে স্থানে এ মসজিদটি নির্মিত। আমরা এর যে ইমারতটি দেখেছি, তা ১২৫৫ হিজরী সালে নির্মিত।* মসজিদের ভিতরে মেহরাবের কাছে ফলকে লেখা ছিলো ঃ

সাদা ফলক

১. বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। কুল্লামা দাখালা আলাইহা যাকরিয়্যা (কুরআন শরীফের একটি আয়াতাংশ)।

কালো ফলক

২. বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এ হচ্ছে মসজিদে রিদওয়ান। অনুগ্রহশীল আল্লাহর বন্ধুর নিদর্শন সমূহের অন্যতম। এটি নির্মাণ করেছে দয়াময় মেহেরবানের দয়ার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী সুলতান মুহাম্মদ খান। আল্লাহ তাঁকে মাফ করুন। ১২৫৫ হিঃ

সাদা ফলক

৩. নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা বাইয়াত করছিল তোমার হাতে....."। এ মসজিদটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে হিজরী ১৩৬১ হিজরি সালে।

---

* ১৩৬০ হিজরীতে এটা মেরামত করা হয়। সরকার ১৯৫১ সালে পুরাতন ইমারতটি ভেঙ্গে সেখানে নতুন সুরম্য ইমারত তৈরি করেন।

www.pathagar.com

মহানবী (স.) মক্কা বিজয়কালে এ মসজিদের বাম দিকের রাস্তা দিয়ে মক্কা মুয়ায্যামায় প্রবেশ করেন। শস্য-শ্যামল ওয়াদিয়ে ফাতিমা পর্যন্ত রাস্তাটি চলে গেছে। এর প্রাচীন বরং আসল নাম হচ্ছে মাররায যাহরান। মসজিদের নিকটে বাম দিকে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা একটা কবরস্থান আছে শুমাইসী গ্রামের লোকদের। আগেই উল্লেখ করেছি, শুমাইসি হচ্ছে এ গ্রামের নতুন নাম। এর প্রাচীন নাম হুদায়বিয়া। এ মসজিদে মাগরিবের নামায পড়ে আমরা মক্কায় ফিরে আসি।

ওস্তাদ আহমদ আলী ও ওস্তাদ সাঈদ আল-আমুদী

রাতে এশার পর ওস্তাদ আহমদ আলী এবং ওস্তাদ আল আমূদী মাওলানার সাথে সাক্ষাত করতে আসেন। ওস্তাদ আহমদ আলী মক্কা মুয়ায্যামার কুল্লিয়্যাতুশ শারীয়ার মুদীর (শরীয়া কলেজের প্রিন্সিপাল)। সাহিত্য এবং ইতিহাসে তাঁর বিশেষ আকর্ষণ। মক্কা থেকে প্রকাশিত মাসিক 'আল-মিনহাল' এবং মাসিক 'আল-হজ' পত্রিকায় প্রায়ই তাঁর নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাঁর পিতা ছিলেন হিন্দুস্তানের অধিবাসী। পরে মক্কায় হিজরত করেন। ওস্তাদ আহমদ আলীর জন্ম মক্কা মুয়ায্যামায় হলেও পারিবারিক পরিবেশের ফলে ভালো উর্দু জানেন। আরবি-উর্দু উভয় ভাষায় মাওলানার সাথে কথা বলেন। সাম্প্রতিককালে আলে সউদ (সউদ পরিবার) নামে তাঁর একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি এর একটি করে কপি আমাদের উপহার দেন। বেশ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এবং সুস্থ চিন্তার অধিকারী ওস্তাদ সাঈদ আল-আমুদী মাসিক 'আল-হজ' এর সম্পাদক। এ পত্রিকাটিতে হজ সংক্রান্ত নিবন্ধই বেশি প্রকাশিত হয়। এছাড়া সরকারি বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশিত হয়। বর্তমানে এটি একটি উন্নতমানের পত্রিকায় পরিণত হয়েছে। বিশ্বে ইসলামী দাওয়াত ও ইসলামী আন্দোলনের সাফল্যের সম্ভাবনা সম্পর্কে মাওলানা এদের সাথে আলোচনা করেন। আমাদের সাথে মাওলানার যে কয়টি আরবি কিতাব ছিলো, আমরা তাদের সেগুলো উপহার দেই এবং অবশিষ্টগুলো পরে দামেস্ক থেকে পাঠিয়ে দেই।

জেদ্দায় রওয়ানা

যোহরের নামাযের পর বিদায়ী তাওয়াফ (তাওয়াফুল বিদা) সেরে আমরা জেদ্দার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। #

www.pathagar.com

১০

আবার জেদ্দায়

৮-১৩ ডিসেম্বর ১৯৫৯

৮ ডিসেম্বর আসরের পর আমরা জেদ্দা পৌঁছি। অনেক রাত পর্যন্ত পাকিস্তানি এবং আরব বন্ধুরা মাওলানার সাথে দেখা করতে আসেন। এদের মধ্যে শেখ আশমাবী আহমদ সুলায়মানও ছিলেন। শেখ মুস্তফা আলমের মতো ইনিও মূলত মিসরের অধিবাসী। ইখওয়ানের সাথে সম্পর্ক ছিলো। তাই কারাবরণও করেছেন। কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে হজ করার জন্য মক্কা আসেন। আর দেশে ফিরে যাননি। এখন তিনি জেদ্দায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

মিসরীয় দূতাবাস

পরদিন ৯ ডিসেম্বর চৌধুরী গোলাম মুহাম্মদ সাহেব মিসরীয় দূতাবাসে যান। জেদ্দা পৌঁছেই আমি অসুস্থ বোধ করি, তাই তার সাথে যেতে পারিনি। আমাদের প্রথম দফা সাক্ষাতের পর মিসরের রাষ্ট্রদূত আমাদের ব্যাপারে তার সরকারের কাছে যোগাযোগ করেন। মিসরের যোগাযোগ ও পররাষ্ট্র দফতর তাকে জানিয়েছে যে, তাঁরা সানন্দে আমাদের গ্রহণ করবেন এবং সিনাই উপত্যকা সফরে সব রকম সুযোগ সুবিধা দেবেন। আমাদের মিসর পৌঁছার খবর জানাবার জন্যও তাকে অনুরোধ করা হয়েছে।

শেখ নাসীফের দাওয়াত

পরদিন ১০ ডিসেম্বর শেখ মুহাম্মদ নাসীফ মাওলানাকে দাওয়াত করেন। শরীর ভালো ছিলোনা বিধায় আমি যেতে পারিনি। মাওলানা এবং চৌধুরী সাহেব যান। সেখানে যাদের সাথে সাক্ষাত হয়, তাদের মধ্যে মুসতাশারুস সাফীরিল মাগরিবীও (মরক্কোর রাষ্ট্রদূতের উপদেষ্টা ছিলেন)। মরক্কোর মাসিক দাওয়াতুল হক পত্রিকায় প্রায়ই মাওলানার নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাই সে দেশের শিক্ষিত সমাজ মাওলানাকে ভালো করে চেনেন। রাষ্ট্রদূতের উপদেষ্টা মাওলানাকে এই পত্রিকার একটা সাম্প্রতিক সংখ্যাও উপহার দেন। এ সংখ্যায়ও মাওলানার নিবন্ধ ছিলো।

জেদ্দা বেতারের সাথে সাক্ষাতকার

আসরের দিকে জেদ্দা বেতারের উর্দু অনুষ্ঠান পরিচালক আবদুল্লাহ আব্বাস নদবী আমাদের বাসায় আসেন। তিনি মাওলানাকে কিছু প্রশ্ন করেন, মাওলানা তার

www.pathagar.com

জবাব দেন। এ প্রশ্নোত্তর টেপ রেকর্ড করা হয় এবং পরদিন জেদ্দা বেতারের উর্দু অনুষ্ঠানে এবং তার পরদিন আরবি অনুষ্ঠানে প্রচারিত হয়। এ প্রশ্নোত্তর পর্বটি ছিলো নিম্নরূপ ঃ

জেদ্দা রেডিও ঃ আমার যতোদূর জানা আছে, জনাব দ্বিতীয়বার হিজায এসেছেন। আমরা আপনাকে খোশ আমদেদ জানাতে আনন্দবোধ করছি। ওমরা ছাড়া সফরের অপরাপর উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করা আপনি সমীচীন মনে করবেন?

মাওলানা ঃ আল্লাহ তা'আলা আমাকে এ পুণ্যভূমিতে দ্বিতীয়বার আসার সুযোগ দিয়েছেন, এজন্য আমি তাঁর কাছে শুকরিয়া আদায় করছি। তিনি এ পুণ্যভূমি বার বার যিয়ারত করার সুযোগ দেন এ দোয়াই করি। ওমরা করার সৌভাগ্য লাভ ছাড়াও আমার এ সফরের উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরআন মজীদে যেসব স্থানের উল্লেখ রয়েছে, বা কুরআন মজিদের নাযিল এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাতের সাথে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে- স্বচক্ষে সেসব স্থান দেখা। এ ব্যাপারে মক্কা মুয়ায্যামা ও তায়েফের পর এখন বদর, মদীনা মুনাওয়ারা, খয়বর, মাদায়েনে সালেহ, তবুক এবং মাদইয়ান দেখার আশা রাখি।

অত:পর জর্দানে বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক স্থান দেখে দামেশক যাবো। সেখান থেকে মিশর ও সিনাই যাওয়ার আশা রাখি।

জেদ্দা রেডিও ঃ জামায়াতে ইসলামী দীনের যে খেদমত করেছে এবং করছে,পাক ভারতের লোকেরা সে সম্পর্কে অনেকাংশে অবহিত আছেন। তাই জানা দরকার, বর্তমানে আপনারা যে পরিস্থিতি অতিক্রম করছেন, জামায়াত তাতে দীনী খেদমতের জন্য কি উপায় অবলম্বন করছে?

মাওলানা ঃ বর্তমানে পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামী নিষিদ্ধ রয়েছে।* দীনের প্রচার ও প্রসারের জন্য ব্যক্তিগতভাবে যা কিছু করা সম্ভব, আমি করছি। এমনিভাবে যারা জামায়াতে ইসলামীর সাথে সংশ্লিষ্ট, আমি আশা করি, তারাও ব্যক্তিগত পর্যায়ে দাওয়াত ইলাল্লাহ, আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার- আল্লাহর দিকে আহ্বান, ভালো কাজের নির্দেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ এর চেষ্টায় নিয়োজিত থাকবেন। কারণ, জামায়াত বর্তমান থাকুক আর না থাকুক, একজন মুমিন-মুসলিম হিসেবে আমাদের উপর আল্লাহর দীনের যে হক ন্যস্ত রয়েছে, তা কোনো অবস্থায়ই বাদ যেতে পারে না।

জেদ্দা রেডিও ঃ আরব বা অন্যান্য দেশে উপমহাদেশের যেসব লোক সাময়িকভাবে বসবাস করছে, তাদের জন্য আপনার পরামর্শ কি? অর্থাৎ নিজেদের জীবনকে ইসলামের ধাঁচে গড়ে তোলার জন্য তারা কি করবে?

---

* স্মরণ রাখা ভালো যে, এ সাক্ষাতকার গৃহীত হয় ১৯৫৯ সালের শেষের দিকে, যখন পাকিস্তানে সামরিক শাসন বলবৎ ছিলো। –সম্পাদক

www.pathagar.com

মাওলানা ঃ হিন্দুস্তান এবং পাকিস্তানের যেসব লোক আরব দেশে অবস্থান করছে তাদের প্রতি আমার পরামর্শ হচ্ছে- প্রথমত আরব দেশে অবস্থানের এ দুর্লভ সুযোগের সদ্ব্যবহার করবেন তাঁরা। দ্বিতীয়ত কুরআন, সুন্নাহ এবং ইসলামের ইতিহাস অধ্যয়নের জন্য তারা একটা সময় নির্দিষ্ট করে নেবেন। তৃতীয়ত আমাদের উপমহাদেশের তুলনায় আরব দেশে পাশ্চাত্য সভ্যতার যে তীব্র সয়লাব দেখা দিয়েছে তা থেকে বাঁচার জন্য তারা সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন। চতুর্থত, তারা কঠোরভাবে ইসলামের বিধি-বিধান মেনে চলবেন এবং নিজেদের জন্য আজকের মূল আরবকে নয়, বরং মুহাম্মদ আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবায়ে কিরামকে নিজেদের জীবনের জন্য আদর্শ মনে করবেন।

জেদ্দা রেডিও ঃ আরব জাতীয়তাবাদ ছাড়াও আরব জাতীয়তাবাদী নেতাদের মনে ইসলামী সংহতির ধারণা বর্তমান রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে মুক্তির জন্য নিছক একটা সাময়িক মাধ্যম হিসেবে এ আন্দোলনকে তীব্র করা হচ্ছে। উপরন্তু আরবরা বর্তমানে যে পরিস্থিতিতে নিমজ্জিত, তাতে তারা মনে করেন ইসলামী ঐক্য আন্দোলন তাদের জন্য ক্ষতিকর হবে। এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আপনি কি আপনার অভিমত আমাদের অবহিত করবেন?

মাওলানা ঃ আরব জাতীয়তাবাদ এবং এমনি অন্যান্য ভৌগলিক জাতীয়তাবাদ সত্যি সত্যিই ইসলামী সংহতির ধারণার পথে প্রথম পর্যায় হতে পারে- আমি এখন পর্যন্ত এটা বুঝতে অক্ষম। বরং আমার ভীষণ আশংকা হচ্ছে, আমরা যদি আরব আর অনারব, তুর্কী আর অতুর্কী পাকিস্তানি আর অ-পাকিস্তানি ইত্যাদি পার্থক্যকে লালন করতে থাকি, তাহলে এমন এক সময় আসবে, যখন মুসলিম মিল্লাতের বিশ্বজনীন ঐক্যের স্বপ্ন দেখাও আমাদের জন্য কঠিন হবে। এমনিভাবে আমি এটাও বুঝতে পারি না যে, প্রাচ্য বা প্রতীচ্যের সাম্রাজ্যবাদ থেকে মুক্তির জন্য এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভৌগলিক জাতীয়তাবাদ কিভাবে আমাদের জন্য সহায়ক হতে পারে। বিশ্বে সামগ্রিকভাবে মুসলমানের সংখ্যা ৫০ কোটির কম নয়*, অসংখ্য উপায়-উপকরণসহ বিশ্বের বিশাল এলাকা তাদের অধিকারে আছে। তাছাড়াও বিশ্বের এমন কোনো অঞ্চল নেই, যেখানে মুসলমান নেই। মুসলমান হিসেবে আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হই তাহলে বিশ্বের কোনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমাদের গুরুত্ব অনুধাবন না করে পারবে না। যে কোনো শক্তির জন্য আমাদের শত্রুতা মিত্রতা হবে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সকলে সম্মিলিতভাবে যে কোনো সাম্রাজ্যবাদের মোকাবিলা করতে পারবো অধিক শক্তি নিয়ে। কিন্তু আমরা যদি ভাষা, দেশ এবং বংশ-জাতির ভিত্তিতে স্বতন্ত্র শিবিরে বিভক্ত হই তাহলে বরং আমাদের শিবিরই হবে দুর্বল। আমাদের কারুরই এতোটা শক্তি থাকবেনা, যাতে কোনো

* এটা ১৯৫৯ সালের কথা– সম্পাদক

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমাদের ভয় করবে বা অন্য কোনো শক্তি আমাদের শত্রুতা-মিত্রতার গুরুত্ব অনুধাবন করবে।

শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য

প্রশ্ন ঃ সাধারণ শ্রোতাদের জন্য কোনো পয়গাম দেয়া আপনি কি পছন্দ করবেন?

উত্তর ঃ খুব সম্ভব এখন আমার সব শ্রোতাই মুসলমান। তাদের প্রতি আমার পয়গাম হলো- মুসলমান হিসেবে তাদের উপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে, তারা তা অনুধাবন এবং পালন করবেন। আমরা মুসলমান, আল্লাহ এবং তাঁর দীনকে বিশ্বাস করি-কেবল এটুকু বলেই আপনারা রেহাই পাবেন না। বরং আপনারা যখন আল্লাহ্‌কে নিজেদের আল্লাহ্ এবং তাঁর দীনকে নিজেদের দীন বলে স্বীকার করে নিয়েছেন, তখন আপনাদের উপর কিছু দায়িত্বও ন্যস্ত হয়। আপনাদের মধ্যে তার অনুভূতি জাগা দরকার। আর তা পালন করার জন্য আপনাদের চিন্তা করা দরকার। আপনারা যদি তা পালন না করেন তাহলে দুনিয়াতেও মুক্তি পাবেন না, আখিরাতেও নাজাত পাবেন না। কি সে দায়িত্ব? তা কেবল এটুকুই নয় যে, আপনারা আল্লাহ্, তাঁর ফিরিশতা, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল এবং শেষ দিনের প্রতি ঈমান আনবেন। তা শুধু এটুকুই নয় যে, আপনারা নামায পড়বেন, রোযা রাখবেন, হজ করবেন আর যাকাত দিবেন। তা শুধু এটুকুও নয় যে, আপনারা বিবাহ, তালাক এবং উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে ইসলামের নির্ধারিত নীতিমালা মেনে চলবেন। বরং এসবের চেয়েও বড় একটা দায়িত্ব আপনাদের উপর ন্যস্ত হয়েছে। আর তা হচ্ছে যে সত্যের প্রতি আপনারা ঈমান এনেছেন, সারা বিশ্বের সামনে তার সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবেন। মুসলিম নামে একটা স্বতন্ত্র উম্মাহ্ সৃষ্টির যে একক লক্ষ্য কুরআন মজীদে ব্যক্ত হয়েছে, তা হচ্ছে এই যে, আপনারা আল্লাহ্‌র বান্দাহদের সামনে সত্যের সাক্ষ্যের প্রমাণ পূর্ণ করবেন :

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ـ

অর্থ ঃ আর এমনিভাবে আমরা তোমাদের উম্মাতে ওয়াসাত- মধ্যপন্থী উম্মাহ্ বানিয়েছি, যাতে তোমরা মানুষের জন্য (আল্লাহর দ্বীনের) সাক্ষী হও আর রাসূল সাক্ষী হন তোমাদের উপর।"- (সূরা বাকারা- ১৪৩)।

এ হচ্ছে মুসলিম উম্মাহ্ সৃষ্টির আদি লক্ষ্য। আপনারা এ লক্ষ্য পূরণ না করলে আপনাদের জীবনই ব্যর্থ প্রায়। এ হচ্ছে আপনাদের উপর আল্লাহ্‌র ন্যস্ত করা দায়িত্ব-কর্তব্য। কারণ, তাঁর নির্দেশ হচ্ছে ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ـ

www.pathagar.com

অর্থ ঃ "হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর জন্যে সত্যের যথার্থ সাক্ষী হও।" (নিসা ঃ ১৩৫)।

কেবল এ নির্দেশই নয়, বরং আরও বড় নির্দেশও রয়েছে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ ـ

অর্থ ঃ "যার কাছে আল্লাহর তরফ থেকে প্রমাণ রয়েছে আর সে তা গোপন করে, তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে?" (সূরা বাকারা- ১৪০)।

এ দায়িত্ব পালনের ফলাফল কি, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আপনাদের তা'ও বলে দিয়েছেন। আপনাদের পূর্বে এ সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছিল ইহুদীদের। কিন্তু তারা সত্য কিছুটা গোপন করেছে আর কিছু সত্যের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে। সব মিলিয়ে তারা সত্যের নয়, বরং বাতিলের সাক্ষ্য হয়েছিল। পরিণতি হয়েছে এই যে, আল্লাহ তাদের তিরস্কার করলেন এবং তাদের উপর এমন অভিসম্পাত ছিলো যে :

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوْا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ـ

অর্থ ঃ "অপমান, লাঞ্ছনা আর দু:খ কষ্ট তাদের উপর চেপে বসেছিল এবং তারা আটকা পড়েছিল খোদার গযবে।"- (সূরা বাকারা- ৬১)।

এই যে সাক্ষ্যের দায়িত্ব আপনাদের উপর ন্যস্ত হয়েছে, তার অর্থ হচ্ছে এই যে, আপনাদের কাছে যে সত্য এসেছে, আপনাদের কাছে উদ্ভাসিত হয়েছে যে সত্য, মানুষের কল্যাণ ও মুক্তির যে পথ আপনাদের দেখানো হয়েছে, তা যে নির্জলা সত্য ও ন্যায়ের অভিসারী, আপনারা বিশ্বের বুকে তার সাক্ষ্য দেবেন। এমন সাক্ষ্য, যা সত্য ও ন্যায়কে প্রতিভাত করে তুলবে এবং বিশ্ববাসীর সামনে দীনের প্রমাণ পূর্ণ করবে।

এ সাক্ষ্য দু'প্রকারের হতে পারে। এক, মৌখিক সাক্ষ্য, দুই, বাস্তব সাক্ষ্য। মৌখিক সাক্ষ্য হলো, আম্বিয়ায়ে কিরামের মাধ্যমে আমাদের কাছে যে সত্য এসেছে, আমরা মুখে এবং কলমের মাধ্যমে দুনিয়ার সামনে তা স্পষ্ট করে তুলে ধরবো। মানুষকে বুঝাবার এবং তাদের অন্তরে সত্য জাগরুক করার যতো উপায় সম্ভব, সে সব প্রয়োগ করে, প্রচার-প্রসারের সম্ভাব্য সকল উপায় অবলম্বন করে, জ্ঞান-বিজ্ঞান যতো উপাদান সরবরাহ করেছে, তার সবটুকু নিজেদের হাতের মুঠোয় নিয়ে আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য যে দীনকে জীবন বিধান নির্ধারিত করে দিয়েছেন, তার শিক্ষা সম্পর্কে আমরা বিশ্ববাসীকে অবহিত-পরিচিত করবো। চিন্তা-বিশ্বাসে, চরিত্র ও নৈতিকতায়, তমদ্দুন ও সামাজিকতায়, জীবিকা

www.pathagar.com

অর্জন এবং লেন-দেন, আইন-আদালতে, রাজনীতি এবং রাষ্ট্র শাসনে এবং মানুষের আচরণের অন্যান্য সকল দিক এবং বিভাগে এ দীন মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্য যা কিছু উপস্থাপন করেছে, আমরা তা অত্যন্ত স্পষ্ট করে ব্যক্ত করবো। তা যে সত্য, দলীল-প্রমাণ দিয়ে তা সাব্যস্ত করবো , আর যা কিছু তার পরিপন্থী, যুক্তিসংগত সমালোচনার মাধ্যমে ব্যক্ত করবো কি ত্রুটি রয়েছে তাতে। যতোক্ষণ উম্মত সমষ্টিগতভাবে সৃষ্টিকুলের হিদায়াতের জন্য ব্যাকুল হয়ে না পড়ে, যেমনটি হয়েছিলেন আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ব্যক্তিগতভাবে, ততোক্ষণ এ মৌখিক সাক্ষ্যে হক আদায় করা সম্ভব নয়। এ হক আদায় করার জন্য জরুরী হচ্ছে, এ কাজটি আমাদের সকল সামাজিক এবং জাতীয় চেষ্টা-সাধনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হতে হবে। আমরা আমাদের মন-মানসের সকল শক্তি, উপায়-উপকরণের সবটুকু একাজে ব্যয় করবো , আমাদের সকল কর্মকাণ্ডে এ লক্ষ্যের প্রতি অবশ্যই দৃষ্টি রাখতে হবে এবং কোনো অবস্থায়ই আমাদের মধ্য থেকে সত্যের বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠবে- এটা আমরা কিছুতেই বরদাশত করবো না।

বাস্তব সাক্ষ্যের অর্থ হচ্ছে, যেসব মূলনীতিকে আমরা সত্য বলে থাকি, আমাদের জীবনে তা কার্যত প্রকাশ করবো। দুনিয়া কেবল আমাদের মুখেই এসবের সত্যতার আলোচনা শুনাবে না, বরং আপন চোখে আমাদের জীবনে তার সৌন্দর্য ও মহিমা প্রত্যক্ষ করবে। ঈমানের মিষ্টতার ফলে মানুষের চরিত্র এবং আচার-আচরণে যে মিষ্টভাব সৃষ্টি হয়, তারা আমাদের আচার-আচরণে সে মিষ্টির স্বাধ আস্বাদন করবে। তারা নিজেরাই দেখে নেবে যে, এ জীবন বিধানের কল্যাণে কেমন মানুষ সৃষ্টি হয়? গড়ে উঠে কেমন ন্যায়পরায়ণ সমাজ? কেমন সুস্থ সামাজিকতা অস্তিত্ব লাভ করে? কতোটা নির্মল নিষ্কলুষ তমদ্দুন গড়ে উঠে? কেমন সঠিক ধারায় জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং শিল্প-সাহিত্যের লালন হয়? ফুটে ওঠে কেমন ইনসাফপূর্ণ, সহানুভূতিশীল এবং বিরোধমুক্ত সামাজিক সহযোগিতা? কেমন পরিমার্জিত ও পরিশীলিত হয় ব্যক্তিগত এবং ব্যষ্টিগত জীবনের সকল দিক? আর তা কানায় কানায় ভরে ওঠে মঙ্গল ও কল্যাণে। এ সাক্ষ্যের হক আদায় হতে পারে কেবল এভাবে যে, আমরা ব্যক্তিগত এবং জাতীয় পর্যায়ে নিজেদের দীনের সত্যতার মূর্তিমান সাক্ষ্যে পরিণত হবো, আমাদের ব্যক্তিদের চরিত্র এর সত্যতার প্রমাণ বহন করবে, তার খোশবুতে আমাদের ঘর মাতোয়ারা হবে, তার আলোতে ঝলমল করবে আমাদের দোকান-পাট, কল-কারখানা, তার আলোয় আলোকিত হবে আমাদের দফতর এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আমাদের সাহিত্য-সাংবাদিকতা তার সৌন্দর্যের সনদ উপস্থাপন করবে, তার সত্যতার উজ্জ্বল প্রমাণ হবে আমাদের জাতীয় নীতি এবং সামাজিক চেষ্টা-সাধনা। মোটকথা যেখানে যেভাবে কোনো ব্যক্তি বা জাতি আমাদের সংস্পর্শে আসে, আমাদের ব্যক্তিগত এবং জাতীয় চরিত্রে

www.pathagar.com

সে এ কথার প্রমাণ পাবে যে, আমরা যেসব নীতিকে সত্য বলে থাকি, মূলতই তা সত্য, আর সত্যি সত্যিই তার ফলে মানব জীবন সুস্থ-সুন্দর এবং উন্নত হয়।

অতঃপর এটুকুও আরয করবো যে, এসব নীতির ভিত্তিতে একটা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই কেবল এ সাক্ষ্য পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে। আর সে রাষ্ট্র গোটা জীবন বিধানকে বাস্তবে রূপায়িত করে সুবিচার, ন্যায়-নীতি, সংস্কার-সংশোধনমূলক কার্যক্রম, সুব্যবস্থাপনা, শান্তি-নিরাপত্তা, রাষ্ট্রের নাগরিকদের কল্যাণ বিধান, রাষ্ট্রের শাসকবর্গের পূত-পবিত্র জীবনাচার, সুস্থ অভ্যন্তরীণ শাসন কাঠামো, সত্যাশ্রয়ী পররাষ্ট্র নীতি, ভদ্রজনোচিত যুদ্ধ এবং আস্থা ও বিশ্বাসভাজন সন্ধি-চুক্তি ইত্যাদি আচরণ দ্বারা সারা বিশ্বের সামনে একথার সাক্ষ্য দেবে যে, যে জীবন বিধান এ রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে, সত্যি সত্যিই তা মানুষের কল্যাণের নিয়ামক, এ দীনের অনুসরণের মধ্যেই মানব জাতির কল্যাণ নিহিত। এ সাক্ষ্য যখন মৌখিক সাক্ষ্যের সাথে একাকার হয়, তখন পুরোপুরি আদায় হয় মুসলিম উম্মতের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব। মানব জাতির উপর সকল প্রমাণ কেবল তখনই পরিপূর্ণতা লাভ করে আর কেবল তখনই গোটা উম্মত পরকালের আদালতে দাঁড়িয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর এ সাক্ষ্য দেয়ার যোগ্য হতে পারে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে ছিলেন, আমরা তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। এর পরও যারা সত্য-সরল পথের অভিসারী হয়না, তাদের বক্রতার জন্য তারা নিজেরাই দায়ী।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে যে পয়গাম উপস্থাপন করিয়েছেন, সংক্ষেপে সাধারণ শ্রোতাদের জন্য আমার পয়গামও তাই :

تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ـ

অর্থঃ "তোমরা সকলে এসো এমন এক বাণীর দিকে, যা আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে সমান। আর তা হচ্ছে এই যে- আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবোনা, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবো না, আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আমাদের কেউ রব বলে গ্রহণ করবো না।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৬৪)

আমরা সকলে এক খোদার বান্দাহ, এক রাসূলের উম্মত, এক কিতাবে মুবীনের অনুসারী, একই কিবলা আমাদের সকলের কেন্দ্রবিন্দু। আসুন, আমরা সকলে এ

www.pathagar.com

বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হই যে, এ দুনিয়ায় আল্লাহ ছাড়া আর কারো বন্দেগী করবো না, তাঁর আইন ছাড়া অন্য কারো আইন মানবো না এবং আল্লাহর যমীনে আল্লাহর হুকুম ছাড়া অন্য কারো হুকুম চলতে দেবো না। ওয়া আখেরু দা'ওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

জেদ্দার ইসলাম প্রিয় যুবকদের সমাবেশ

জেদ্দায় এমন বেশ কিছু সংখ্যক নওজোয়ান আছে, যারা ইমাম হাসানুল বান্না শহীদ এবং মাওলানা মওদূদীর কিতাব পড়েছে এবং তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত। তারা মাওলানাকে দাওয়াত দিয়ে রেখেছিলেন তাদের সেখানে যাওয়ার জন্য। মাওলানা এশার নামাযের পর তাদের সেখানে যান। আমার স্বাস্থ্য তখনো খারাপ ছিলো, চৌধুরী সাহেবও সেদিন সর্দিতে আক্রান্ত হন। তাই আমরা মাওলানার সাথে যেতে পারিনি। তিনি একাই যান। প্রায় তিন ঘণ্টা পর তিনি ফিরে আসেন। এই বৈঠক সম্পর্কে অন্যান্য অনেক বিষয়ের মধ্যে যে বিশেষ কথাটি মাওলানা আমাদের কাছে ফিরে এসে বলেন, তা হচ্ছে এই যে, সেখানে 'আমর বিল মা'রূফ নাহী আনিল মুনকার' বিভাগের একজন কর্মকর্তাও ছিলেন। তিনি আরব জাতীয়তাবাদ, পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং নৈতিক অবনতি দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ার অভিযোগ করেন। মিসর থেকে একটা সচিত্র সপ্তাহিক পত্রিকা 'আল-মুসাওয়ার' প্রকাশিত হয়। এর লক্ষ্য দু'টি। এক: আরব দেশগুলোতে সরকারি প্রচারণা। দুই: অশ্লীল নিবন্ধ এবং নগ্ন ছবির মাধ্যমে আরব যুবকদের মধ্যে ধর্মহীনতা এবং অশ্লীলতা ছড়ানো। তার উক্তি অনুযায়ী কেবল সৌদি আরবেই মাসে এ পত্রিকা আমদানী হয় ৫০ হাজার কপি। অবস্থা এই যে, কোনো শহরে পত্রিকাটি পৌঁছলে যুবকরা হকারের দোকানে প্রচণ্ড ভীড় জমায়। তারা এ পত্রিকাটির জন্য এতো অস্থির-উন্মুখ হয়ে থাকে যে, অনেকে এজন্য আগাম টাকা জমা দিয়ে রাখে। বরং এজন্য অনেকের নামে তো হকারের দোকানে পোস্ট বক্স ধরনের বক্সও স্থাপন করা হয়েছে, যাতে এ ধরনের অন্যান্য অশ্লীল পত্রিকা তাদের জন্য রিজার্ভ রাখা হয়। তিনি আরও জানান যে, আরব জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে কবি আল-কারবীর প্রশংসাসূচক কবিতা সর্বপ্রথম আল-মুসাওয়েরই প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকাটি প্রথমে সৌদি আরব এলে প্রধান মুফতী শেখ মুহাম্মদ ইব্রাহীমের পক্ষ থেকে সেনা বিভাগের নিকট এ মর্মে নির্দেশ দেয়া হয় যে, ভবিষ্যতে সৌদি আরবে যেনো এ পত্রিকাটির আমদানী নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু সেন্সর বিভাগ থেকে এ বলে নির্দেশটি পালন করতে অস্বীকার করা হয় যে, মজলিসুল ওজারা- ক্যাবিনেটের নির্দেশ ছাড়া এর আমদানী নিষিদ্ধ করা যায় না। কিন্তু আজ পর্যন্ত ক্যাবিনেটের নির্দেশও আসেনি এবং পত্রিকাটির আগমনও নিষিদ্ধ হয়নি। (অবশ্য সৌদি আরবের সাথে মিশরের মন কষাকষির ফলে পরে পত্রিকাটির আগমন নিষিদ্ধ

www.pathagar.com

হয়েছে।) সৌদি আরবে কাদীম জাদীদ তথা নতুন-পুরান অন্য কথায় দীনী এবং লা-দীনী চিন্তাধারার মধ্যে সংঘাত তলে তলে কতো তীব্র হচ্ছে- এ থেকে তা অনুমান করা যেতে পারে।

জেদ্দার জামে মসজিদে মাওলানার আরবি ভাষণ

১১ই ডিসেম্বর ছিলো জুমার দিন। জেদ্দার সবচেয়ে বড় মসজিদে আমরা জুমার নামায আদায় করি। এ মসজিদের খতীব ছিলেন সুদানের আলিম শেখ মাহজুব। শেখ আহমদ সুলায়মান আল-আসমাবীও মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। খোতবার পর মসজিদের খতীব মুসল্লীদের সাথে মাওলানাকে পরিচয় করিয়ে দেন এবং আরবিতে ভাষণ দেয়ার জন্য অনুরোধ জানান। মাওলানা প্রথমে রাজি হতে চাননি, কিন্তু খতীব এবং অন্যান্যদের বারবার অনুরোধে অবশেষে তিনি রাজি হন এবং আরবিতে ভাষণ দেন। আরবরা কথা বলার, ভাষণ দেয়ার ওস্তাদ। যে কোনো আরবকে ধরে বক্তৃতার জন্য দাঁড় করালে তিনি অনর্গল বক্তৃতা করতে পারবেন। নামায শেষে আমরা শেখ সুলায়মান আল-আসমাবীর বাসায় যাই এবং সেখানে দুপুরের খানা খাই। আহার শেষে এডেনের উমর তারমুমের সাথে সাক্ষাত হয়। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে দু'দিন আগে তিনি জেদ্দা এসেছেন। এডেনের খ্যাতনামা আলিম শেখ সালেমের নেতৃত্বে যারা সেখানে ইসলামী আন্দোলন করেন, উমর তারমুমও তাদের একজন। তাঁর সাথে সাক্ষাতের ফলে এডেনের অবস্থা সম্পর্কে জানার সুযোগ হয়।

সৌদী আরবের পরিস্থিতির উপর মাওলানার ভাষণ

জেদ্দায় আনজুমান খোদ্দামে হুজ্জাজ-হাজীদের সেবক সংঘ নামে একটা সমিতি আছে। এ সমিতির অধিকাংশ কর্মীই হিন্দুস্তান বা পাকিস্তানের অধিবাসী। তারা একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন এবং তাতে ভাষণ দেয়ার জন্য মাওলানাকে দাওয়াত দেন। মাওলানা তাদের দাওয়াত মঞ্জুর করেন। মাগরিবের পর অনুষ্ঠানের কাজ শুরু হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে সমিতির সভাপতি জনাব আবদুল গাফফার খান স্বাগত ভাষণ দেন। এরপর মাওলানা প্রায় দীর্ঘ এক ঘণ্টা বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিলো সৌদি আরবে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের দায়িত্ব-কর্তব্য'। বক্তৃতার শুরুতে মাওলানা আরবের পুণ্যভূমি এবং মক্কা মুয়ায্যামার নিকটতম স্থানে নিজ দেশের লোকজনের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগে আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করেন এবং এ পুণ্যভূমিতে বসবাস করার সুযোগ লাভ করার জন্য সমবেত শ্রোতাদের মোবারকবাদ জানান। পাকিস্তান এবং হিন্দুস্তানের প্রায় দেড়শ'র মতো শ্রোতা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মাওলানা তাদের বলেন, আরবের এ পুণ্যভূমি ইসলামের উৎসস্থল এবং সারা দুনিয়ার মুসলমানদের দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু।

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে মাওলানা বলেন, বস্তুত এ পূণ্যভূমিতে ইসলামী সভ্যতার উজ্জ্বল নিদর্শনাদি বর্তমান রয়েছে। দর্শক এখানে আল্লাহর কুদরতের নিশানা দেখতে পারে স্পষ্টভাবে। একটু চিন্তা করে দেখুন, এ দেশটি সারা বিশ্বের ৫০/৬০ কোটি মুসলমানের কেন্দ্রস্থলে কেনো পরিণত হয়েছে।* সারা দুনিয়ার নানা প্রান্ত থেকে কেন প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মুসলমান এখানে এসে সমবেত হয়? কিভাবে এবং কেন পরিস্থিতিতে কা'বা শরীফের সৃষ্টি হয়েছে। হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম স্বদেশভূমি ত্যাগ করে সিরিয়া ফিলিস্তিনের পথে-প্রান্তে নির্বাসনের জীবন যাপন করেন। অতঃপর পরিবারের একাংশকে ফিলিস্তিনে পুনর্বাসন করেন আর অপরাংশকে দিয়ে আবাদ করান মক্কার তরুলতাহীন বিজন প্রান্তর। তখন মক্কার পুণ্যভূমিতে কোনো জনবসতি ছিলোনা। সেখানে তখন বৃষ্টির কোনো চিত্র ছিলো না, ছিলোনা ফসল উৎপাদনের কোনো এলাকাও। আল্লাহর এ ধৈর্যশীল বান্দা তাঁর স্ত্রী-পুত্রকে এ বিজন প্রান্তরে রেখে ফিলিস্তিন ফিরে যান। এরপর আল্লাহর কুদরতে যমযম কূপ সৃষ্টি হয়। এ কূপের চারি দিকে পাখি উড়তে দেখে একটি কাফেলা এখানে এসে বসতি স্থাপন করে। এমনি করে পত্তন হয় এ শহরের। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর পুত্র হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের সহযোগিতায় কা'বা শরীফ নির্মাণ করেন এবং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে সত্যের ঘোষণা দেন এবং এ পুণ্যভূমিকে কেন্দ্র করে সারা দুনিয়ার মুসলমানদের সেখানে আসার দাওয়াত দেন। একটু চিন্তা করে দেখুন, এ নিঃসঙ্গ উপায়-উপকরণহীন মানুষটির ডাকে এমন কি যাদু ছিলো এবং তাঁর পেছনে এমন কি মহান শক্তি ছিলো যে, তখন থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত প্রায় চার হাজার বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও প্রতি বছর হাজার হাজার বরং লক্ষ লক্ষ মানুষ ছুটে আসে তাঁর নির্মিত ঘর যিয়ারত করার জন্য লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েকা বলে।... মূলত হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের মুখে এটা ছিলো আল্লাহরই আওয়াজ- এটা তারই প্রমাণ। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের মুখে আল্লাহ তা'আলা সারা দুনিয়ার কাছে এ আওয়াজ পৌঁছাবার ব্যবস্থা করেন। তিনি কা'বা শরীফকে এমন কেন্দ্রীয় মর্যাদা দান করেন, যা আজ পর্যন্ত তিনি কোনো ঘরকে দান করেননি। অতঃপর হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর রবের হুকুমে এ পুণ্যভূমিকে সম্মানিত শহর ও নিরাপদ নগরীতে পরিণত করেন। এর প্রভাব এই হয়েছে এবং তা এখনও অব্যাহত রয়েছে, যে কেউ এ নগরীতে প্রবেশ করবে, সে সব দিক থেকে নিরাপদ নগরীতে নিরাপদ পরিবেশে আশ্রয় নিয়েছে। ইতিহাস অধ্যয়নে জানতে পারবেন, কেউ তার পিতার হত্যাকারীকেও এখানে পেলে তার কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের কোনো সাহস পর্যন্ত করতো না।

*এটা ১৯৫৯ সালের কথা। তখন বিশ্বে মুসলমানদের সংখ্যা এরকমই ছিলো। -সম্পাদক

www.pathagar.com

অতঃপর এ পুণ্যভূমিতে এমন এক পূত-পবিত্র ব্যক্তির জন্ম হয়, যিনি মাত্র ২৩ বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ে গোটা আরবভূমিকে শান্তি ও ঈমানের উপর সংঘবদ্ধ করেন। এ পুণ্যভূমি আজ আপনারা নিজেদের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন। বিশ্বের কোথাও দু'টি জনপদের মধ্যে এমন দূরত্ব ও অনৈক্যের কার্যকারণ নিহিত নেই, যা রয়েছে আরবভূমিতে। কিন্তু এতোসব সত্ত্বেও একজন মাত্র ব্যক্তি একা ২৩ বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ে সে দেশের সকল অধিবাসীকে এমনভাবে একতাবদ্ধ করেছেন যে, তাদের মধ্যে চিন্তা, ঈমান-বিশ্বাস এবং রাজনীতি- কোনো দিক থেকেই ছিলো না কোনো পার্থক্য। তারা সকলে পরস্পরের ভাইয়ে পরিণত হয়। তারা কেবল নিজেরাই যে ঈমান, চরিত্র এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির সম্পদের অধিকারী হয়েছিল তাই নয়, বরং পরিণত হয়েছিল সারা দুনিয়ার মুক্তিদাতা এবং শিক্ষকে। আর কয়েক বছরের মধ্যেই তারা ছড়িয়ে পড়ে সিন্ধু থেকে মরক্কো এবং স্পেন পর্যন্ত। তিনি নিজের শক্তি বলে এসব করার চেষ্টা করলে তাঁর ডাক এবং দাওয়াত এতো বিরাট সাফল্য কিভাবে অর্জন করতো? নিছক যুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেও আপনারা উপলব্ধি করতে পারবেন যে, এ ছিলো এক আল্লাহ্‌র আহ্বান, আল্লাহ্‌র শক্তিই এর পেছনে কাজ করেছিল। ২৩ বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ে নবী ছাড়া আর কে এতো বড় কাজ করতে পারে? কোনো বড় শক্তিশালী মিথ্যাবাদী ব্যক্তির পক্ষেও এটা সম্ভব ছিলো না যে, সে এক লক্ষ বর্গমাইল এলাকার অধিবাসীদের একটি কেন্দ্রে সংঘবদ্ধ করবে এবং তাদের জীবনে সবকিছু পাল্টে দেবে। তাদের মধ্যে একটা শক্তি সঞ্চার করাও তার পক্ষে সম্ভব ছিলোনা যে, যেসব জাতি তাদের এতটা দুর্বল মনে করতো যে, কোনো রকম পাত্তাই দিতো না, মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে এদের সামনে পশ্চাদগামী হ'তে হয়েছে এবং তারা বাধ্য হয়েছিল এদের শাসন-কর্তৃত্ব মেনে নিতে। মোটকথা, এ পুণ্যভূমি যেখানে আপনারা বসে আছেন- এতে ইসলামের সত্যতার এমন স্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে যে, সামান্য দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিও এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারবেন, যে দীনে তারা ঈমান রাখে, তা কেবলমাত্র পৈত্রিক দীনই নয়, বরং বাস্তবতা এবং বিবেকের বিচারেও একে সত্য দীন বলে স্বীকার করতে এবং তা হিফাযত করতে বাধ্য।

এ ভূমিকার পর মাওলানা বলেন-

আল্লাহর কুদরত এবং ইসলামের সত্যতার এসব নিদর্শন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য আমি আপনাদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি এজন্য যে, আপনারা নিঃসন্দেহে ইসলামের কেন্দ্রভূমিতে এমন এক সময় অবস্থান করছেন, যখন এ কেন্দ্রটি এক অতি ভয়ংকার বিপ্লবের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। এটা মনে করবেন না যে, এখানে কোনো অন্যায় প্রকৃতির বিপ্লব সংঘটিত হলে তা পাকিস্তান, তুরস্ক, ইরাক মিসর বা মরক্কো ইত্যাদি দেশের মতো কোনো মামুলী ধরনের বিপ্লব হবে। ওসব দেশে

www.pathagar.com

কোনো বিপ্লব হলে তা হবে একটা স্থানীয় বিপ্লব, তার ভাল-মন্দ সেসব দেশ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু এখানে যে বিপ্লব হবে, তার প্রভাব পড়বে সারা মুসলিম জাহানের মুসলমানদের উপর। কারণ, এ পুণ্যভূমি সকল মুসলমানের কেন্দ্র, এর সাথে রয়েছে তাদের দীন ও ঈমানের সম্পর্ক। এজন্য কোনো ব্যক্তি দুনিয়ার যে কোনো অঞ্চলেই বাস করুক না কেনো, নিজের দেশের তুলনায় এদেশের জন্যই তার বেশি চিন্তিত হওয়া উচিৎ। এখানে যাতে কোনো ভ্রান্ত এবং মারাত্মক ধরনের বিপ্লব না হতে পারে, সে ব্যাপারে তার অস্থির এবং ব্যাকুল হওয়া উচিৎ। আপনারা যারা এখানে উপস্থিত আছেন, তাদের উপর এ দায়িত্ব ন্যস্ত হয় সবচেয়ে বেশি।

আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এ পুণ্যভূমিতে আল্লাহ তা'আলা হঠাৎ সম্পদের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। আমরা বলে থাকি, আল্লাহ্ তা'আলা অমুক ব্যক্তিকে ছাপ্পর ফেটে দৌলত দিয়েছেন বা আল্লাহ্ তা'আলা মাটি বিদীর্ণ করে সম্পদ দিয়েছেন। এ প্রবাদটি এখানে বাস্তবতার রূপ নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এ বিরাট সম্পদ যেমনি আরবদের জন্য বিরাট নিয়ামত হতে পারে, তেমনি তা হতে পারে তাদের জন্য বিরাট ফিতনারও কারণ। দুঃখের বিষয় এ ফিতনার লক্ষণ আজ স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। আমি সফরকালে স্থানে স্থানে আরব ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছি, পেট্রোলের এ বিপুল সম্পদ আপনাদের জন্য রহমতের কারণ হতে পারে, আবার পারে ক্ষতিরও কারণ হতে। এটা আপনাদের জন্য মারাত্মক ফিতনাও হতে পারে, আবার এ দ্বারা আপনারা বিরাট কল্যাণও লাভ করতে পারেন।

আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে এখানে এমন এক সরকার প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার-ন্যায়ের আদেশ আর অন্যায়ের প্রতিরোধকে এ সরকার তার অন্যতম কর্তব্য বলে মনে করে। আপনাদের এ অঞ্চল ছাড়া দুনিয়ায় কোনো মুসলিম সরকার এমন নেই, যে এ কাজকে নিজের কর্তব্য বলে মনে করে বা এ বিভাগ চালু করার কথাও ভাবতে পারে এবং পুলিশ বাহিনীকে এজন্য যথারীতি ক্ষমতাও দিতে পারে। আমাদের পাকিস্তানও তো ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু এ ধরণের কাজ করার চিন্তা করা এখনও তার ভাগ্যে জুটেনি। এটাও আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ যে, এখানে উল্লেখযোগ্য শরয়ী আইন জারী আছে। এ কাজও দুনিয়ার কোনো দেশে নেই। এখানে এসব সৌন্দর্য দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি।

এ দেশে আসার পর থেকে আমি এখানকার অবস্থা দেখছি এবং এর ভবিষ্যত নিয়ে ভাবছি। এমন অনেক কিছুই দেখছি এবং শুনছি যা থেকে আমি অনুভব করছি যে, এখানে ইসলামী শক্তি দিন দিন দুর্বল হচ্ছে। পূর্ণশক্তিতে এখানে পাশ্চাত্য সভ্যতা বিস্তার লাভ করার চেষ্টা করছে। এটা কখনো বিপদের কারণ

www.pathagar.com

হয়ে দেখা দিতে পারে। ভিতরে ভিতরে এর ভয়ংকর দিক পরিপুষ্ট হচ্ছে এটাও অসম্ভব নয়। এদেশে এমন লোক আছেন, যারা এসব সাম্প্রতিক সমস্যা বুঝেন এবং এর সমাধানও করতে পারেন। এদেশ যাতে এমন কোনো মারাত্মক দিকে মোড় না নিতে পারে, এমন পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করা তাদের কর্তব্য।

যাই হোক, আপনাদের কর্তব্য হচ্ছে একদিকে ইসলামকে অনুধাবন করা আর অপরদিকে এখানকার পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তা করা। দেশের অধিকাংশ নব্য শিক্ষিত তরুণ সমাজ যাতে ইসলামের জন্য নিষ্ঠাবান হতে পারে, মনে-প্রাণে ইসলামে বিশ্বাস করে এবং ইসলামের আলোকে সকল সমস্যার সমাধান করতে চায়- এজন্য আপনাদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করা উচিৎ। আপনারাই ইসলামের এ বিরাট খিদমত করতে পারেন। অর্থাৎ আপনাদের মধ্যে যারা একদিকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে অবহিত এবং অপরদিকে ইসলামকে বিজয়ীর আসনে দেখতে চান, ওলামাদের উপর ভরসা করে আপনারা এ কাজে পিছিয়ে থাকতে পারেন না। তারাতো আজ থেকে তিন চার'শ বছরের পুরাতন পরিবেশে বাস করছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে যুবকদের নেতৃত্ব করা এবং ইসলামের আলোকে দেশের নতুন নতুন সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান উপস্থাপন করা তাদের জন্য বেশ কষ্টকর। অবশ্য সকলে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করলে ইনশাআল্লাহ ওলামাদের পূর্ণ সহযোগিতা অবশ্যই আপনারা লাভ করবেন।

আরব জাতীয়তাবাদ ও পাকিস্তান

পরদিন ১২ ডিসেম্বর আমাদের বিশেষ কোনো প্রোগ্রাম ছিলো না। এ দিন কেবল বন্ধুদের সাথে সাক্ষাত ছিলো। সাক্ষাতের জন্য যারা আসেন, তাদের মধ্যে পাকিস্তানিও ছিলেন, আবার আরবও ছিলেন। আরব যুবকদের সাথে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বিশেষ করে আরব জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে আলোচনা হয়।

ওস্তাদ মুহাম্মদ আহমদ বাসমিল মক্কা মুয়ায্যামায় একজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাধারার অধিকারী সাহিত্যিক। সাম্প্রতিককালে আল-কাওমিয়্যাহ ফিল ইসলাম- ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ- নামে তার একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থে তিনি আরব জাতীয়তাবাদের তীব্র সমালোচনা করেন সম্পূর্ণ ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে। এর ক্ষতিকর দিক এবং মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে তিনি আরব যুবকদের সতর্কও করে দিয়েছেন। শুনেছি বইটি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে গোটা সৌদি আরবে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। ফলে অনেক যুবকই আরব জাতীয়তাবাদ ত্যাগ করছে। ইতিপূর্বে পাঁচ হাজার কপি প্রকাশিত হয়। বর্তমান সংস্করণে দশ হাজার কপি ছাপা হয়েছে। এ গ্রন্থে ওস্তাদ বাশমিল মাওলানার নাম উল্লেখ না করে আরব জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে এক আরব যুবকের সাথে মাওলানার কথোপকথনের উল্লেখ করেছেন। আরব জাতীয়তাবাদে প্রভাবিত ছাত্রটি

www.pathagar.com

মাওলানাকে প্রশ্ন করে- আপনারা পাকিস্তানিরা আরবদের জাতীয় সমস্যার ব্যাপারে কি কিছু করেছেন? মাওলানা জবাবে বলেন- আমরা আরব ভাইদের সমস্যার ক্ষেত্রে সর্বদা তাদের সহায়তা করেছি এবং ভবিষ্যতেও আমরা তাদের সমর্থন জানাবো। কিন্তু আমাদের এ সমর্থনের ভিত্তি আপনাদের আরব জাতীয়তাবাদের শ্লোগান নয়। এ সমর্থনের ভিত্তি হচ্ছে আমাদের এবং আপনাদের মধ্যকার দীনি সম্পর্ক, যা আল্লাহ তা'আলা স্থাপন করেছেন। আপনারা এ দীনি সম্পর্ক শেষ করার চেষ্টা করছেন আর এতদসত্ত্বেও আমরা এখনও তা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছি। ভবিষ্যতেও আমরা এ চেষ্টা করে যাবো ইনশাআল্লাহ। অস্তিত্ব লাভের পর থেকে পাকিস্তান কেবল ফিলিস্তিন আর আলজেরিয়ার ব্যাপারেই নয়, বরং আরব দেশের অন্যান্য সকল সমস্যার ব্যাপারেও তাদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আসছে।

জেদ্দা থেকে মদীনা মুনাওয়ারা

১২ ডিসেম্বর সকাল সোয়া আটটায় আমরা জেদ্দা থেকে মদীনা মুনাওয়ারার পথে রওয়ানা হই। আমরা ছিলাম তিনজন, কিন্তু সামান বেশি থাকার কারণে সাত আসনের ট্যাক্সী নিতে হয়। এছাড়া ভাড়া দিতে হয়েছে ১২৫ রিয়াল।

জেদ্দা থেকে মদীনা মুনাওয়ারার দূরত্ব ৪৩৫ কিলোমিটার। নব নির্মিত চমৎকার সড়ক পথ। এর রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের দিকে সর্বদা নজর রাখা হয়। রাস্তায় প্রথমেই আমাদের সামনে পড়ে ওয়াহবান জনপদ। এরপর তাওয়াল এবং কাদমিয়া জনপদ। মোটর গাড়ি চালু হওয়ার আগে মানুষ যখন পায়ে হেঁটে বা উটের পিঠে চড়ে মদিনা মুনাওয়ারায় যাতায়াত করতো, তখন তারা জেদ্দা হয়ে যাতায়াত করতো না। বরং কাদমিয়া পৌঁছে পূর্ব দিকে মোড় নিতো। এরপর উসফান এবং শুমাইসী (হোদায়বিয়া) অথবা উসফান এবং ওয়াদিয়া ফাতিমা (মারবায্ যাহরান) হয়ে মদিনা মুনাওয়ারা পৌঁছতো। উটের পিঠে চড়ে মানুষ হয়তো এ পথে এখনও যাতায়াত করে, কিন্তু এ পথে মোটর গাড়ি চলে না।

এরপর জুহফা হয়ে আমরা রাবেগ পৌঁছি। এটা লোহিত সাগরের তীরে একটা ছোট বন্দর। মিসর এবং সিরিয়া থেকে আগত হাজীরা এখানেই এহরাম বাঁধে। ১৬০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করার পর আমরা মাস্তুরা পৌঁছি। জেদ্দা থেকে মাসতুরার দূরত্ব ১৭১ কিলোমিটার। আমরা লোহিত সাগরের তীর ঘেঁষে চলছিলাম। কিন্তু এরপর রাস্তা ডান দিকে অর্থাৎ পূর্ব দিকে মোড় নিয়েছে। আরও প্রায় ৮০ কিলোমিটার চলার পর আমরা মাফরাফ পৌঁছি। এখানে রাস্তা দু'ভাগে ভাগ হয়ে একটা মদীনা চলে গেছে, আর একটা ইয়াম্বু। এটা লোহিত সাগরের তীরে আর একটা ছোট বন্দর। মিসর-সিরিয়ার যেসব হাজী হজ্জের আগে মদীনা যেতে চায়, তারা এখানে নামে। মদীনা থেকে মাফরাকের দূরত্ব ১৫৫

www.pathagar.com

কিলোমিটার, আর জেদ্দা থেকে ২৬৯ কিলোমিটার। জেদ্দা থেকে আসার পথে এখান থেকেই শুরু হয় পর্বতমালা। আরও প্রায় ৭ কিলোমিটার পথ চলার পর সাড়ে ১১টার দিকে আমরা বদর পৌঁছি।

বদর

বদরে আমরা প্রায় তিন ঘণ্টা অবস্থান করি। একজন স্থানীয় লোক সাথে নিয়ে আমরা যে স্থানটি দেখতে যাই, সেখানে বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। স্থানটি বদর বা জনপদ থেকে দু'কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত। সেখানে একটি ছোট বেষ্টনীর ভিতরে ১৩ জন বদর শহীদকে দাফন করা হয়েছে। নিকটেই রয়েছে বদর যোদ্ধাদের বর্তমান কবরস্থান। এখানে পৌঁছার জন্য মদীনা থেকে আগত ব্যক্তিদের ডান দিকে আর জেদ্দা থেকে আগতদের বাম দিকে মোড় নিতে হয়।

মাফ্‌রাক থেকে বদরের দূরত্ব ৭ কিলোমিটার। ইয়াম্বু থেকে যে রাস্তাটি এসেছে, তা এখানে এসে মদীনাগামী সড়কের সাথে মিশেছে। আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে সিরিয়া থেকে আগত কাফিরদের কাফিলা এপথে এসে মক্কায় চলে যায়। আর আবু জেহেলের নেতৃত্বে কাফির বাহিনী সামনে অগ্রসর হয়ে এখানে এসে অবস্থান গ্রহণ করে মুসলমানদের পথ রোধ করার জন্য। শহীদদের কবরে বর্তমানে কোনো চিহ্ন নেই। আছে কেবল চারিদিকে ঘেরা দেয়া একটা চৌবাচ্চা। স্থানীয় লোকটির সাহায্যে আমরা আল্-উদওয়াতুল কুসওয়া, আল্-উদওয়াতুদ দুনিয়া এবং বদর যুদ্ধে কাফির ও সাহাবায়ে কিরামের আগমনের দিক নির্ণয়ের চেষ্টা করি।

যোহরের নামায শেষে প্রায় আড়াইটার দিকে আমরা বদর থেকে রওয়ানা হই। আল-ওয়াসিতা, আল-হামরা, মাসীজীদ এবং বীরে আলী হয়ে মাগরিবের আগে আমরা মদীনা পৌঁছি। মদীনা থেকে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত বীরে আলীর প্রাচীন নাম যুলহুলাইফা। বিদায় হজ্জের সময় নবী (স.)-এর সাহাবায়ে কিরাম এখান থেকেই হজ্জের এহরাম বাঁধেন। এখনও এটা মদীনাবাসীদের মীকাত। পথে এমন এলাকাও পড়েছে, যেখানে কাঁচা ঘর এবং বিরান খেজুর বাগান দেখেছি, কিন্তু তাতে লোক-জনের কোনো চিহ্ন নেই। আরবের লোকেরা কতো দ্রুত গ্রাম ছেড়ে শহরে ছুটে যাচ্ছে, এ থেকে তা বুঝা যায়। পেট্রোলের কারণে দেশের কৃষি কাজ কিভাবে দিন দিন ধ্বংস হচ্ছে, তাও বুঝতে কষ্ট হয়না। #

www.pathagar.com

১১

মদীনা মুনাওয়ারায়

১৩-১৯ ডিসেম্বর ১৯৫৯

মদীনা মুনাওয়ারায় আমরা ফান্দাক কাসরুল মদীনায় (মদীনা প্যালেস হোটেল) অবস্থান করি। মসজিদে নববীর নিকট এটি পরিচ্ছন্ন হোটেল। হেরেম শরীফে মাগরিবের নামায পড়ে আমরা সালামের জন্য হাজিরী দেই। এশার পর মাওলানা যান মাওলানা বদরে আলম মিরাঠীর বাসায় দাওয়াতে। কিছুদিন আগে এক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনি আহত হন। বর্তমানে আল্লাহর মেহেরবানীতে সেরে উঠেছেন।

মসজিদে নববী

এবার আমরা মসজিদে নববীকে দেখতে পাই বেশ উন্মুক্ত এবং পরিচ্ছন্ন শহর হিসেবে। ১৯৫৬ সালে হজ্জ শেষে আমরা যখন এখানে আসি, তখন মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ এবং আশ-পাশের বাড়ি-ঘর ভেঙ্গে নতুন সড়ক নির্মাণের কাজ চলছিল। এখন এসব সম্প্রসারণ ও নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এর ফলে মসজিদে নববীর অনেক শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। এর আয়তনও বৃদ্ধি পেয়েছে আগের চেয়ে প্রায় দেড়-দুই গুণ। এর চারিপাশে বেশ খোলা-মেলা জায়গা। যাতায়াতকারীদের সুবিধার্থে অনেক রাস্তাঘাটও নির্মিত হয়েছে। গাড়ি পার্ক করার জন্য মসজিদের পেছনে অর্থাৎ উত্তর দিকে রয়েছে উন্মুক্ত ময়দান। এর ফলে গাড়ির শব্দে মুসল্লিদের কোনো অসুবিধা হয়না। মদীনা মুনাওয়ারায় তিন চারটি হোটেল নির্মিত হয়েছে। এগুলো সম্পূর্ণ নতুন। মক্কা মুয়ায্যামার হোটেলগুলো হেরেম শরীফ থেকে কিছুটা দূরে।

মদীনার আবহাওয়া

জেদ্দা এবং মক্কা মুয়ায্যামার তুলনায় এখানে বেশ ঠাণ্ডা। কিন্তু তাই বলে পাকিস্তানের লাহোরের মতো ঠাণ্ডা নয়। তা সত্ত্বেও রাতে আমাদের গরম পানি দিয়ে ওযু করতে হতো এবং ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘুমাতে হতো।

মদীনার আমীরের সাথে সাক্ষাত

পরদিন ১৪ ডিসেম্বর সকালে আমি এবং চৌধুরী সাহেব মদীনার গভর্নর -এর সাথে দেখা করতে যাই তার দফতরে। শাহী পরিবারের অন্যতম এই সদস্য (শাহজাদা) কার্যত সারা বছর নজদেই থাকেন। এখানে তার ওয়াকীল (সেক্রেটারি) তার পক্ষ থেকে সকল দায়িত্ব পালন করেন। তাই জনসাধারণ

www.pathagar.com

আমীরুল মদীনা বলতে বুঝায় সেক্রেটারি আব্দুল্লাহ আল-সুদাইরীকেই। জনাব সুদাইরী নাজদের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্য। সৌদি রাজপরিবারের সাথে তার পরিবারের আত্মীয়তাও আছে। তাই এ পরিবারের সদস্যরা তবুক, আল ওয়াজাহ্, হায়েল ইত্যাকার নানা স্থানে আমীর বা ওয়াকীলুল আমীরের (গভর্নর বা গভর্নরের সেক্রেটারির) পদে নিয়োজিত আছেন। মদীনায় যে ইমারতে আমীরের দফতর, তা অতি পুরাতন। দফতরের ভবনটির ভাগ্য এখনও প্রসন্ন না হওয়ায় আমরা বিস্মিত হয়েছি। সেক্রেটারি সুদাইরীর সাথে আমাদের দেখা হয়নি। তার বড় ছেলে তার সেক্রেটারি কাজ করেছেন। তার সাথে আমাদের সাক্ষাত হয়েছে। তিনি মাওলানাকে মাগরিবের পর তার পিতার বাসায় দাওয়াত দেন। অতএব মাগরিবের পর আমরা তার বাসায় যাই। খুবই সাদাসিধে কিন্তু সব কিছুর খবর রাখেন তিনি। ইসলামী নিদর্শনগুলো সংরক্ষণে অবহেলা-অমনোযোগিতার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন তিনি। পক্ষান্তরে ইউরোপ-আমেরিকায় যেভাবে প্রাচীন নিদর্শনরাজী সংরক্ষণ করা হয়, সেজন্য ঈর্ষাও প্রকাশ করেন। সফরকালে তিনি আমাদের সব রকম সুযোগ-সুবিধা দানের নিশ্চয়তা দেন। অন্য কোনো রকম সাহায্য-সহযোগিতার দরকার ছিলো না আমাদের। আমাদের আগামী সফর হবে এমন এক এলাকায়, যে সম্পর্কে আমরা আদৌ অবহিত নই এবং নিজেদের তরফ থেকে সেখানে যানবাহনের ব্যবস্থা করাও সম্ভব নয়। তাই এ ব্যাপারে আমরা তার সহযোগিতা চাই। এমন মোটর ড্রাইভারের সাথে আমাদের যোগাযোগ করিয়ে দিতে বলি, যে দৈনিক হিসেবে আমাদের কাছ থেকে ভাড়া নেবে এবং সৌদি আরব ত্যাগ করে জর্দানে প্রবেশ করা পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকবে। আমীর পুলিশ ইন্সপেক্টরের মাধ্যমে এরূপ ড্রাইভার খোঁজ করার কেবল প্রতিশ্রুতিই দেননি, বরং তার নিজের পক্ষ থেকে একজন লোকও আমাদের সাথে দেয়ার ওয়াদাও করেন। তার দেয়া লোকটি আমাদের পথ প্রদর্শকের কাজ করবে এবং জর্দানে প্রবেশ না করা পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকবে। আমরা শুকরিয়া জানিয়ে তার কাছ থেকে বিদায় নেই।

সাক্ষাতের পালা

আসরের পর যায়েন আল-শানকীতী এবং তার পাকিস্তানি বন্ধু হাবীবুর রহমানের সাথে সাক্ষাত হয়। যায়েন সাহেব একজন বিদগ্ধ এবং ইসলামী জযবার নওজোয়ান। মূলত ইনি শানকীতের অধিবাসী। মরক্কোর মূল ভূখণ্ডের নাম শানকীত। সাম্প্রতিককালে ফ্রান্স একে মরক্কো থেকে বিচ্ছিন্ন করে মৌরিতানিয়া নামে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। শিক্ষকতা কাজে গত ১৫ বছর ধরে তিনি সৌদি আরবে বসবাস করছেন এবং এখন সৌদি নাগরিকত্বও গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে তিনি মদীনা মুনাওয়ারা সরকারি এতীমখানা দারুল আইতাম ওয়ালা সানায়ের শিক্ষকতায় নিয়োজিত আছেন। তার সাথে আমাদের প্রথম পরিচয় হয়

www.pathagar.com

১৯৪৯ সালে, যখন তিনি মাওলানা মওদূদীর কিছু গ্রন্থ পাঠ করে জামায়াতে ইসলামীর সদস্যপদের জন্য আবেদন করেন। কিন্তু পাকিস্তানের বাইরে কাউকে রোকন করা যেহেতু জামায়াতের নীতি ছিলোনা। তাই তাকে রোকন সদস্য করা সম্ভব হয়নি, কিন্তু তার সাথে যোগাযোগ অব্যাহত ছিলো। মদীনা মুনাওয়ারায় মাওলানা মওদূদীর গ্রন্থাবলী লোকদের পড়াবার ব্যাপারে তার বিরাট ভূমিকা রয়েছে। তার বন্ধু হাবীবুর রহমান সাহেব বেলুচিস্তানের অধিবাসী। বিগত কয়েক বছর ধরে সৌদি আরব বাস করছেন এবং বর্তমানে সৌদি নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন। ইনিও যায়েন সাহেবের সাথে দারুল আইতামে শিক্ষকতা করছেন।

এদিন আরও যাদের সাথে সাক্ষাত হয়েছে, তাদের মধ্যে তুর্কীস্তানের আলিম শেখ কাসেম আন্দজানীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি একজন তুর্কী মুহাজির। হিজরত করে প্রথমে হিন্দুস্তান আসেন, পরে সেখান থেকে মদীনা মুনাওয়ারা চলে আসেন এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তিনিও বর্তমানে দারুল আইতামে শিক্ষকতা করছেন। তুর্কীস্তানের ইতিহাস বিবৃত করে তিনি আরবি এবং তুর্কী ভাষায় কয়েকটি বইও লিখেছেন, কিন্তু অনুকূল পরিবেশের অভাবে এখনও তা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

এদিন হেরেম শরীফে ইরাকের মশহুর আলিম শেখ আমজাদ যাহাদীর সাথেও দেখা হয়। ইরাকের পরিস্থিতি এবং সেখানে কমিউনিস্টদের যুলুম-নির্যাতন সম্পর্কে অনেক কিছু শুনান তিনি। তার কর্থাবার্তার ধরন থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ইরাকের পরিস্থিতি তার মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। হজ্জ করার জন্য হিজায এসেছিলেন কিন্তু পরে আর দেশে ফিরে যেতে রাজি হননি। আমরা তাকে ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে বলি। পরে তিনি পাকিস্তানেও এসেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে ইরাকে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।

মদীনা মুনাওয়ারার নিদর্শন

মদীনা মুনাওয়ারার সবচেয়ে বড় নিদর্শন হচ্ছে মসজিদে নববী। এছাড়া পাহাড়, গৃহ, মসজিদ এবং কূপ ইত্যাদি অনেক নিদর্শনই রয়েছে। এর মধ্যে কিছু নিদর্শন রয়েছে মদীনার অভ্যন্তরে। এগুলো দেখার জন্য কোনো যানবাহনের দরকার পড়ে না। আর কিছু রয়েছে মদীনার বাইরে কয়েক মাইল দূরে। এগুলো দেখার জন্য বিশেষ আয়োজন দরকার। হাবীবুর রহমান ও অন্যান্যের সাথে আলোচনা করে আমরা ঠিক করি যে, আমরা আগে বাইরের নিদর্শনগুলো দেখে নেবো। ভেতরের নিদর্শনগুলো পরে দেখা যাবে।

ওহোদ

কর্মসূচী অনুযায়ী আমরা ১৫ ডিসেম্বর সকাল ১০ টার দিকে ওহোদ পাহাড় দেখতে যাই। এ পাহাড় সম্পর্কে আল্লাহর নবী বলেছিলেন– "এ পাহাড় আমাদের

www.pathagar.com

ভালোবাসে, আমরাও তাকে ভালোবাসি।" হিজরী তিন সালে এ পাহাড়ের পাদদেশেই প্রসিদ্ধ ওহোদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যাতে মহানবী (স.)-এর দান্দান মোবারক শহীদ হয় এবং অপরাপর সাহাবায়ে কিরাম ছাড়াও হুজুরের চাচা হযরত হামযা (রাঃ) শহীদ হন। মদীনা থেকে উত্তর দিকে এর দূরত্ব তিন চার মাইল। পাহাড়টি পূর্ব থেকে পশ্চিমে তিন-চার মাইল লম্বা। কাছে না গেলে দূর থেকে মনে হয়, এ বুঝি কয়েকটি পাহাড়ের সমষ্টি। ওহোদ পর্যন্ত পৌঁছার আগে ডান দিকে একটা ছোট্ট পাহাড় আছে। যার প্রাচীন নাম জাবালে আইনাইন। বর্তমানে এটি জাবালুর রুমাত নামে প্রসিদ্ধ। মানে তীর নিক্ষেপকারীদের পাহাড়। ওহোদ যুদ্ধের আগে এ পাহাড়ে মহানবী (স.) ৫০ জন তীরন্দাযকে মোতায়েন করে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যুদ্ধে মুসলমানদের জয় হোক বা পরাজয়- কোনো অবস্থায়ই তোমরা স্থান ত্যাগ করবে না। ওহোদ এবং রুমাত পাহাড়ের মধ্যখানে রয়েছে ওয়াদিয়ে কানাত। এখানেই সংগঠিত হয়েছিল ওহোদ যুদ্ধ। মুসলিম বাহিনী অবস্থান নিয়েছিল এ দুটি পাহাড়ের মধ্যখানে আর মক্কার কাফির বাহিনী ওহোদ পাহাড় ঘুরে পশ্চিম দিক থেকে আগমন করে। এ উপত্যকায় জাবালুর রুমাতের কিছু পশ্চিমে একটি চার দেয়ালের মধ্যে ওহোদ যুদ্ধের শহীদের দাফন করা হয়েছে। হযরত হামযা (রা.)-এর লাশ এখন অন্যান্য শহীদদে সাথে একই কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে। আগে তাঁর কবর ছিলো অন্য স্থানে। যেহেতু কবরটি ছিলো উপত্যকার একেবারে মধ্যখানে, এর ফলে বন্যায় তা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল, তাই তুর্কী শাসকরা তাঁর লাশ সেখান থেকে উত্তোলন করে অন্যস্থানে দাফন করে। অবশ্য হযরত হামযা (রা.)-এর প্রথম কবরের উপর গম্বুজটি এখনও বর্তমান আছে। এর অর্ধেক অংশ ভেঙ্গে পড়ে গেছে। তুর্কীদের শাসনামলে হযরত হামযা এবং ওহোদ যুদ্ধের অন্যান্য শহীদের কবরে বেশ নযর নিয়ায পেশ করা হতো এবং মদীনাবাসী বছরে তিন দিন এখানে মেলা বসাতো। কিন্তু সৌদি সরকার এসব বিদ'আত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। এখানে যাতে শরীয়া বিরোধী কোনো কার্যকলাপ না হতে পারে সে জন্য যথারীতি পাহারার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। ওহোদ পাহাড় দেখার জন্য যারা আসে, তাদের কানাত উপত্যকার আগে আর যেতে দেয়া হয়না আমাদের কাছে ক্যামেরা ছিলো, আমরা কবরগুলোর ছবি তুলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পুলিশের লোকজন এসে আমাদের ছবি তুলতে বারণ করে এবং ওহোদ পাহাড়ের দিকেও যেতে দেয়নি। আমরা বলার পর তারা আমাদেরকে উপরস্থ দায়িত্বশীল ব্যক্তির কাছে নিয়ে যায়। আমরা তাকে জানাই যে, বিশুদ্ধ আকীদা বিশ্বাস আমরাও পোষণ করি, তাই আমাদের দ্বারা শরীয়া গর্হিত কোনো কার্য-কলাপের আশংকা অমূলক। আমাদের কথা শুনে তিনি কেবল ছবি তোলার এবং ওহোদ পাহাড়ে যাওয়ার অনুমতিই দেননি, বরং তার কক্ষে নিয়ে গিয়ে চা এবং নাজদী কফি দ্বারা আমাদের মেহমানদারীও করেন।

www.pathagar.com

উপত্যকা অতিক্রম করে ওহোদ পাহাড়ের দিকে যাওয়ার পথে একস্থানে একটা ছোট মসজিদ আছে। কথিত আছে, এখানেই মহানবীর (স.)-এর দান্দান মুবারক শহীদ হয়েছিল। ওহোদ পাহাড়ের ভেতরে প্রায় একশ গজ উঁচুতে একটা ক্ষুদ্র গুহা আছে, যাতে দু'তিন জন লোক বসতে পারে। কথিত আছে যে, দান্দান মুবারক শহীদ হওয়ার পর হুযুর (স.) এখানে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। গুহার প্রবেশ পথ সাদা রঙ্গে রঞ্জিত। তাই দূরে থেকে সহজে চোখে পড়ে। মদীনার নিদর্শন সম্পর্কে কোনো কোনো বইতে লিখিত আছে যে, গুহার অভ্যন্তরে কুফী স্টাইলের লিপিতে কিছু লেখা রয়েছে। আমরা অনুসন্ধান করেও সেখানে কোনো লেখা দেখতে পাইনি। হতে পারে আগে কিছু লেখা ছিলো, এখন মুছে গিয়েছে। এ গুহার নিকটে পাহাড়ের পাদদেশে আর একটা ছোট মসজিদ আছে। কথিত আছে, যুদ্ধ শেষে হুযুর (সঃ) এখানে অবতরণ করে যোহর এবং আসরের নামায পড়েছিলেন।

কুবা পল্লী

মদীনা মুনাওয়ারা ফিরে এসে মসজিদে নববীতে আমরা যোহরের নামায আদায় করি। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আমরা কুবা পল্লী দেখতে যাই। মদীনা থেকে চার মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে কুবা অবস্থিত। মক্কা থেকে মদীনা হিজরতকালে নবী (স.) কুবায় চৌদ্দ দিন অবস্থান করেন। এ সময় তিনি নিজ হাতে কুবা মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। এ মসজিদের নির্মাণ কাজেও তিনি নিজে অংশগ্রহণ করেন। এদিক থেকে মদীনা মুনাওয়ারা পৌঁছে এটি তাঁর নির্মিত প্রথম মসজিদ। এ মসজিদ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَمَسْجِدٌ اُسِسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ -

অর্থ ঃ 'এটি সেই মসজিদ, প্রথম দিন থেকেই যার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল তাকওয়ার উপর' - (সূরা তওবা ঃ ১০৮)।

কুবা এবং কুবাবাসীদের প্রতি হুযুরের (স.) ভালবাসা এতোটা গভীর ছিলো যে, তিনি প্রতি বুধবার পায়ে হেঁটে এখানে আসতেন এবং এ মসজিদে নামায আদায় করতেন।

কয়েক বছর আগেও মদীনা থেকে কুবা যাওয়ার পথটি ছিলো একেবারেই কাঁচা এবং অত্যন্ত কষ্টকর। কিন্তু বর্তমানে সড়কটি পাকা এবং আঁকা-বাঁকা সোজা করা হয়েছে। মদীনা থেকে বেরুলেই কুবার মসজিদটি চোখে পড়ে। আমরা এখানে পৌঁছে আসরের নামায আদায় করি কুবা মসজিদে।

মসজিদুল জুম'আ

কুবার মসজিদে যাওয়ার পথে রাস্তার বাম দিকে আর একটি মসজিদ সামনে পড়ে, যাকে বলা হয়, মসজিদুল জুম'আ। মূলত এটা বনূ সালেম কবীলার মসজিদ। নবী

www.pathagar.com

(স.) হিজরতের সময় যখন কুবা থেকে মদীনা যাচ্ছিলেন, তখন বনূ সালেমের জনপদে পৌঁছলে জুমার নামাযের সময় হয়ে যায়। তাই তিনি সেখানে জুমার নামায আদায় করেন। এ ছিলো মদীনায় হুযুর (স.)-এর প্রথম জুমার নামায। এ কারণে মসজিদটির নাম হয়েছে মসজিদুল জুম'আ। পাকা করা এ মসজিদটি এখন বেশ সুন্দর দেখায়। যদিও এর আশেপাশে তেমন জনপদ নেই।

দারে কুলসুম ও দারে সা'দ

মসজিদে কুবার সাথে লাগোয়া দক্ষিণে অর্থাৎ কিবলার দিকে দু'টি গৃহ নির্মিত আছে। এ গৃহগুলির ছাদ গম্বুজ আকৃতির। ছাদগুলি সাদা রঙ্গে রঞ্জিত। কথিত আছে যে, এ ঘরগুলির একটি নির্মিত হয়েছে সেস্থানে, যেখানে হযরত কুলসুম ইবনে হুদামের ঘর ছিলো। আর অপরটি নির্মিত হয়েছিল সেস্থানে যেখানে হযরত সা'দ ইবনে খুসাইমার ঘর ছিলো। ঐতিহাসিকরা এ ব্যাপারে একমত যে, নবী (সঃ) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পথে কুবায় অবস্থানকালে হযরত কুলসুমের গৃহকে অবস্থানের জন্য এবং হযরত সা'দের গৃহকে বৈঠকখানার জন্য পছন্দ করেছিলেন। আর এ দু'টি ছিলো কুবার মসজিদের লাগোয়া দক্ষিণে কিবলার দিকে।

বিরে রীস বা বিরে খাতাম

মসজিদে কুবা থেকে আনুমানিক পঞ্চাশ কদম দূরে বিরে রীস নামে একটা কূপ আছে। কূপটি হুযুর (স.)-এর যমানায়ও ছিলো। কথিত আছে, এ কূপটির পানি ছিলো লোনা। হুযুর (স.)-এর মুখের লালা ফেললে এর পানি মিষ্টি পানিতে পরিণত হয়। হুযুর (স.) যে আংটি ব্যবহার করতেন, পরে তা হযরত আবূ বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) ও হযরত উসমানের (রা.) কাছে আসে। একদিন হযরত উসমানের (রা.) হাত থেকে তা এ কূপে পড়ে যায়। অনেক খোঁজাখুজি করেও তা আর পাওয়া যায়নি। এ কারণে কূপটিকে বলা হয় বিরে খাতাম (আংটির কূপ)। কয়েক বছর আগেও এ কূপ থেকে পানি তুলে আশে-পাশের ভূমি সিক্ত করা হতো। কিন্তু বর্তমানে এর নিকটে একটা বড় টিউবওয়েল স্থাপনের ফলে কূপটির পানি শুকিয়ে গেছে।

মসজিদে যিরার

মসজিদে কুবা এবং বিরে খাতাম দেখা শেষ করলে একটা মজার কাণ্ড ঘটে। হাবীবুর রহমান সাহেব আমাদের সাথে ছিলেন না। কিন্তু তিনি বলেছিলেন, মসজিদে কুবা থেকে পূর্ব দিকে একটু দূরে মসজিদে যিরারের ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান রয়েছে। মসজিদে যিরার হচ্ছে সেই মসজিদ, যা মসজিদে কুবার গুরুত্ব হ্রাস করা এবং ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জন্য একটা আড্ডাখানা হিসাবে মুনাফিকরা নির্মাণ করেছিল। মুনাফিকরা তথাকথিত এ মসজিদটি নির্মাণ

www.pathagar.com

করে মহানবী (স.)-কে সেখানে যাওয়ার দাওয়াত দেয়। আর নবী (স.) তাদের দাওয়াত কবুলও করেছিলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী নাযিল হয়। অর্থ ঃ "আর যারা মসজিদ বানিয়েছে এজন্য, যাতে করে (সত্যের দাওয়াতের) ক্ষতি করতে পারে, (আল্লাহ্‌র বন্দেগীর পরিবর্তে) কুফরী করতে পারে এবং মু'মিনদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করতে পারে, আর ইতোপূর্বে যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিল, তাদের জন্য ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। তারা অবশ্যই কসম করে বলবে যে মঙ্গল বৈ আমাদের অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদি। আপনি সেখানে দাঁড়াবেন না কখনো। প্রথম দিন থেকেই যে মসজিদটির ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে তাকওয়ার উপর, আপনার দাঁড়ানোর জন্য তা বেশি হকদার। তাতে এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা উত্তমরূপে পাক-পবিত্র থাকতে ভালবাসে। আর যারা পাক পবিত্র থাকে, আল্লাহ তাদের ভালবাসেন। যে ব্যক্তি এর ভিত্তি স্থাপন করে আল্লাহর ভয় এবং তাঁর সন্তুষ্টির উপর, সে উত্তম, না ঐ ব্যক্তি উত্তম, যে এর ভিত্তি স্থাপন করে একটি প্রান্তরের অন্তঃসার শূন্য স্থিতিহীন বেলাভূমির উপর যা তাকে নিয়ে জাহান্নামের আগুনে পড়ে? আল্লাহ যালিম লোকদের হিদায়াত করেন না। তারা যে ভিত্তি স্থাপন করেছে, তা তাদের অন্তরে সর্বদা সন্দেহের কারণ হয়ে থাকবে, যতক্ষণ তাদের অন্তর ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে না যায়। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বড় কুশলী"। (সূরা তওবা ঃ ১০৮-১১০)।

এ আয়াত নাযিলের পর মহানবী (স.)-এর নির্দেশক্রমে মসজিদে যিরার তৎক্ষণাত ধ্বংস করে দেয়া হয়।

বর্তমানকাল পর্যন্ত এ মসজিদটির কোনো চিহ্ন থাকতে পারে, আমরা তা কল্পনাও করতে পারিনি। মদীনার নিদর্শনাদি সংক্রান্ত কোনো গ্রন্থেও এর কোনো উল্লেখ নেই। কিন্তু হাবীবুর রহমান সাহেবের কথায় আমরা মনে করলাম হয়তো এর কোনো চিহ্ন থাকতেও পারে। অজ্ঞতার কারণে কোনো লেখক হয়তো এর উল্লেখ করেননি। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করায় সেও অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে জানায় যে, হাঁ, আমি জানি। সে মসজিদের চিহ্ন কোথায় আছে, তা আমি দেখাতে পারবো। এজন্য সে আমাদের সোজা মদীনা মুনাওয়ারায় নিয়ে না এসে বরং মসজিদে কুবা থেকে পূর্বদিকে এক খেজুর বাগানে নিয়ে যায় এবং প্রায় এক ঘন্টা পর্যন্ত বিভিন্ন খেজুর বাগানে ছুটাছুটি করতে থাকে। আমরা জিজ্ঞেস করলে বলে, হ্যাঁ কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা সে মসজিদের কাছে পৌছবো। কিন্তু এক ঘন্টা পর্যন্ত খুঁজেও যখন তার কোনো পাত্তা পাওয়া গেলো না, তখন আমরা তাকে বললাম, না ভাই, আর খোঁজার দরকার নেই। আমাদের মদীনায় নিয়ে যাও। সে আমাদের

www.pathagar.com

মদীনার আল-বাকী কবরস্থানের কাছে নিয়ে যায়। এভাবে একটা ঘণ্টা ঘুরে আমাদেরকে শুধু শুধু দশ রিয়াল গচ্ছা দিতে হয়। একটা কাজ অবশ্য হয়েছে। আমরা যে এলাকায় ঘুরেছি, তা ছিলো হাররা ওয়াকুম অঞ্চল। মহানবী (স.)-এর যমানায় এবং তাঁরও আগে মদীনার ইহুদি কবীলা বনূ নাযীর এবং বনূ কুরাইযা এখানে বসবাস করতো। উর্বর শস্য-শ্যামলা এ অঞ্চলের সজীবতা এবং প্রচুর খেজুর বাগান দেখে আমাদের ধারণা করতে কষ্ট হয়নি যে, ইহুদিরা কিভাবে এবং কি জন্য মদীনার এ সবুজ অঞ্চলটি অধিকার করে রেখেছিল। এ কারণে আরবদের মধ্যে বসবাস করেও অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা আরবদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল।

বিরে রুমা বা বিরে উসমান

পরদিন ১৬ ডিসেম্বর আমরা হাবীবুর রহমান সাহেবকে নিয়ে পুনরায় বেরুই মদীনার নিদর্শনাদি দেখার জন্য। সকালে আমরা বিরে রুমা দেখতে যাই। এটা মদীনার প্রাচীন কূপ। মহানবী (স.)-এর সময়ে ছিলো, এখনও আছে। সুস্বাদু এবং মিষ্ট পানির জন্য কূপটি প্রসিদ্ধ। কিন্তু কূপটির মালিক ছিলো এক ইহূদী। নবী (স.) এই কূপটি ক্রয় করে সাধারণ মুসলমানদের জন্য ওয়াক্ফ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। হযরত উসমান (রা.) তখনই ২০ হাজার দিরহাম দিয়ে কূপটি ক্রয় করে ওয়াক্ফ করে দেন। এজন্য এটিকে বলা হয় বিরে উসমান। (উসমান কূপ)। বর্তমানে কূপটি মসজিদে নববীর ওয়াক্ফের অন্তর্ভুক্ত। সরকার এর আশে পাশে যথারীতি ডেইরী ফার্ম এবং পোলট্রি ফার্ম স্থাপন করেছে। চার ইঞ্চি মোটা পাইপ দিয়ে মেশিনের সাহায্যে এ কূপ থেকে সব সময় পানি তোলা হয়। মদীনা থেকে এর দূরত্ব উত্তর-পশ্চিম দিকে তিন চার মাইল।

মসজিদুল কিবলাতাইন

এরপর আমরা মসজিদুল কিবলাতাইন-দু'কিবলা ওয়ালা মসজিদ দেখতে যাই। মদীনা থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে আল-ওকাব নামক জনপদে এ মসজিদটি অবস্থিত। আসলে এটা ছিলো বনু সালামা কবীলার মসজিদ। কথিত আছে যে, নবী (স.)-এ মসজিদে যোহরের নামায আদায় করছিলেন বায়তুল মাকদেসের দিকে মুখ করে। এমন সময় কিবলা পরিবর্তনের অহী নাযিল হলে হুযুর (স.) নামাযের মধ্যেই কিবলা পরিবর্তন করে বাইতুল্লাহর দিকে মুখ করেন। এজন্য এটাকে মসজিদুল কিবলাতাইন বলা হয়। ১৯৫৬ সালে সফরকালেও আমরা দেখেছি, এখানে মসজিদে দু'টি মিহরাব-একটি বায়তুল মাকদেসের দিকে, আর অপরটি বাইতুল্লাহর দিকে। কিন্তু এবার দেখি, মসজিদটি সম্পূর্ণ নতুনভাবে নির্মিত। এতে একটি মাত্র মিহরাব রয়েছে। বাইতুলমাকদেস মুখী মিহরাবটি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে।

www.pathagar.com

আকীক উপত্যকা

এ মসজিদের পশ্চিম দিকে রয়েছে মদীনার সবচেয়ে মশহুর আকীক উপত্যকা। এক সময় তা খলীফা, আমীর এবং কবিদের আবাসিক এলাকা হিসাবে খ্যাত ছিলো। বর্তমানে এখানে সে সব মহলের কিছু ধ্বংসাবশেষ রয়েছে মাত্র। মসজিদুল কিবলাতাইনের সামনেই ছিলো হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর শাসনামলের একজন উমাইয়া শাসনকর্তা সাঈদ ইবনে ওয়াককাসের মহল। কিন্তু এখন আর তা নেই। এখন সেখানে নির্মিত হয়েছে বাদশাহ সউদের মহল।

খন্দক ও জাবালে সিলা

এরপর আমরা জাবালে সিলায় যাই। এটি মদীনা মুনাওয়ারার নিকটেই উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। পাহাড়টি বেশ উঁচু এবং বড়। মদীনা থেকে ওহোদ যাওয়ার পথে এটি বাম দিকে পড়ে। আহযাব যুদ্ধকালে নবী (স.) এবং সাহাবায়ে কিরাম মদীনা মুনাওয়ারার হিফাযতের জন্য যে খন্দক (পরিখা) খনন করেছিলেন, কয়েক শতাব্দী আগেই তা মুছে গেছে। কিন্তু যে সব ঐতিহাসিক এ নিয়ে গবেষণা করেছেন, তাঁদের ধারণা, অর্ধবৃত্তের আকারে তা এমনভাবে খনন করা হয়েছিল যে তা হাররা ওয়াকিম থেকে শুরু করে জাবালে সিলার উত্তর পশ্চিম পাশ ঘেঁষে পশ্চিম দিকে চলে গিয়েছিল। মুসলিম বাহিনী অবস্থান গ্রহণ করেছিল জাবালে সিলার পাদদেশে, আর কাফির বাহিনী মদীনায় হামলা করার জন্য এসেছিল উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে।

মসজিদে যুবাব

সিলা পাহাড়ের লাগোয়া উত্তর দিকে কালো রঙের একটা ছোট পাহাড় আছে। এ পাহাড়ের উপরে একটা মসজিদ আছে, যাকে বলা হয় মসজিদে যুবাব বা মসজিদে যু-বাব (মাছির মসজিদ বা দু'দরজা বিশিষ্ট মসজিদ)। কথিত আছে, আহযাব যুদ্ধের সময় নবী (স.) যেখানে নামায আদায় করেছিলেন এবং তাঁবু গেড়েছিলেন, এ মসজিদটি সেখানে নির্মিত হয়েছে।

মসজিদুল ফাতাহ

সিলা'র পাদদেশে উত্তর-পশ্চিমে আরও একটি মসজিদ আছে। এর নাম মসজিদুল ফাতাহ। বর্ণনায় পাওয়া যায়, কাফির বাহিনীর ধ্বংস এবং মদীনা ও মদীনাবাসীদের হিফাযতের জন্য আল্লাহর নবী এ স্থানে তিন বার দোয়া করেছিলেন। তৃতীয়বার তিনি যখন দোয়া করেন, তখন তাঁর দোয়া কবুল হয় এবং চেহারা মোবারকে আনন্দের চিহ্ন ফুটে উঠে। এজন্য এ মসজিদকে বলা হয় মসজিদুল ফাতাহ (বিজয়ের মসজিদ)।

মাসাজিদে খামসা বা পাঁচ মসজিদ

মসজিদুল ফাতার দক্ষিণে একটু দূরে পাঁচটি মসজিদ রয়েছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এ

www.pathagar.com

মসজিদগুলো হযরত আবূ বকর (রা.) এবং হযরত আলী (রা.) ইত্যাদি নামে পরিচিত। কিন্তু খন্দক যুদ্ধকালে এসব সাহাবী এসব স্থানে নিয়োজিত ছিলেন- এমন কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পাওয়া যায় না।

বনূ হারাম গুহা

সিলা পাহাড়ের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একটি গুহা আছে, যাকে বলা হয় কাহাফে বনূ হারাম (বনূ হারাম গুহা)। আহযাব যুদ্ধকালে নবী (স.) রাতে এখানে অবস্থান করতেন।

মসজিদে শাম্‌স্

সিলা পাহাড় দেখা শেষ করে আমরা মসজিদে শাম্‌স্ এবং কা'ব ইবনে আশরাফের দুর্গ দেখতে যাই। বনূ নযীর গোত্রকে অবরোধ কালে নবী (স.) যেখানে ছ'দিন নামায আদায় করেছিলেন, সেখানে মসজিদে শাম্‌স্ নির্মাণ করা হয়েছে। এ মসজিদটি মসজিদে কুবা'র পূর্ব দিকে কয়েক ফার্লং দূরে অবস্থিত। বনূ নযীর গোত্র এ এলাকায় বসবাস করতো। হতে পারে আগে এখানে মসজিদ ছিলো। এখনতো পাচীল ঘেরা ক্ষুদ্র এলাকা ছাড়া আর কিছুই নেই।

কা'ব ইবনে আশরাফ দুর্গ

মসজিদে শাম্‌সের অদূরে দক্ষিণ দিকে রয়েছে কা'ব ইবনে আশরাফের দুর্গ। এখন তা ধ্বংসপ্রাপ্ত। এখানেও কেবল চারিদিকে পাচীল ঘেরা একটু স্থান রয়েছে। কিন্তু এ দুর্গটি কতোটা সুরক্ষিত এবং সুদৃঢ় ছিলো, পাচীল দেখেই তা অনুমান করা যায়। এর দৈর্ঘ প্রস্থ প্রায় ৪২ গজ। চার ফুট চওড়া পাচীল।

দেখা সাক্ষাত

যোহরের আগেই আমরা ফিরে আসি এবং মসজিদে নববীতে যোহরের নামায আদায় করি। এদিন রাত পর্যন্ত অনেকেই আসেন মাওলানার সাথে সাক্ষাত করতে। মাগরিবের পর আসেন শেখ কাসেম আন্দজানী, শেখ মুহাম্মদ সুলতান নমনগানী এবং তাদের সাথে আরও কয়েকজন তুর্কী নওজোয়ান। মুহাম্মদ নমনগানীও একজন তুর্কী আলিম। মসজিদে নববীর নিকটে বাবুস সালামের সামনে 'আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ' নামে তার একটা বইয়ের দোকান আছে। এরা অনেক কথাই বলেন। বিশেষ করে আরব জাতীয়তাবাদের দাপট সম্পর্কে এদের অনেক অভিযোগ। জনৈক তুর্কী নওজোয়ান জানান ঃ কিছুদিন আগে মিসর এবং সিরিয়ায় কমিউনিজমের সমালোচনায় একটা নিবন্ধ লিখে দামেশকের একটি পত্রিকায় পাঠাই। কিন্তু সেখানকার সেন্সর কর্মকর্তারা নিবন্ধটি আমার কাছে ফেরত পাঠায়। এতে এ মর্মে নোট দেয়া হয় যে, আপনি কমিউনিজমের সমালোচনা করেছেন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। আর আমরা তার নিন্দা করছি আরব জাতীয়তাবাদের স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে। এর অর্থ দাঁড়ায়, আমরা জাতীয় স্বার্থে

www.pathagar.com

কখনো কমিউনিজমের বিরুদ্ধে লড়বো। আবার কখনো তার সাথে মিতালী করবো। তোমরা ধর্মের ভিত্তিতে তার বিরোধিতা করে তার সাথে মিতালীর পথই তো রুদ্ধ করে দিতে চাও।

মদীনা মুনাওয়ারার অভ্যন্তরের নিদর্শন

পরদিন ১৭ ডিসেম্বর আমরা বাসায়ই ছিলাম। আমি এবং চৌধুরী গোলাম মুহাম্মদ সাহেব মদীনা মুনাওয়ারার অভ্যন্তরে কোনো কোনো নিদর্শনের ছবি তুলি।

মসজিদুল মুসাল্লা বা মসজিদুল গামামা

বাবে শামী থেকে বাবে আম্বারিয়া যাওয়ার সময় এ মসজিদটি পথে পড়ে। নবী (স.) যেখানে ঈদের নামায পড়তেন, সেখানে এটি নির্মিত। তখন এখানে কোনো মসজিদ ছিলো না। খুব সম্ভব হিজরী দ্বিতীয় শতকে এটি নির্মিত হয়। তখন এখানে ঈদের নামায আদায় করা হতো। কিন্তু বর্তমানে এখানে আর ঈদের নামায পড়া হয় না, ঈদের নামায পড়া হয় মসজিদে নববীতে। বর্তমানে এখানে শিশুদের দীনি শিক্ষার একটা মক্তব চালু আছে।

বিরে বুদাআ

বাবে শামী থেকে যে রাস্তাটি মসজিদে নববীর দিকে চলে গেছে, সে রাস্তায় এক স্থানে বিরে বুদআ' এখনও বর্তমান আছে। এখনও এ কূপ থেকে মেশিনের সাহায্যে পানি তোলা হয়। কূপটি মহানবী (স.)-এর সময়ে ছিলো। এখনও আছে। হাদীস এবং ফিকার কিতাবে এর উল্লেখ দেখা যায়।

সাকীফায়ে বনূ সায়েদাহ

বীরে বুদায়ার নিকটে রাস্তার উপরে একটি স্থানকে বলা হয় সাকীফায়ে বনূ সায়েদাহ। অর্থাৎ মহানবী (স.)-এর ওফাতের পর মুহাজির এবং আনসাররা সেখানে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর হাতে খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করেছিলেন।

জাফর সাদিক ও আবূ আইউব আনছারীর গৃহ

মাগরিবের পর আমরা মসজিদে নববীর খতীব শেখ আবদুল আযীযকে দেখতে যাই তাঁর বাসায়। তিনি অসুস্থ ছিলেন। মসজিদে নববীর নিকট তাঁর বাসা। কথিত আছে যে, এককালে এটাই ছিলো ইমাম জাফর সাদিকের গৃহ। এর পাশে উত্তর দিকের গৃহটিকে বলা হয় হযরত আইউব আনছারী (রা.)-এর গৃহ। হিজরতের পর নবী (স.) এ গৃহে কমপক্ষে ৭ দিন আর বেশির পক্ষে এক বছর অবস্থান করেন। এখানে মসজিদের নিকটে তাঁর জন্য বাসস্থানও নির্মাণ করা হয়। মদীনায় হযরত আবূ বকর (রা.), হযরত উসমান (রা.) এবং আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) -এর গৃহ বলেও কোনো কোনো গৃহকে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু হেরেম শরীফের সম্প্রসারণের পর এসব গৃহ রাস্তার নিচে পড়ে গেছে বর্তমানে।

www.pathagar.com

তুর্কীস্তানীদের পাঠের আসর

মদীনা মুনাওয়ারায়ও তুর্কিস্তানী মুহাজিরদের সংখ্যা কম নয়। বরং তায়েফের তুলনায় এখানে তাদের সংখ্যা বেশিই বলতে হয়। একজন তুর্কী আলিম শেখ মাহমুদ তারাযী প্রতিদিন ফজরের পর মসজিদে নববীতে কুরআন হাদীসের দারস দেন নিজের ভাষায়। অধিকাংশ তুর্কী এতে অংশ গ্রহণের চেষ্টা করে। তুর্কী মুহাজিররা মাওলানা মওদূদীকে নিজেদের সমগোত্রের লোক মনে করে। কারণ, মাওলানার নানার কূল বাদশাহ আওরঙ্গযেবের শাসনামলে তুর্কীস্থান থেকে হিযরত করে হিন্দুস্থান আগমন করে। এজন্য তারা মনে করে, মাওলানার সাথে তাদের দীনী সম্পর্ক ছাড়া গোত্রীয় সম্পর্কও রয়েছে। এক সাথে যাতে সকল তুর্কীস্তানীর সঙ্গে সাক্ষাত হতে পারে এজন্য শেখ মাহমুদ মাওলানাকে একদিন তাঁর দারসে শরীক হওয়ার দাওয়াত দেন। মাওলানা তাঁর দাওয়াত কবুল করেন এবং পরদিন ১৮ ডিসেম্বর তাঁর দারসে শরীক হন। প্রায় শ'খানেক তুর্কী উপস্থিত ছিলেন। সকলের সাথে আলাপ-পরিচয় হয়।

তুর্কী বন্ধুদের দাওয়াত

এ দিন দুপুরে শেখ মাহমুদের বাসায় আমাদের দাওয়াত ছিলো। এখানে প্রায় সকল তুর্কীস্তানী মুহাজির উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়াও এখানে আমাদের সাক্ষাত হয় শেখ মুহাম্মদ সাদেকের সাথে। ইনি দীর্ঘদিন মিসরে আফগানিস্তানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। কায়রোয় অবস্থানকালে তার পুত্ররা শেখ হাসানুল বান্না শহীদের দাওয়াতে আকৃষ্ট হন। ১৯৫৪ সালে মিসর সরকার ইখওয়ানের বিরুদ্ধে নির্যাতন শুরু করলে তার বড় ছেলেকে গ্রেফতার করা হয় এবং ছোট ছেলেকে মিসর থেকে বহিষ্কার করা হয়। এরপর তিনি সরকারি চাকুরী ত্যাগ করে মদীনা মুনাওয়ারা চলে আসেন। এবং খুব সম্ভব এখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের চিন্তা করছেন।

আল-বাকী কবরস্তান

এদিন আসরের পর আমরা মদীনার আল-বাকী কবরস্তান যিয়ারত করতে যাই। মদীনা থেকে পূর্ব দিকে এটি পাঁচ মিনিটের দূরত্বে অবস্থিত। আগে এ কবরস্তানে যেতে হতো অনেক দূর ঘুরে। কিন্তু বর্তমানে সরকার নতুন রাস্তা নির্মাণ করেছেন। জাহেলিয়াতের যুগেও এটি ছিলো মদীনাবাসীদের কবরস্থান। তুর্কীদের শাসনকালে এখানে অনেক কবর পাকা করে তার উপর গম্বুজ নির্মাণ করা হয়। কিন্তু শরীফ হোসাইনকে পরাজিত করে নাজদীরা মদীনা দখল করে অধিকাংশ কবর ভেঙ্গে ফেলে। তা সত্ত্বেও মক্কার তুলনায় এখনও এখানে অনেক পাকা কবর রয়েছে। #

www.pathagar.com

১২

মদীনা মুনাওয়ারা থেকে আকাবা

১৯-৩০ ডিসেম্বর ১৯৫৯

১৯ ডিসেম্বর আমাদের আল-আলা রওয়ানা হওয়ার প্রোগ্রাম ছিলো। এটা মদীনার উত্তর দিকে তবুক সড়কে অবস্থিত। মদীনার আমীর আবদুল্লাহ সুদাইরী মেহেরবানী করে আমাদের সফরের উত্তম ব্যবস্থা করেন। খঞ্জর এবং বন্দুকে সজ্জিত একজন লোক দেন আমাদের পথ প্রদর্শনের জন্য। মদীনার স্থানীয় বাসিন্দা এ লোকটির নাম হামদান। পুলিশের ইনসপেক্টর জেনারেল হাসান শাইবা সাহেব আইয়াদ নামে এক ড্রাইভারকে ঠিক করে দেন। ড্রাইভারের সাথে লিখিত চুক্তি হয় যে, সে ফোর্ড পিক আপ যোগে আমাদেরকে জর্দান সীমান্তে পৌঁছে দেবে আর এজন্য ভাড়া নেবে দৈনিক একশ রিয়াল।

মদীনার উত্তরাঞ্চল সফরের জন্য এ ধরনের ব্যবস্থা জরুরী ছিলো। কারণ, একদিকে এসব এলাকায় জনবসতি খুবই কম, আর অন্য দিকে যাতায়াতের কোনো ভালো ব্যবস্থা নেই। বালি আর পাথরের উপর দিয়ে গাড়ি যাতায়াত করে। এখানে বলতে গেলে রাস্তার কোনো চিহ্নও নেই। যেটুকু আছে, তাতে চলাচল করে কেবল মালবাহী ট্রাক। লোকজন সাধারণত বিমানেই যাতায়াত করে আর এজন্য বিমানের ভাড়াও বেশ কম। অবশ্য কেবল সৌদি নাগরিকদের জন্য। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত এ এলাকায় হিজায রেলওয়ে চালু ছিলো। তখন সে এলাকায় জনবসতিও ছিলো এবং যাতায়াতেও কোনো অসুবিধা হতো না। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধ চলাকালে হিজাযের তুর্কী শাসনকর্তা শরীফ হোসাইন (জর্দানের বর্তমান বাদশাহ হোসাইনের পরদাদা) ইংরেজদের সাথে হাত মিলিয়ে তুর্কীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে ইংরেজরা আরব বাহিনী দ্বারা সর্বপ্রথম হিজায রেললাইন ধ্বংস করায়, যাতে এর ফলে একই সঙ্গে দু'টি ফল লাভ সম্ভব হয়। একদিকে তুর্কীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করা আর অপরদিকে স্বয়ং আরবদের জন্য এ রেললাইনটা অকেজো করে দেয়া। আরবরা একটা আবেগপ্রবণ বরং হুজুগে জাতি। জোশ এলে হুঁশ থাকে না। কর্ণেল লরেনসের উসকানীতে তারা নিজেদের হাতে নিজেদের ঘর ধ্বংস করে। তখন থেকে এ যাবত গোটা এলাকা বিরান পড়ে আছে। এ রেল লাইনটির মেরামত সম্পর্কে মাঝে মধ্যে শুনা যায়, পত্র-পত্রিকায়ও খবর ছাপা হয়। কিন্তু কবে নাগাদ এ কাজ শুরু হবে, কি আদৌ হবে না- বলা মুশকিল। এ রেল লাইন চালু না হলে উত্তরাঞ্চল সফর করা খুবই কঠিন।

www.pathagar.com

সকাল ৮ টার দিকে হামদান এবং আইয়াদ উভয়ে প্রস্তুতি নিয়ে আমাদের হোটেলে আসে। সাড়ে নয়টা পর্যন্ত মাল সামান গুছিয়ে গাড়িতে তুলি। ড্রাইভারের সাথে মাওলানা এবং হামদানের বসার ব্যবস্থা করি। আমি আর চৌধুরী সাহেব বসি পেছনে। অতঃপর বিদায়ী সালাম জানাবার জন্য রওযা মোবারকে হাযির হই এবং আল্লাহর দরবারে দোয়া করি, তিনি যেন তাঁর হাবীবের দরবারে বারবার হাযীর হওয়ার তাওফীক দান করেন। আর আমাদের পরবর্তী সফরকে করেন সহজ-সুগম। এরপর মদীনার শাসনকর্তার দফতরে যাই বিদায়ী সাক্ষাতের জন্য। আমরা তাঁর শুকরিয়া আদায় করি। পুলিশ ইনসপেক্টর জেনারেলের দফতরও ছিলো নিকটে। চৌধুরী সাহেব যান তার সাথে বিদায়ী সাক্ষাত করতে। তিনি ড্রাইভারকে খুব বুঝিয়ে বলেন, কোনো অসুবিধা করলে কিন্তু লাইসেন্স বাতিল করবো । সম্ভবত তাঁর এ হুমকীর কারণে গোটা সফরে ড্রাইভার আমাদের সাথে মোটামুটি ভালো ব্যবহারই করেছে। অন্যান্য আরব ড্রাইভারের মতো অকারণে আমাদেরকে উত্যক্ত করার চেষ্টা করেনি।

মদীনা থেকে আল-আলা

১১টার দিকে আমরা মদীনা থেকে রওয়ানা হই। কয়েক মাইল পাকা সড়কে চলার পর বাম দিকে মোড় নিয়ে হিজায রেললাইনের গা ঘেঁষে কাঁচা সড়কে চলি। দেড়টার দিকে একটা স্টেশনে নেমে যোহর এবং আছরের নামায আদায় করি। খাওয়া-দাওয়া শেষে প্রায় আড়াইটার দিকে সেখান থেকে রওয়ানা করি। রাত নয়টা পর্যন্ত একটানা গাড়ি চলে। বেশ ঠাণ্ডা পড়ছিল। মনে মনে ভাবছিলাম, কোনো স্টেশন পেলে সেখানে রাত কাটাবো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো স্টেশন না পেয়ে এক জায়গায় খোলা মাঠেই নামি। স্টোভে খানা পাকাই। নামায আদায় করে সেখানেই বালির উপর বিছানা পেতে শুয়ে পড়ি। সকালে জানতে পারলাম, রেলওয়ে স্টেশন নিকটেই ছিলো। পরদিন ২০ ডিসেম্বর ভোরে নামায এবং নাস্তা সেরে আবার রওয়ানা করি এবং ১টার দিকে আল-আলা পৌঁছি।।

মদীনা থেকে আল-আলা পর্যন্ত গোটা রাস্তাটাই কাঁচা, কোথাও পাহাড়ী রাস্তা, আবার কোথাও বালুময়। গোটা রাস্তায় চারিদিকে কেবল পাহাড় আর পাহাড়। ৫২০ মাইলের দীর্ঘ সফরে কোথাও পাহাড়মুক্ত খোলা ময়দান নজরে পড়েনি। গোটা এলাকা অনাবাদী। মাঝখানে শুধু একটা উপত্যকা পড়েছে, যাতে ছোট খেজুর বাগান রয়েছে। মদীনা থেকে কিছুদূর যাওয়ার পর আল-আলা পর্যন্ত গোটা রাস্তাই চলে গেছে হিজায রেল লাইনের গা ঘেঁষে। স্থানে স্থানে স্টেশন পড়ে সম্পূর্ণ অনাবাদী এলাকায়। স্টেশনগুলো পাকা এবং পাথরের তৈরি। বদ্দুরা দরজা জানালা খুলে নিয়ে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করেছে। কিন্তু আসল কাঠামো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। অতি সহজে এসব মেরামত করা যায়।

www.pathagar.com

রেল লাইন অনেকাংশে অক্ষত আছে। উন্নতমানের লোহার পেট্রি দীর্ঘদিন পরিত্যক্ত অবস্থায় থেকেও নষ্ট হয়নি। অনেক স্থানে লাইন সম্পূর্ণ অক্ষত রয়েছে। বরং রেল লাইনের পুলও অক্ষত আছে। আবার অনেক স্থানে পুলে ফাটল ধরেছে। এক স্থানে ভাঙ্গা ইঞ্জিনও দেখতে পেয়েছি। একস্থানে কয়েকটি বগিসহ ইঞ্জিন দাঁড়িয়ে আছে। আল-আলা স্টেশনে এখনও একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

পথ একেবারেই জনমানব শূন্য। কেবল একটা মাত্র স্থানে কিছু পাখি উড়তে দেখি। কোথাও কোথাও দু'একটা উটও চোখে পড়েছে। উটের সাথে আরবদের যে সম্পর্ক, সে তুলনায় এদিকে একেবারে নেই বললেই চলে। স্থানে স্থানে মরা উট পড়ে থাকতেও দেখেছি কিন্তু কোথাও চিল-কাক-শকুন দেখিনি। কেবল একটা স্থানে দেখেছি তিনটা শকুন, মরা উট খাচ্ছিল। বিভিন্ন উপত্যকা দেখে আমাদের ধারণা হয়েছে যে, ভূমি উর্বর ও চাষাবাদযোগ্য। পানিও খুব দূরে নয়। এলাকায় পানি না থাকলে এতো সবুজ গাছ-পালা জন্মাতো না। আরামকো রাবউল খালীর মতো শুষ্ক স্থানেও তারা পানি উত্তোলন করেছে। তাই এখানে পানি উত্তোলন করা তাদের জন্য কোনো কঠিন কাজ নয়।

আল-আলার অদূরে রয়েছে প্রশস্ত বিস্তীর্ণ উপত্যকা। আল-আলার একেবারেই নিকটে পৌঁছে চারিদিকে এমন সব পাহাড় দেখতে পাই, যা একেবারে ফেটে পড়েছে। দেখে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছিল যে, কোনো এক সময় ভূমিকম্প এসব পাহাড় খানখান করে ছেড়েছে। গোটা আরবের অন্য কোথাও এ অবস্থা দেখতে পাইনি।

আল-আলা

আল-আলা পৌঁছে কিছুক্ষণ আমরা শহরের বাইরে অবস্থান করি। একটা ঝর্ণার পানি দিয়ে হাত-মুখ ধুই, অযু করে নামায আদায় করি। খাওয়া-দাওয়া শেষে আমরা যাই সেখানকার শাসনকর্তার সেক্রেটারির দফতরে। রেল স্টেশনের নিকটেই ছিলো তাঁর দফতর এবং বাসা। আমাদের আগমন সম্পর্কে ইতোপূর্বেই তিনি তারবার্তা পেয়েছিলেন। অত্যন্ত উষ্ণ আন্তরিকতা এবং ভালবাসার সাথে স্বাগত জানান। রাস্তার অবস্থা জিজ্ঞেস করেন বারবার। আরবীয় সংস্কৃতি অনুযায়ী চা-কফি দিয়ে আপ্যায়ন করেন এবং নিকটেই একটা ঘরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করেন।

তার বাসায় আমরা রাতের খাবার খাই তার সাথেই। অর্থ দফতর, কৃষি দফতর এবং পুলিশ বিভাগের প্রধানরাও এতে উপস্থিত ছিলেন। সফরের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্যান্য বিষয়েও আলোচনা হয়। তাদের কাছে জানতে পারলাম, আল-আলার জনসংখ্যা ১২ হাজার। আশ-পাশের জনসংখ্যাসহ ধরলে মোট লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ৬০ হাজার। অবশ্য সৌদি আরবের লোকেরা জনসংখ্যা একটু বাড়িয়েই বলে। এদের কথায়ও তাই মনে হলো আমাদের। তাদের মুখে আরও জানতে

www.pathagar.com

পারলাম, এখানে চারটি প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং একটি দারুল আইতাম (এতীমখানা) আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিটিতে ছাত্রসংখ্যা গড়ে দু'শ করে আছে। অবশ্য ওটাও বাদশা সউদের শিক্ষা বিস্তার কর্মসূচির ফল। এলাকাটি এমনিতেই শস্য-শ্যামল এবং উর্বর। এখানে মিষ্টি আনার, আঙ্গুর, খেজুর এবং অন্যান্য ফল প্রচুর উৎপন্ন হয়। সেক্রেটারির বাসায় আমরা মিষ্টি আনার খেয়েছি। বেশ চমৎকার এ ফল।

পরদিন ২১ ডিসেম্বর সকালে নাস্তা পানি সেরে আল-আলার আমীর আহমদ সুদাইরীর সাথে দেখা করতে যাই। রেল স্টেশনের অদূরেই তার বাসভবন এবং তিনি মদীনার আমীর আবদুল্লাহ সুদাইরীর ভাইপো।

মাদায়েনে সালেহ

আল-আলার গভর্নরের সাথে কিছু সময় অতিবাহিত করে আমরা মাদায়েনে সালেহ দেখার জন্য বের হই। এখান থেকে তার দূরত্ব আনুমানিক ৩০ মাইল। আমরা যতোই সামনে অগ্রসর হচ্ছিলাম, উঁচু এবং বিদীর্ণ পাহাড়ের সংখ্যা ততোই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কোনো কোনো পাহাড় এতো উঁচু এবং ঋজু ছিলো যে, তা দেখে রীতিমত ভয় হতো। পাহাড়গুলোর আকৃতি ছিলো মন্দির এবং কেল্লার মতো। পাহাড়গুলো দেখে অনুমান করা যায় যে, সামূদ জাতি এসব পাহাড়ের উপর তাদের মহল, কেল্লা এবং মন্দির নির্মাণ করে থাকবে আর ভূমিকম্পের ফলে বর্তমানে তা ফেটে পড়েছে।

প্রায় দেড় ঘণ্টা চলার পর আমরা মাদায়েনে সালেহ পৌঁছি। এর প্রাচীন নাম 'আল-হিজর' এখনও লোকদের কাছে পরিচিত। কুরআন মজীদ এবং সীরাত গ্রন্থে এ নামই উল্লেখ রয়েছে। আজ থেকে ৬ হাজার বছর পূর্বে সালেহ (আ)-এর কাওম– সামূদ জাতি এখানে বসবাস করতো। এই সামূদ জাতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা পাহাড় কেটে ঘর বানাতো এবং নিজেদের শান্তি এবং স্থিতির জন্য তারা গর্বিত ছিলো। এমনকি তারা আল্লাহর রাসূল হযরত সালেহ (আ)-এর প্রতি ঈমান আনতে এবং তাঁর আনুগত্য করতে অস্বীকার করে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ঈমান আনার জন্য অবকাশ দেন। কিন্তু সকল নিদর্শন দেখার পরও তারা যখন নাফরমানী-অবাধ্যতা আর ঔদ্ধত্যে অটল থাকে তখন আল্লাহ তা'আলা এক ভূমিকম্প– কুরআনের ভাষায় সায়েকা- দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করেন। সামূদ জাতির এ ঘটনা কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে, কোথাও সংক্ষেপে আবার কোথাও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

মাদায়েনে সালেহ মদীনা এবং তবুক এর মধ্যস্থলে হিজায রেলওয়ের সবচেয়ে বড় স্টেশন ছিলো। এ স্টেশনের পাথর নির্মিত ইমারত এখনও অবিকল রয়েছে। বিরান অবস্থায় একটি ওয়ার্কশপও পড়ে আছে। একটা ইঞ্জিন এবং কিছু বগি নষ্ট হয়ে

www.pathagar.com

পড়ে আছে। খুব সম্ভব ট্রেন চলাচলকালে এখানে জনবসতি ছিলো। বর্তমানে এখানে কয়েকটি ঘর ছাড়া কোনো জনবসতি নেই। জনমানব শূন্য উজাড় স্টেশন খাঁ খাঁ করছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর একটা কম্পার্টমেন্টে আমরা কিছুক্ষণ কাটাই। এ কক্ষের দরজা-জানালা পর্যন্ত এখনও অক্ষত আছে।

যোহরের পর আমরা নিদর্শনাদির চিত্র গ্রহণের জন্য বেরুই। সামূদ জাতি পাহাড় কেটে যেসব গৃহ নির্মাণ করেছিল, চারিদিকে তা নজরে পড়ছিল। মধ্যখানে রয়েছে একটা বিরাট উপত্যকা। সেখানে কোনো জনবসতি নেই। কোথাও কোথাও বেদুইনদের দু'একটি তাঁবু চোখে পড়ছিল। কেউ বলেন, সামূদ জাতির আসল নিবাস ছিলো ঐ উপত্যকায়। পাহাড় কেটে তারা যেসব গৃহ নির্মাণ করেছিল, মূলত তা ছিলো জিনিস-পত্র রাখার এবং মৃত ব্যক্তিদের দাফন করার জন্য। আবার কেহ বলেন, এসব গৃহে তারা বাসও করতো। আমরা ঘুরে ঘুরে কয়েকটি ঘর দেখি এবং ভেতর-বাহির থেকে তার ছবিও তুলি। এসব গৃহের দরজা রীতিমতো পাথর কেটে নির্মিত হয়েছে এবং তাতে ঘোড়া, ঈগল ইত্যাদি জন্তুর ছবিও খোদাই করা আছে। একটা গৃহের দরজায় কিছু লেখাও রয়েছে। কিন্তু তা পড়া এবং বুঝা সম্ভব হয়নি। কোনো কোনো গৃহের অভ্যন্তরে আলমিরা এবং জিনিসপত্র রাখার স্থানও রয়েছে। কোনো ঘরের দরজারই চৌকাঠ নেই। একটি বড় কথা এ সম্পর্কে একজন স্থানীয় লোক জানায় যে, এখানে সামূদ জাতি মন্ত্রণা সভায় মিলিত হতো। এটা অবশ্য নিছক অনুমান। নিশ্চিত করে বলার মতো কোনো প্রমাণ নেই।

রেলওয়ে স্টেশনের নিকটেই একটা পুরাতন কেল্লা ধ্বংস প্রায় অবস্থায় বর্তমান রয়েছে। এর ভেতরে রয়েছে একটা প্রাচীন কূপ, যা বর্তমানে শুকিয়ে গেছে। এ কূপ সম্পর্কে স্থানীয় লোকেরা জানায় যে, এ কূপ থেকেই হযরত সালেহ (আ)-এর উষ্ট্রী পানি পান করতো। নবী (স.)-এর যমানা পর্যন্ত এ কূপটি যে বর্তমান ছিলো, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। হুযুর (স.) যখন তবুক থেকে আল হিজর (মাদায়েনে সালেহ) দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি সাহাবায়ে কিরামকে এ মর্মে নির্দেশ দেন যে, এখানকার কোনো কূপ থেকে কেউ যেন পানি পান না করে। অবশ্য হযরত সালেহ (আ)-এর উষ্ট্রী যে কূপ থেকে পানি পান করেছিল, তা বাদে। হুযুরের পর এ যাবৎ সর্বদা সে এলাকায় মুসলিম জনবসতি ছিলো। তাই এ কূপের স্থান নির্দেশ সম্পর্কে স্থানীয় লোকদের বক্তব্যে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

মদীনা থেকে যে পথে আমরা মাদায়েনে সালেহ পৌঁছি, তবুক যুদ্ধের সময় মহানবী (স.) এবং সাহাবায়ে কিরাম এ পথেই গিয়েছিলেন বলা যায়। গাড়িতে করে তাও আবার শীতকালে সফর করার সময় এ পথটি আমাদের নিকট যতোটা কঠিন এবং দুর্গম মনে হয়েছে, তাতে আমরা কেবল একথাই চিন্তা করেছি যে,

www.pathagar.com

নবী (স.) কঠোর গ্রীষ্মকালে ৩০ হাজার সাহাবী নিয়ে কিভাবে এ পথটি অতিক্রম করেছিলেন! নিঃসন্দেহে এটা এমন এক কঠিন পরীক্ষা ছিলো, যার অন্তরে বিন্দুমাত্র মুনাফিকী ছিলো, সে তা প্রকাশ না করে পারেনি।

মাদায়েনে সালেহ থেকে খয়বর

মদীনা মুনাওয়ারা থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় আমরা ঠিক করেছিলাম এবং ড্রাইভারের সাথে চুক্তিও হয়েছিল যে, আমরা মাদায়েনে সালেহ থেকে মদীনা ফিরে আসবো, সেখান থেকে খয়বর যাবো না। মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখা যায়, মাদায়েনে সালেহ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে নিকটেই খয়বর অবস্থিত। সেখান থেকে সোজা গেলে দূরত্ব হয় ২২৫ মাইল, আর মদীনা মুনাওয়ারা ফিরে এসে সেখান থেকে খয়বর গেলে দূরত্ব দাঁড়ায় মাত্র ১১৫ মাইল। কিন্তু মাদায়েনে সালেহ এবং খয়বরের মধ্যে সরাসরি কোনো ভালো রাস্তা না থাকায় আমরা মদীনা হয়ে খয়বর যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। একটা মাত্র পথ আছে সরাসরি যাওয়ার, কিন্তু তা একেবারেই অনাবাদী। সারা বছরে দু'চারটি গাড়ি এ পথে চলে কি না, সন্দেহ। এক দিকে রাস্তার এ অবস্থা, অন্যদিকে সময় এবং দূরত্বের চিন্তা। অনেক রাত পর্যন্ত এ নিয়ে চিন্তা করি। হামদান এবং আইয়াদের সাথেও পরামর্শ করি। হামদান একবার এ পথে গিয়েছিল, তাই সে যেতে রাজি ছিলো। কিন্তু ড্রাইভার ইতস্তত করছিল। অবশেষে হামদান তাকেও বুঝিয়ে রাজি করায়। আমরা আল্লাহর নাম নিয়ে এ পথেই সফর করা ঠিক করি।

মাদায়েনে সালেহে একরাত যাপন করে পরদিন ২২ ডিসেম্বর ভোরে আমরা খয়বরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। কিছুদূর তো রাস্তা ভালোই মনে হলো, বরং মদীনা-আল-আলা থেকেও উন্নত। কিন্তু কিছুক্ষণ চলার পর মনে হলো, যারা এ পথে না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল, ঠিকই করেছিলো তারা। এ পথ যতটুকু খারাপ ও দুর্গম, তা ধারণাও করা যায় না। মাঝে মধ্যে গাড়ির চিহ্ন দেখা যেতো। তাও ছিলো না থাকারই মতো। তাই আমরা কেবল আন্দাজ অনুমান করে এবং সূর্য দেখেই পথ অতিক্রম করছিলাম। এক স্থানে পথ ছেড়ে বেশ কিছুদূর চলে যাই ভিন্ন পথে। অনেক দূর চলার পরও গাড়ির কোনো চিহ্ন না পেয়ে হামদান ভাবল, আমরা উল্টা দিকেই যাচ্ছি। তাই সেখান থেকে ফিরে এসে অন্য পথ ধরে চলি। সবচেয়ে বেশি অসুবিধা হতো কয়েক মাইল দীর্ঘ কংকরময় মরু প্রান্তর অতিক্রম করতে। এখানে গাড়ির কোনো চিহ্নই ছিলো না। আল্লাহর উপর ভরসা করে নিছক অনুমানের ভিত্তিতেই আমরা এ পথ অতিক্রম করি। কয়েক স্থানে বালির বড় বড় স্তূপ পড়তো। এর দু'ধারে রয়েছে পাহাড়। এমন স্থানে আমাদের নেমে পড়তে হতো। ড্রাইভার সর্বশক্তি নিয়োগ করে কোনো রকমে গাড়ি পার করে নিতো। এক স্থানে বালুর মধ্যে গাড়ি এমনভাবে আটকা পড়ে যে, প্রায় এক

www.pathagar.com

ঘণ্টা লেগে যায় তা বের করতে। ড্রাইভার যেসব তক্তা নিয়ে এসেছিল তাও সব ভেঙ্গে গেছে। আমাদের সকলকে এমন কি মাওলানাকেও আশ-পাশ থেকে পাথরখণ্ড কুড়িয়ে এনে চাকার নিচে দিয়ে গাড়ি পার করার চেষ্টা করতে হয়েছে। রাস্তায় কোথাও পানি চোখে পড়েনি, কোনো লোকজন, জন্তু-জানোয়ার এমনকি মাছি-মশাও না। অনেক অনুসন্ধান করে একটা মাছিও কোথাও খুঁজে পাইনি। প্রায় ৭০/৭৫ মাইল এ বিপদ সংকুল পথ চলার পর বিকাল সাড়ে চারটার দিকে তাইমা থেকে খয়বর গামী রাস্তায় উঠে আমাদের প্রাণে পানি আসে। এ পথের কাছে এলে শিশুদের শব্দ কানে আসে, কিছু বকরীও চোখে পড়ে। আরও কাছে গিয়ে একটা বেদুইন গোত্রও চোখে পড়ে। এটা আল্লাহর এক বিরাট অনুগ্রহ যে, গাড়ি সম্পূর্ণ নতুন ছিলো, তাই এর কোনো পার্টস নষ্ট হয়নি। পথে গাড়ি নষ্ট হলে আমাদের কি দশা হতো তা কল্পনা করাও কষ্টকর। আমাদের দেশের কোনো ড্রাইভার হলে হতাশ হয়ে যেতো। কিন্তু আইয়াদ হতাশ হয়নি। সর্বশক্তি নিয়োজিত করে সামনে অগ্রসর হওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছে সে। আরবের বিশেষ করে সুদানের ড্রাইভাররা এমনিতেই অত্যন্ত সহনশীল এবং অধ্যবসায়ী। আইয়াদও মূলত সুদানেরই লোক। কয়েক বছর হলো সে মদীনায় এসে বসবাস করছে।

তাইমা থেকে খয়বরগামী পথও তেমন ভালো ছিলো না। কিন্তু রাস্তাটি চালু ছিলো এবং স্থানে স্থানে গাড়ির চাকার চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল, তাই আমাদের পথ হারিয়ে অন্য পথে যাওয়ার আশংকা ছিলো না। রাত ৮টা পর্যন্ত আমরা একটানা পথ অতিক্রম করতে থাকি। খয়বরের দিকে ৪৫ মাইল দূরে এসে উন্মুক্ত আকাশের নিচে খোলা প্রান্তরে রাত কাটাই। হামদান ও ড্রাইভার আইয়াদতো জঙ্গল থেকে কাঠ কুড়িয়ে এনে তা জ্বালিয়ে খাবারও রান্না করে। আগুনও পোহায়। কিন্তু আগুনের তাপ নিয়ে রাত কাটানো আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। তাই গাড়ি থেকে মাল-সামান নামিয়ে তারই মধ্যে কোনোভাবে রাত কাটাবার ব্যবস্থা করি। খুব ঠাণ্ডা ছিলো বটে, কিন্তু তাতে কোনো অসুবিধা হয়নি। মোটামুটি ঘুম হয়েছে। ভাগ্য ভালো তখনো সে এলাকায় বৃষ্টি হয়নি। বৃষ্টি হলে এমনভাবে পাহাড়ের পাশে খোলা ময়দানে রাত কাটানো সম্ভব হতো না। শুনেছি, বৃষ্টি হওয়ার পর এখানে ঠাণ্ডা জিরো পয়েন্টেরও নিচে নেমে যায়। আল্লাহর বিরাট শুকরিয়া আমরা তাবুক পৌঁছার পর বৃষ্টি শুরু হয়। অর্থাৎ বিপদ সংকুল পথ অতিক্রম করার পর বৃষ্টি নেমেছে। বৃষ্টি হলে উপত্যকায় পানি জমে গিয়ে বিরাট অসুবিধার সৃষ্টি হতো।

খয়বর

পরদিন ২৩ ডিসেম্বর ভোরে নামায ও নাস্তা-পানি সেরে আবার রওয়ানা হই এবং বিকেল চারটার দিকে খয়বর পৌঁছি। দূর থেকেই খয়বরকে বেশ শস্য-শ্যামল

www.pathagar.com

সবুজ এলাকা মনে হচ্ছিলো। লাভায় জ্বলন্ত পাহাড়ের মধ্যখানে চারিদিকে দেখা যাচ্ছিল সবুজ খেজুর বাগান। আমরা যা মনে করতাম, তার চেয়ে অনেক বেশি শস্য-শ্যামল খয়বর ভূমি। আরবভূমিতে এ এক আশ্চর্য ব্যাপার, জ্বলন্ত পাহাড়ের পাদদেশেই খেজুর বাগান বেশি হয়। মদীনা মুনাওয়ারায়ও এ অবস্থা দেখেছি।

শস্য-শ্যামল উর্বর খয়বরে এসে মনে হলো, প্রাচীনকালের রাস্তা-ঘাট, বাড়ি-ঘর এখনও এখানে বর্তমান। দেশে অনেক পরিবর্তন হলেও এখানে তার ছোঁয়া লাগেনি এখনও। চিকন-চিপা গলি পেরিয়ে নানা খেজুর বাগান হয়ে আমরা খয়বরের আমীরের কাছে যাই। তাঁর দারুল ইমারাহ (গভর্নর ভবন) হিসনে মারহাবে অবস্থিত। এ ভবনের সংস্কার করা হলেও ভিত্তি এখনও তাই রয়েছে, যা ছিলো মহানবীর (স.) যুগে। ইহূদী মারহাবের এ কেল্লাটি জয় করেন হযরত আলী (রা.)। এক উঁচু পাহাড়ের উপরে স্থাপিত এ দুর্গটির পাদদেশে যেখানে হযরত আলী (রা.) মারহাব ইহূদীকে হত্যা করেছিলেন, সেখানে মসজিদ আকারে একটা গৃহ এখনও বর্তমান রয়েছে। সেখানে আরোহণ করা সহজ কাজ নয়। আমরা নিজেরাতো কোনো মতে সেখানে উঠেছিলাম কিন্তু জিনিস পত্র উঠানো সহজ নয়। খয়বরের গভর্নর আমীর আবদুর রহমান হামদান আমাদের আগমন সম্পর্কে আগেই তারবার্তা পেয়েছিলেন। তারবার্তা পেয়ে তিনি আমাদের প্রতীক্ষায় ছিলেন। অত্যন্ত আগ্রহ আর আন্তরিকতার সাথে তিনি আমাদের স্বাগত জানান। আতিথেয়তার আরবি রীতি অনুযায়ী চা-কফি দিয়ে আপ্যায়ন করেন। তিনি শহরেই একস্থানে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করেন এবং রাতে তার বাসায় খাওয়ার দাওয়াত দেন।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে যোহরের নামায এবং খাওয়া-দাওয়া সেরে খয়বরের আমীরের ঠিক করে দেয়া লোক সিব্বীলকে সঙ্গে নিয়ে আমরা নিদর্শনাদি দেখার জন্য বের হই। প্রথমেই আমরা যাই খয়বর জনপদের উত্তর দিকে একটা খোলা ময়দান দেখার জন্য। আমাদের বলা হয় যে, মুসলিম বাহিনী এবং ইহূদীদের মধ্যে এ ময়দানেই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এ ময়দানের উত্তর দিকে আল-বাশ্‌শার নামক ক্ষুদ্র জনপদের পূর্বপ্রান্তে রয়েছে সে স্থানটি, যেখানে শহীদদের দাফন করা হয়েছিল। কয়েকটি পাথরের উপর কুফী ভাষায় শহীদদের নামও লেখা আছে, তবে তা এতোটা মুছে গেছে যে, পড়া যায় না।

এরপর আমরা দারুল ইমারার নিকট দিয়ে আর একটি পাহাড়ে পৌঁছি, সেখানে একটা পুরাতন কেল্লার ধ্বংসাবশেষ বর্তমান রয়েছে। সিব্বীল জানায়, এটা হিসনুল* ওয়াতীহ এর নিদর্শন। এর পূর্বদিকে হিসনুন নায়েম, উত্তর দিকে হিসনে

* হিস্‌ন মানে-দুর্গ বা কেল্লা। -সম্পাদক

www.pathagar.com

নাযারাহ, হিসনে লাকতিয়াহ, উত্তর-পূর্ব দিকে হিসনে আশাক, আর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে হিসনে সালেম-এর স্থান বলে পরিচিত। এসব দুর্গের কোনো কোনোটির চিহ্ন এখনও বর্তমান রয়েছে, আর কোনো কোনোটির চিহ্ন মুছে গেছে। সীরাত এবং হাদিস গ্রন্থের খয়বর যুদ্ধ অধ্যায়ে ইহূদীদের এসব দুর্গের উল্লেখ রয়েছে।

খয়বরে ঘুরাফিরা করে এবং সেখানকার লোকজনের সাথে আলাপ-আলোচনা করে জানা যায়, সেখানে মোট সাতটি উপত্যকা আছে। পৃথক পৃথক এ উপত্যকাগুলো একটি অপরটির চেয়ে শস্য-শ্যামল। স্থানে স্থানে আমরা দেখতে পেয়েছি ঝর্ণা এবং কূপ। লোকেরা জানায়, এ সব উপত্যকায় ঝর্ণার সংখ্যা প্রায় একশো। এখানে খেজুর গাছ ছাড়াও রয়েছে আঙ্গুর, আনার, কমলালেবু, লেবু এবং আঞ্জীর গাছ বিপুল পরিমাণে।

খয়বর দেখার পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটি আমাদের মনে হয়েছে তা হচ্ছে, মানুষ স্বচক্ষে যুদ্ধস্থান না দেখে নবী (স.)-এর সময়ের যুদ্ধ বিগ্রহ সম্পর্কে ধারণাই করতে পারে না। ইহূদীরা কেন্ এখানে সাতটি পৃথক পৃথক দুর্গ নির্মাণ করে রেখেছিল আর সেগুলো বিজয় করতে নবী (স.) এবং সাহাবায়ে কিরামকে কেন্ এতো বেগ পেতে হয়েছিল, সেখানে গিয়ে তার কারণ সহজে জানা যায়।

আমীরের বাসায় আমরা রাতের খাবার খাই। আগেই তিনি আমাদের দাওয়াত দিয়ে রেখেছিলেন। আমীর বারবার দুঃখ করে বলেছিলেন, এ বছর বৃষ্টি না হওয়ায় হালাল মরে গেছে। না হলে আমি গোটা হালাল জবাই করতাম। হালাল অর্থ কি, প্রথমে আমরা তা বুঝতে পারিনি। কিন্তু আমীর যখন বারবার এ শব্দটি উচ্চারণ করছিলেন, তখন আমরা বুঝতে পারলাম এর অর্থ বকরী বা দুম্বা। পরে আমরা দেখেতে পেয়েছি, বকরী বা দুম্বা অর্থে হালাল শব্দটি আরবের উত্তরাঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। অবশ্য আরবের অন্য কোনো এলাকায় এ অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয় না।

পরদিন ২৪ ডিসেম্বর ভোরে তাইমা রওয়ানা হওয়ার প্রোগ্রাম ছিলো আমাদের। কিন্তু ২৩ তারিখ বিকেলে হঠাৎ ড্রাইভার এসে জানালো, রাস্তায় গাড়ির একটা যন্ত্রাংশ নষ্ট হয়ে গেছে। অনেক রাত পর্যন্ত অন্যান্য ড্রাইভারের কাছে খুঁজেও সে এ যন্ত্রাংশটি পায়নি। অবশেষে সে জানায়, কাউকে পাঠিয়ে মদীনা থেকে এ যন্ত্রাংশটি আনাতে হবে, আর এজন্য ২৪ তারিখে গোটা দিনটাই আমাদের কাটাতে হবে খয়বরে। তাই ২৪ তারিখ সকালে আমরা নিশ্চিন্তেই বসেছিলাম, রওয়ানা হওয়ার কোনো প্রস্তুতিই নিইনি। হঠাৎ ১০টার দিকে ড্রাইভার প্রস্তুত হতে বললো। সে জানাল, এ যন্ত্রাংশটি অন্য একজন ড্রাইভারের কাছে পেয়েছে। সন্ধ্যার পূর্বে তাইমা পৌছার জন্য আমরা তাড়াতাড়ি রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি নেই। গাড়ি ছাড়বে, এমন সময় দু'জন লোক উপস্থিত। দু'জনেরই লেবাস সম্পূর্ণ

www.pathagar.com

আরবিয় হলেও একজন ভাঙ্গা ভাঙ্গা উর্দু বলছিলেন। তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন, আমার নাম আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ। আমি সিন্ধুর অধিবাসী। ৫৫ বছর আগে এসে খয়বরে বসবাস করি। এখন এতোটা আরব হয়ে গেছি যে, উর্দু এবং সিন্ধী ভাষা প্রায় ভুলেই গেছি। আমার ছেলে এবং নাতীরা তো এ দুটো ভাষা সম্পর্কে একেবারেই অপরিচিত– যেনো নামই শুনেনি কখনো। এরপর তিনি আমাদের একরকম জোর করেই তার বাসায় নিয়ে যান এবং চা ও বিপুল পরিমাণে ফল নিয়ে আসেন নাশতার জন্য। পরে শুনেছি, পাকিস্তান বিশেষ করে, সিন্ধুর যেসব হাজী খয়বর হয়ে যাতায়াত করে, তিনি সকলের সাথে এমনটি করেন। এদের মেহমানদারীতে তিনি কোনো ত্রুটি করেন না।

খয়বর থেকে তাইমা

১২ টার দিকে আমরা রওয়ানা করার জন্য গাড়িতে বসেছি মাত্র। এমন সময় আমীরের পক্ষ থেকে একজন লোক ছুটে আসেন আমাদের দিকে। লোকটি আমীরের পক্ষ থেকে হালাল-শাবক নিয়ে আসে। আসলে আরবিয় ঐতিহ্য অনুযায়ী আমাদের মেহমানদারী করতে না পারায় আমীর বারবার দুঃখ ও অনুতাপ করছিলেন। তাই পথে আমাদের খাবারের জন্য হালাল- শাবকটি দিয়ে তিনি মনের দুঃখ কিছুটা হালকা করছিলেন। আমরা আনন্দের সাথে তার এ হাদিয়া গ্রহণ করেছি। বিকেলে তাইমার পথে এক স্থানে অবস্থান করে তা জবাই করে পোলাও পাকিয়ে খাই আনন্দের সাথে। অবশ্য এ রাতও আমাদের কাটাতে হয় উন্মুক্ত ময়দানে গাড়ির ভেতরেই।

তাইমার এ পথটি এতোটা খারাপ– আরবদের প্রচলিত ভাষায় যাকে বলা হয় বাতাল– গোটা সফরে এর চেয়ে খারাপ রাস্তা আমরা দেখতে পাইনি। এর কোনো কোনো স্থানে গাড়ি ঘণ্টায় ৭/৮ মাইলের বেশি গতিতে চলতে পারেনি। আবার কোথাও কোথাও একেবারে গরুর গাড়ির গতিতে চলতো। একরাত একদিন চলার পর ২৫ ডিসেম্বর শুক্রবার জুমার সময় আমরা তাইমা পৌঁছি। খয়বর থেকে তাইমার দূরত্ব প্রায় দু'শ পঞ্চাশ মাইল। এ দীর্ঘ সফরে কোথাও কোনো জনপদ দেখতে পাইনি। শুধু এক স্থানে এক বেদুইনের সাক্ষাত পাই। পায়ে হেঁটেই চলছিল সে। কোথা থেকে আসছে আর কোথায় বা যাচ্ছে, বলা মুশকিল। বেদুইনের ভঙ্গিতে দূর থেকে আওয়ায দিয়ে সে আমাদের গাড়ি থামায়, একটা বড় পেয়ালা বের করে আমাদের কাছে পানি চায় সে। আমরা পানি দিলে সে পাত্রটি মুখে তুলে একটানে সব গিলে ফেলে। এরপর আমরা তাকে কয়েকটি রুটি দেই। রুটিগুলো সে এমন ব্যাকুল হয়ে খাচ্ছিলো, যেন কয়েকদিনের অভুক্ত। আরব বেদুইনদের এমন কাহিনী আমরা শুনেছিলাম, কিন্তু দেখার সুযোগ হয়নি। প্রচণ্ড শীতের দিনে একখানা কম্বল, একটা পানপাত্র আর দিয়াশলাই সাথে নিয়ে বেদুইনরা অনাবাদী এলাকায় দীর্ঘ সফরে বেরিয়ে পড়তে পারে। পথে রাত হয়ে

www.pathagar.com

গেলে জঙ্গল থেকে কাঠ কুড়িয়ে এনে তা জ্বালিয়ে আগুন পোহাতে পোহাতে রাত কাটিয়ে দেয়। রাস্তার কোনো যানবাহন বা লোকজন পেলে তাদের কাছ থেকে পানি চেয়ে খায়, অন্যথায় ক্ষুধার্ত-তৃষ্ণার্ত অবস্থায়ই রাত কাটায়। তবুও তার সফরের বিরাম নেই। আরবের বেদুইনরা যে কতটুকু পরিশ্রমী এবং কপর্দকহীন, এ থেকেই তা বুঝা যায়। বর্তমানে আরবে এমন লোকও আছে, যারা বিমান যোগে সফর করতে সক্ষম, আর গ্রামে এমন লোকও আছে, ট্রাক যোগে সফর করার ভাড়াও যাদের জুটেনা।

তাইমা

তাইমা পৌঁছেই আমরা দেখতে পাই একটা শ্যামল খেজুর বাগান। এখানে একটা পানির কূপ আছে। চারটা ইঞ্জিনের সাহায্যে চার-পাঁচ ইঞ্চি মোটা পাইপযোগে এ কূপ থেকে পানি তোলা হচ্ছে সব সময়, এর পরও কূপের পানি হ্রাস পাচ্ছে না এতোটুকু। একটি কূপের পানি দিয়েই তাইমার সকল খেজুর বাগান সিক্ত হচ্ছে।

কোনো এক সময় তাইমা ছিলো বেবিলনের বাদশাহর গ্রীষ্মকালীন রাজধানী। তার প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান রয়েছে এখানে। পরে ইহূদীরা এখানে নিবাস স্থাপন করে। খয়বর বিজয়ের পর ফাদাক এবং ওয়াদীউল কুরার সাথে সাথে এ এলাকার লোকেরা বিনা যুদ্ধেই মহানবীর (স.) নিকট আত্মসমর্পন করে। যেহেতু এখানে কোনো ইসলামী নিদর্শন ছিলো না, তাই আমরা এখানে মাত্র দু'ঘণ্টা অবস্থান করে তবুকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই।

তাইমা থেকে তবুক

তাইমা থেকে তবুকের দূরত্ব ২২৬ কিলোমিটার। রাত নয়টা পর্যন্ত একটানা সফর করার পর অবশেষে পথেই একস্থানে অবস্থান করে গাড়ির মধ্যেই ঘুমাতে হয়। তাইমা থেকে ৫০ মাইল পর্যন্ত রাস্তা ছিলো খয়বরের মতোই দুর্গম, বিপদসংকুল। কিন্তু এরপর রাস্তা ক্রমশ ভালো ছিলো। এমনকি কোথাও কোথাও এতো ভালো যে, আমাদের গাড়ি ঘণ্টায় ৪০/৫০ মাইল গতিতে চলছিলো। কিন্তু গোটা এলাকাটি ছিলো অনাবাদী। তবুক থেকে ১৪০ কিলোমিটার দূরে আল-কালীবা নামের একটি গ্রাম শুধু আমাদের সামনে পড়ে। হিজায, ইরাক, তবুক এবং আল-কারইয়াত থেকে চারটা রাস্তা এসে এখানে মিলিত হয়েছে। তাই এখানে সৌদি সরকারের একটা শুল্ক অফিসও স্থাপিত হয়েছে। তবুক যখন মাত্র ৫০ কিলোমিটার দূরে, তখন শুরু হয় বিশাল সমতল প্রান্তর। এ বিশাল প্রান্তর দেখে আমরা বুঝতে পারি, রোমকরা তাদের বিশাল বাহিনীর জন্য কেন এ তবুককে বেছে নিয়েছিল। সত্যিই এ প্রান্তরটি এতো বিশাল যে, রোমকদের বিশাল বাহিনী আর তিরিশ হাজার সৈন্যের মুসলিম বাহিনী একই সাথে এখানে মিলিত হওয়া সম্ভব ছিলো। ২৬ ডিসেম্বর মাগরিবের পূর্বক্ষণে আমরা তবুক পৌঁছি।

www.pathagar.com

তবুক

তবুক পৌঁছে সরকারি মেহমানখানায় অবস্থান করি। তবুকের আমীর উপস্থিত ছিলেন না। তাঁর সেক্রেটারি আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ সুদাইরী উপস্থিত ছিলেন। আমীরের অবর্তমানে ইনিই অস্থায়ী শাসনকর্তা। আমাদের আগমনের বার্তা তিনি আগেই পেয়েছিলেন। তাই আমাদের প্রতীক্ষায় ছিলেন তিনি। অতি চমৎকার নব নির্মিত এ মেহমানখানায় সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। দীর্ঘ আট দিনের বনবাসের পর মনে হয়েছে, এবার বুঝি আমরা জনপদে এসেছি। শীতের মৌসুম এবং রাত্রিকাল হওয়া সত্ত্বেও গোসল করা এবং কাপড়-চোপড় ধোয়া প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। পথে আমাদের অবস্থা এমন হয়েছিল যে, যেসব কাপড় অপরিষ্কার মনে করে মদীনায় খুলে রেখেছি, রাস্তায় মনে হয়েছে, তাই বুঝি পরিষ্কার। তাই রাস্তায় আমরা কাপড় ছাড়িয়ে এগুলোই ব্যবহার করি। কারণ নতুন কাপড় বের করে পরলে এক-আধ ঘণ্টার মধ্যেই তা ময়লা হয়ে যায়। সত্য কথা বলতে কি, আমাদের গোটা সফরের মধ্যে এ পথের সফর ছিলো রীতিমতো একটা ব্যতিক্রম।

পরদিন ২৭ ডিসেম্বর আমীরের সেক্রেটারির সাথে তাঁর দফতরে আমাদের সাক্ষাত হয় সকাল নটায়। নওজোয়ানের সাথে আলাপ করে মনে হলো তিনি বেশ খোঁজ-খবর রাখেন। আরব, জর্দান ছাড়া পাকিস্তান, হিন্দুস্তানের ভূগোল আর ইতিহাস সম্পর্কেও তাঁর বেশ জ্ঞান আছে। কাদিয়ানিজম এবং কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে বেশ আগ্রহ সহকারে আলোচনা করেন আমাদের সাথে। অবশ্য হিন্দুস্তানের মুসলমানদের করুণ দশা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলেন। হিন্দুস্তানের প্রচারনায় প্রভাবিত হয়ে তিনিও মনে করতেন, সেখানে মুসলমানরা বুঝি বেশ আরামেই আছে, তাদের রয়েছে সব রকম রাজনৈতিক অধিকার। মাওলানা তাকে গোটা পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি মন্তব্য করেন, এতে পাকিস্তানের প্রচার-প্রপাগান্ডার ত্রুটিও আছে। আরবের পত্র-পত্রিকায় হিন্দুস্তানের মুসলমানদের সম্পর্কে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে কিছুই প্রকাশিত হয় না।

মাওলানার সাথে সাক্ষাত এবং পরিচয়ের জন্য তিনি তবুকের শরীয়া বিভাগের প্রধান শেখ সালেহ ইবনে মুহাম্মদ তুয়াইজেরীকেও ডেকে পাঠান। মিশরের জামে আযহারের শিক্ষাপ্রাপ্ত শেখ সালেহ বেশ হাসি-খুশি, খোশমেজাজী, চটপটে এবং আলাপ করে মনে হলো তিনি বেশ খোঁজ-খবর রাখেন। ব্যাংকের সুদ এবং বীমা সম্পর্কে তিনি মাওলানাকে অনেক প্রশ্ন করেন এবং মাওলানার জবাবে সন্তুষ্ট ও প্রভাবিত হন। পরে আমরা তাকে মাওলানার অন্যান্য কিতাব ছাড়াও সুদ গ্রন্থের আরবি তরজমা- 'আর রিবা' উপহার দেই। আমীরের সেক্রেটারিও মাওলানার দু'একটি আরবি কিতাব পড়েছিলেন। কিন্তু মাওলানার অধিকাংশ কিতাব

www.pathagar.com

সম্পর্কেই তিনি জানতেন না। তিনি নিজেই মাওলানার কাছে কিতাবগুলো চান। সফরে আমাদের সাথে যা ছিলো, আমরা তা তাঁর খিদমতে পেশ করি।

১১টার দিকে শেখ সালেহকে সাথে নিয়ে আমরা তবুক ও আশ-পাশের নিদর্শনাদি দেখতে বেরুই। মুসলিম বাহিনী যেখানে অবস্থান নিয়েছিল, সর্বপ্রথম তিনি আমাদের সেখানে নিয়ে যান। মহানবী (স.) যেখানে নামায আদায় করতেন, বর্তমানে সেখানে একটা পাথরের নির্মিত মসজিদ আছে। মসজিদটি আগে ছিলো কাঠের নির্মিত। হিজরী ১২৪৫ সালে এক তুর্কী সামরিক অফিসার নিজ ব্যয়ে বর্তমান পাথরের মসজিদটি নির্মাণ করেন। আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার বিভাগের দফতরও বর্তমানে এ মসজিদেই স্থাপিত। এর পাশেই তুর্কীদের নির্মিত একটা প্রাচীন কেল্লা বর্তমানে কারাগার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

এরপর আসি মসজিদের কাছে একটি ঝর্ণায়। বর্তমানে শুকনা এ ঝর্ণাটির চারিদিকে রয়েছে প্রশস্ত পাচীল। শেখ সালেহ জানান, সহীহ মুসলিম এবং হাদীসের অন্যান্য কিতাবে এ ঝর্ণাটি সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। তবুকের পথে থাকতেই নবী (স.) সাহাবায়ে কিরামকে বলেন– তোমরা কাল তবুকের ঝর্ণায় পৌছবে। তোমাদের সেখানে পৌছতে পৌছতে বেশ বেলা হয়ে যাবে। তোমাদের মধ্যে যে প্রথম সেখানে পৌছে, সে যেন ঝর্ণার পানি ব্যবহার না করে। মুসলিম বাহিনী সেখানে পৌছে দেখে, দু'ব্যক্তি আগেই সেখানে হাযির। ঝর্ণা থেকে ফোটা ফোটা পানি পড়ছে। হুযুর তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এ ঝর্ণার পানি ব্যবহার করেছ? তারা বলে, জি হ্যাঁ, আমরা ব্যবহার করেছি। মহানবী (স.) এতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। অতঃপর সাহাবায়ে কিরাম অঞ্জলী ভরে একটি পাত্রে ঝর্ণার পানি জমা করেন। মহানবী (স.) চেহারা মোবারক এবং হাত ধুয়ে অবশিষ্ট পানি ঝর্ণায় ঢেলে দেন। মহানবীর পবিত্র হাতে ঝর্ণায় পানি পড়তেই অঝোর ধারায় তা থেকে পানি বেরুতে থাকে। বিরাট বাহিনীর সকলে তৃপ্ত হয়ে পানি পান করে। অতঃপর মহানবী (স.) হযরত মুয়াযকে (রা.) একথাও বলেন- মুয়ায, তুমি বেঁচে থাকলে দেখতে পাবে, এলাকাটি বাগ-বাগিচায় ভরে গেছে। শেখ সালেহ জানান, গত ১৪শ বছর পর্যন্ত ক্রমাগত ঝর্ণার পানি উতড়িয়ে পড়ে। মাত্র দু'বছর আগেও এ ধারা ছিলো, পরে নিচু এলাকায় অনেক টিউবওয়েল স্থাপিত হলে এ ঝর্ণার পানি সেদিকে ধাবিত হয় এবং এর ফলে ঝর্ণাটি শুকিয়ে যায়। এর আশে-পাশে টিউবওয়েলের সংখ্যা প্রায় ৫০টি।

এরপর শেখ সালেহ আমাদের একটা টিউবওয়েলের কাছেও নিয়ে যান। আমরা দেখতে পাই, টিউবওয়েলের মুখে লাগানো আছে চার পাঁচ ইঞ্চি মোটা একটা পাইপ। কোনো মেশিনের সাহায্য ছাড়াই তা দিয়ে অনর্গল পানি ঝরছে অঝোরে। আমাদের জানান হয় যে, অন্যান্য টিউবওয়েলের অবস্থাও প্রায় এরূপ। মহানবীর (স.) মুজিযা এবং তাঁর দোয়ার বরকতেই আজ তবুকে পানির এতো প্রাচুর্য যে,

www.pathagar.com

মদীনা এবং খয়বর ছাড়া আর কোথাও এতো পানি দেখিনি। সত্যকথা এই যে, তবুকে পানির প্রাচুর্য মদীনা এবং খয়বরের চেয়েও বেশি। এ পানির সদ্ব্যবহার করে এখন তবুকে সব ধরনের বাগান করা হচ্ছে। মহানবীর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তবুক অঞ্চল নানা বাগ-বাগিচায় ভরে উঠেছে। এখানে বাগানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

মেহমানখানায় ফিরে এসে আমীরের সেক্রেটারি এবং তার দফতরের অন্যান্যদের সাথে বসে একসঙ্গে দুপুরে খাবার খাই এবং শেখ সালেহকে নিয়ে আবার বেরুই তবুক শহর দেখার জন্য। শহরটির দ্রুত উন্নতি হচ্ছে। চতুর্দিকে আধুনিক ধরণের নতুন নতুন ইমারতের নির্মাণ কাজ চলছে। ছোট-বড় গুরুত্বপূর্ণ এবং গুরুত্বহীন এমন কোনো জিনিস নেই যা এখানকার বাজারে পাওয়া যায় না। এদিক থেকে তবুককে আমাদের মনে হয়েছে জেদ্দার একটি ছোট ভাই। ফল তো সৌদি আরবের অন্যান্য স্থান থেকে এখানে বেশি পাওয়া যায় এবং দামেও বেশ সস্তা। এর কারণ হচ্ছে, লেবানন এবং ফিলিস্তিন থেকে ট্রাকযোগে সৌদি আরবে ফল-ফ্রুট আসে এপথেই। মনে হয়, কয়েক বছর পর এখানেও প্রচুর ফল উৎপন্ন হবে।

সৌদী সরকার বর্তমানে তবুককে বিরাট সামরিক কেন্দ্রেও পরিণত করেছে। ৫-৬ বছর আগেও এটা ছিলো একটা মামুলী অঞ্চল, যার জনসংখ্যা ২-৩ হাজারের বেশি ছিলো না। বর্তমানে আমাদের ধারণায় এর জনসংখ্যা ২৫-৩০ হাজার আর শেখ সালেহের মতে তো ৫০-৬০ হাজার।

রাতে বৃষ্টি নামে। পাঁচ-ছয় বছরে এ অঞ্চলে এ প্রথম বৃষ্টি হলো। মানুষ বেশ খুশি। মাওলানা শেখ সালেহের সাথে কৌতুক করে বলেন, আমাদের বরকতে এ বৃষ্টি। শেখ সালেহ মাওলানার কৌতুকে বেশ খুশি হন।

তবুক থেকে মাগায়েরে শুয়াইব

পরদিন ২৮ ডিসেম্বর দুপুরের দিকে আমরা তবুক থেকে রওয়ানা হই মাগায়েরে শুয়াইবের উদ্দেশ্যে। তখনো বৃষ্টি হচ্ছিলো। তবুক থেকে ৩০৭ কিলোমিটার দূরে পশ্চিমে আকাবা উপসাগরের তীরে এটি অবস্থিত। এ পর্যন্ত আমাদের পথ প্রদর্শক ছিলো হামদান। কিন্তু সামনের পথ তার অজানা। তাই আমীরের সেক্রেটারি আমাদের আর একজন নতুন লোক দিয়েছেন পথ প্রদর্শনের জন্য। এর নাম আবদান। আম্মান পর্যন্ত সে আমাদের সাথে ছিলো। ড্রাইভারও জানালো, সৌদি আরবের বাইরের জীবনে সে কখনো যায়নি। আম্মান দেখার তার বেশ আগ্রহ। আমীরের সেক্রেটারি তাকেও গাড়ি নিয়ে আম্মান পর্যন্ত যাওয়ার অনুমতি দিলেন। চুক্তি অনুযায়ী জর্দান সীমান্ত পর্যন্তই তার যাওয়ার কথা। কিন্তু আমরাও তাকে পেয়ে খুশি ছিলাম আর সেও আমাদের পেয়ে আনন্দিত ছিলো। তাই আমরা তার গাড়িতে আম্মান পর্যন্ত যাই এবং জর্দানে পৌঁছার পরও দৈনিক একশো রিয়াল হিসাবে তাকে ভাড়া দেই।

www.pathagar.com

বৃষ্টির কারণে ঠাণ্ডা খুব বেশি পড়লেও বালু বসে যাওয়ার ফলে রাস্তা খুব ভালো ছিলো। শেখ সালেহ এবং তার সেক্রেটারি শেখ মুহাম্মদ ইবরাহীম আমাদের বিদায় জানাবার জন্য ২-৩ মাইল পর্যন্ত আমাদের সাথে আসেন। তবুক থেকে কয়েকটি রাস্তায় মাগায়েরে শুয়াইব যাওয়া যায়। কিন্তু সাম্প্রতিককালে সেনাবাহিনীর যাতায়াতের জন্য নব-নির্মিত একটি পথে আবদান আমাদের নিয়ে যায়। এ পথটি কাঁচা এবং অনাবাদী হলেও অন্যান্য রাস্তার তুলনায় কিছুটা ভালো এবং সংক্ষিপ্ত। পথে আমরা কয়েকটি উপত্যকা অতিক্রম করি। এসব উপত্যকার নাম আল-নাওবাহ, নবী মুর, আবইয়াক, আশরাক, শিমাল ইত্যাদি। আল-আলা এবং মাদায়েনে সালেহ এর মতো বিদীর্ণ পাহাড় বনী মুর উপত্যকায়ও দেখতে পাই। জানা যায় যে, মাদায়েনে সালেহ-এ যে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়েছিল আযাব হিসাবে, এখানেও তার প্রভাব পড়েছে।

পথে এক জায়গায় জঙ্গলের ভিতরে গাড়ির মধ্যে রাত কাটাতে হয়। পরদিন ২৯ ডিসেম্বর ভোরে নামায এবং নাশতা সেরে, আবার রওয়ানা হই। প্রায় ১ ঘণ্টা চলার পর আমরা মাকরাক পৌঁছি। অর্থাৎ এখান থেকে একটি পথ উত্তর দিকে আল-হাকাল এবং আর একটি দক্ষিণ দিকে মাগায়েরে শুয়াইব চলে গেছে। আমরা দক্ষিণের পথে চলি এবং দুপুর ১১টা পর্যন্ত আল-বাদা পৌঁছি। আল-বাদা একটি ছোট জনপদ। এখানে সৌদি সরকারের একজন স্থানীয় শাসনকর্তাও আছে। মাগায়েরের শুয়াইব এখান থেকে মাত্র দু'তিন মাইল দূর। স্থানীয় আমীর আমাদের আগমন বার্তা আগেই পেয়েছিলেন। তাই অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে স্বাগত জানান এবং সাধ্য পরিমাণ মেহমানদারী করেন।

মাগায়েরে শুয়াইব

আল-বাদা'য় এক ঘণ্টা অবস্থান করে আমরা রওয়ানা করি এবং অল্পক্ষণ পরই মাগায়েরে শুয়াইব পৌঁছি। এর প্রাচীন নাম মাদইয়ান। এখানে হযরত শুয়াইব (আ)-এর কাওম বসবাস করতো। হযরত শুয়াইব (আ) তবুক এলাকার জন্যও প্রেরিত হয়েছিলেন। অনেক মুফাস্‌সিরতো তবুককেই তার এলাকা বলে উল্লেখ করেছেন। এ এলাকায় বসবাসকারীদের কুরআন মজীদে আসহাবুল আইকাহ– আইকাবাসী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু হযরত শুয়াইব (আ)-এর দাওয়াতের মূল কেন্দ্র ছিলো মাদইয়ান বা বর্তমান মাগায়েরে শুয়াইব।

মাগায়েরে শুয়াইব বা মাদইয়ান একটা সবুজ-শ্যামল বিশাল উপত্যকা। মাদায়েনে সালেহ এর মতো এখানকার পাহাড়েও আমরা নানা প্রকার গৃহ দেখতে পাই। এর নিকটেই রয়েছে পাশাপাশি দু'টি প্রাচীন কূপ। স্থানীয় লোকদের ধারণা হযরত মূসা (আ) একজন কিবতীকে হত্যার পর মিসর থেকে চলে আসেন এ দু'টি কূপের একটার কাছে। স্থানীয় লোকেরা এ কূপ দু'টিকে বলে বীরে মদনী।

www.pathagar.com

মাগায়েরে শুয়াইব নিদর্শন থেকে এর দূরত্ব এক মাইল আর আল-বাদা' জনপথ থেকে দেড়-দু'মাইল। এ কূপদ্বয়ের নিকটে উত্তর দিকে একটি পুরাতন কেল্লার চিহ্ন আছে, দক্ষিণেও আছে অপর একটি চিহ্ন। কিন্তু এগুলোর কোনো ইতিহাস জানা যায় না, এ উপত্যকায় হোম নামে এক প্রকার গাছ আছে, যা অন্য জায়গায় দেখা যায় না। এ গাছে এক প্রকার ফলও হয়।

মাগায়েরে শুয়াইবে প্রায় দু'ঘন্টা অবস্থান করে সেখানকার নিদর্শনের ছবি তুলে আমরা আল-বাদা' ফিরে আসি। যোহরের নামায পড়ে সেখানে আমীরের সাথে খাবার খেয়ে প্রায় তিনটার দিকে আমরা রওয়ানা করি আল-ছাকামের উদ্দেশ্যে। এশার আগে আমরা সেখানে পৌঁছি। আল-বাদা' থেকে এর দূরত্ব ৮৮ কিলোমিটার, আর মাফরাক থেকে ৪৫ কিলোমিটার।

আল-হাকাল

জর্দান সৌদি আরব সীমান্তের নিকটে ৭/৮ মাইল দূরত্বে সৌদি আরবের একটি ছোট শহর আল-হাকাল। এখানকার আমীর মুহাম্মদ ইবনে হামদান অস্থির হয়ে আমাদের জন্য প্রতিক্ষায় ছিলেন। তার অপেক্ষার কারণও আছে। জর্দানের আকাবার ইখওয়ানরা তিন দিন পূর্বেই আমাদের আকাবা পৌঁছার কথা জানতে পেরেছেন। তাই আমাদের আল-হাকাল পৌঁছা মাত্রই তাদেরকে খবর দেয়ার জন্য তারা আল-হাকাল এর আমীরের কাছে খবর পাঠান। স্বয়ং আমীরের অনেক সাথীই মাওলানা সম্পর্কে জানতেন। তাদের কেউ কেউ মাওলানার কিতাবও পড়েছিলেন। মাওলানার সাথে সাক্ষাত এবং আলাপের জন্য আমীর এশার পর শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য একটা অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা করেন অতি অল্প সময়ের মধ্যে। উপস্থিত ব্যক্তিরা মাওলানাকে অনেক প্রশ্ন করেন এবং তিনি এসব প্রশ্নের জবাব দেন।

আল-হাকাল সৌদি আরবের শেষ প্রান্তর। এরপর আমরা জর্দান সীমান্তে প্রবেশ করি। আল-আলা, খয়বর, তবুক, আল-বাদা, এবং আল-হাকল এর আমীররা অত্যন্ত নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ নিয়ে আমাদের স্বাগত জানান এবং সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা দানে তাঁরা বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেননি। নিঃসন্দেহে তাদের মেহমানদারী আমাদের আরবদের ঐতিহ্যবাহী মেহমানদারীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আমাদের ধারণা জন্মেছে যে, অপর দেশগুলোতে জাতীয়তাবাদী এবং অন্য যেসব ফিতনা দেখা দিয়েছে, তা বড় বড় শহরেই সীমাবদ্ধ। ছোট ছোট শহর এবং গ্রামে এসবের কোনো চিহ্নও নেই। এসব শহর-গ্রামের নিরেট আরবরা এখনও সত্যিকার ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। সৌদি আরবে আমরা যে সুযোগ-সুবিধা পেয়েছি, আমি আগেও উল্লেখ করেছি যে, এ ব্যাপারে পাকিস্তানে নিযুক্ত সৌদি রাষ্ট্রদূতের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। তাঁর এ অনুগ্রহের জন্য আমরা তার কাছে কৃতজ্ঞ। #

www.pathagar.com

১৩

জর্দান ও ফিলিস্তিন

৩০ ডিসেম্বর ১৯৫৯ থেকে ১১ জানুয়ারি ১৯৬০

আকাবা

৩০ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ৮টায় আমরা আল-হাকাল থেকে আকাবার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। এটি আকাবা উপসাগরের তীরে জর্দানের একমাত্র বন্দর। সীমান্ত থেকে এর দূরত্ব দু'মাইল আর আল-হাকাল থেকে প্রায় ৯৮ মাইল। এর প্রাচীন নাম আইলা। সীরাত গ্রন্থে এ নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহানবী (স.)-এর তবুক অবস্থান কালে এখানকার শাসনকর্তা স্বেচ্ছায় জিযিয়া দিয়ে নবীর আনুগত্য ও ইসলামী রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করে। কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে আইলা-ই হচ্ছে সে স্থান, আসহাবুস সাবাত- শনিবারওয়ালারা যেখানে মাছ শিকার করতো। আল্লাহর নিষেধ সত্ত্বেও এরা শনিবারে সমুদ্র তীরে মাছের জন্য গর্ত তৈরি করে রাখতো। তাতে মাছ জমা হলে পরের দিন শিকার করতো। বাহ্যত তারা যেন শনিবার মাছ শিকার করতো না। সূরা আরাফের ১৬৩ আয়াতে বিস্তারিত এবং অন্যান্য সূরায় সংক্ষেপে শনিবারওয়ালাদের এ অপকৌশলের উল্লেখ রয়েছে।

আল-হাকালের আমীর আমাদের সাথে দু'জন সশস্ত্র প্রহরী দেন এবং আমাদের চেকিং না করার জন্য শুল্ক অফিসের কাছে একখানা চিঠিও দেন। শুল্ক অফিসাররা আমাদের সাথে অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করে এবং মেহমানদারীও করে।

সৌদী শুল্ক বিভাগ থেকে কাজ সেরে আমরা সীমান্ত অতিক্রম করে জর্দান প্রবেশ করি। জর্দানের শুল্ক কর্মকর্তারাও অত্যন্ত সম্মানের সাথে আমাদের গ্রহণ করেন এবং আমাদের বারণ করা সত্ত্বেও চা পান না করিয়ে ছাড়েননি। কিন্তু তারা আমাদের সামনে অগ্রসর হতে দেননি। কারণ, আকাবার প্রধান শুল্ক অফিসার সাইয়েদ মামদূহ সারারাহ- যিনি আকাবায় ইখওয়ানুল মুসলেমুনের স্থানীয় শাখারও প্রধান- খবর পাঠিয়েছেন যে, আমরা এখানে পৌঁছলে আমাদের যেন সামনে এগুতে না দেয়া হয়। তিনি ইখওয়ান কর্মীদের নিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে আসবেন। এ সুযোগে আমরা আকাবা বন্দর ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। ১৯৫৬ সালে আমরা যখন এখান দিয়ে যাই তখন এটা ছিলো একটা মামুলী

www.pathagar.com

বন্দর। তখন বন্দরে কোনো জেটি ছিলো না। ফলে জাহাজ বন্দরে ভিড়তে পারতো না। বন্দর থেকে দূরে জাহাজ ভিড়তো। যাত্রী এবং মালামাল নৌকাযোগে বন্দরে আনা-নেয়া হতো। আরব প্রজাতন্ত্র সরকার জর্দানের সাথে চুক্তি করে সীমান্ত বন্ধ করে দেয়ার ফলে জর্দানবাসীদের বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। বিদেশ থেকে জিনিসপত্র আনাতে হয় তাদেরকে বৈরুত বন্দর দিয়ে। কিন্তু বর্তমানে আকাবা একটা পুরাদস্তুর এবং বৃহৎ বন্দরে পরিণত হয়েছে। আকাবা শহরেরও বেশ উন্নতি সাধিত হয়েছে আগের তুলনায়। এখন বিদেশ থেকে সব মালামালই এ পথে আসে। আকাবা বন্দরের বিপরীতে প্রাচীন দিকে দেড়-দু'মাইল দূরে ইসরাইলী বন্দর ইলাতও এখান থেকে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। গত কয়েক বছরে ইসরাইলী বন্দরেরও বেশ উন্নতি হয়েছে। দূরবীন দিয়ে আমরা তা দেখি। বন্দর ছাড়াও সেখানে রীতিমতো একটা শহর গড়ে উঠেছে। তখন বন্দরে ৬-৭টি জাহাজ ছিলো। একখানা ডেন্ট্রয়ার জাহাজও ছিলো। কয়েক বছর আগেও ইহূদীরা এ বন্দরটি ব্যবহার করতে পারতো না। কিন্তু বর্তমানে দিব্যি ব্যবহার করছে।

শুল্ক অফিসারদের অনুরোধে আমরা প্রায় আধ ঘন্টা এখানে অপেক্ষা করি। অবশেষে আমরা রওয়ানা হই। কয়েক ফার্লং অগ্রসর হতে না হতেই দেখি চারটি মোটর গাড়িতে করে ইখওয়ানের ভাইয়েরা ছুটে আসছেন। রাস্তায়ই তাদের সাথে মোসফাহা-মুয়ানাকা অর্থাৎ করমর্দন ও কোলাকুলি হয়। তাদের সাথে গাড়িতে তুলে আমাদেরকে শহরে নিয়ে আসেন। শহরে তারা আমাদের থাকার ব্যবস্থা করেন। তাদেরকে জানাই যে, পাসপোর্টে এন্ট্রি সীল-মহর ছাড়াই আমরা জর্দানে প্রবেশ করেছি। তারা আমাদের পাসপোর্ট বন্দরে পাঠান এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সীল দিয়ে আনেন।

শুরুতে এদের সংখ্যা কম ছিলো, কিন্তু ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। এক-দেড় ঘণ্টার মধ্যে এ সংখ্যা একটা সমাবেশে পরিণত হয়। এটা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে, এরা সকলেই মাওলানার গ্রন্থাদি পড়েছিলেন প্রশিক্ষণ শিবিরেই। ইখওয়ানুল মুসলেমুনের মুরাকিব (তত্ত্বাবধায়ক) ওস্তাদ আব্দুর রহমান খলীফা আম্মান থেকেই টেলিফোনে নির্দেশ দিয়েছিলেন মাওলানাকে সম্বর্ধনা জানাতে এবং তাঁর কাছ থেকে ফায়দা হাসিল করতে। আমাদের সেখানে অবস্থান কালেও ওস্তাদ আবদুর রহমান খলীফার টেলিফোন এসেছে এবং তিনি আমাদের কাছে জানতে চেয়েছেন মাওলানার স্বাস্থ্য কেমন আছে। তিনি আমাদের পরবর্তী কর্মসূচী সম্পর্কেও খোঁজ-খবর নেন।

আকাবার এসব বন্ধুরা মাওলানার সফর সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন এবং অন্যান্য বিষয়েও তাঁকে প্রশ্ন করেন। তারা অনেক যত্নের সাথে দুপুরের খাওয়ার বিরাট আয়োজন করেন। তারা অন্তত এক রাত এক দিন সেখানে কাটাবার জন্য বারবার

www.pathagar.com

অনুরোধ করেন, সময় স্বল্পতার জন্য আপত্তি করলে তারা সেদিনই আমাদের মায়ান যাওয়ার অনুমতি দেন।

আসরের দিকে আমরা সেখান থেকে মায়ান রওয়ানা হই। এখান থেকে মায়ানের দূরত্ব ১২০ কিলোমিটার। ফিলিস্তিনী মুহাজির আকাবার ইখওয়ান-রফীক নুসরাত হুসাইনও আমাদের সাথে ছিলেন। আকাবা থেকে আম্মান পর্যন্ত এখন গোটা রাস্তাটাই পাকা। ১৯৫৬ সালে আমরা যখন এ পথে যাই, তখন সড়কটি ছিলো সম্পূর্ণ কাঁচা। সড়কটি পাকা হওয়ায় আকাবার দ্রুত উন্নতি হয়েছে। আম্মান এবং বাইতুল মাকদেসের পর বর্তমানে আকাবাই জর্দানের সবচেয়ে বড় শহর। ইরাকে বসরা বন্দরের যে গুরুত্ব, বর্তমানে জর্দানে আকাবা তার সমান গুরুত্ব লাভ করেছে।

এ পথে সব চেয়ে উঁচু স্থান 'নকীব আশতার'-এ আমরা মাগরিবের নামায আদায় করি। সবচেয়ে উঁচু স্থান বলে এখানে ঠাণ্ডাও পড়ছিল সবচেয়ে বেশি। দামেস্ক থেকে মদীনা পর্যন্ত হিজায রেলওয়ের যে লাইনটি চলে গেছে, তা এখন পর্যন্ত বহাল আছে। দামেস্ক থেকে এখান পর্যন্ত এখনও রেল যাতায়াত করে।

মায়ান

আম্মানের ৪৫ মাইল দক্ষিণে একটা মাঝারী ধরনের শহর মায়ান। এখান থেকে একটা সোজা রাস্তা তবুক পর্যন্ত চলে গেছে। মুতা ও অন্যান্য যুদ্ধের জন্য সাহাবায়ে কিরাম খুব সম্ভব এ পথেই সিরিয়া গমন করেছিলেন।

প্রায় এশার দিকে আমরা মায়ান পৌঁছি। ইখওয়ানের বিপুল সংখ্যক কর্মী অনেক দূর এগিয়ে এসে 'আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ্' ধ্বনি দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানায়। এদের মধ্যে মায়ানের কাযীও ছিলেন।

এরা রাতে আমাদের ভোজের আয়োজন করেন এবং মাওলানা থেকে ফায়দা হাসিলের পুরোপুরি সুযোগ গ্রহণ করেন। মায়ান এমন একটা অঞ্চল, যেখানকার সভ্যতা, ভাষা এবং খাওয়া-দাওয়ার রীতি-নীতিতে ইরাক, সৌদি আরব এবং সিরিয়া- তিনটি দেশের সমান প্রভাব বর্তমান। এক রাতের অবস্থানেই আমরা এ বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি।

ওয়াদীয়ে মূসা

পরদিন ৩১ ডিসেম্বর ভোরে নামায এবং নাস্তা সেরে আমরা মায়ান থেকে রওয়ানা হই ওয়াদীয়ে মূসার উদ্দেশ্যে। ওয়াদীয়ে মূসা এখান থেকে ৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এজন্য আমাদেরকে আম্মান থেকে আকাবার পথে ১৫ কিলোমিটার পথ পেছনে আসতে হয়। পেছনে এসে ডান দিকে মোড় নিয়ে কয়েক মাইল চলার পর আমরা ওয়াদীয়ে মূসায় পৌঁছি। গোটা সড়কটি ছিলো পাকা।

ওয়াদীয়ে মূসা একটা শস্য-শ্যামল এবং অতি সুন্দর উপত্যকা। এখানে পাহাড়ের

www.pathagar.com

চূড়া এবং ঢালুতে সবদিকে নানা রংবেরঙের ফুল গাছ শোভা পাচ্ছে। এখানকার পাহাড়গুলো এত সুন্দর করে সাজানোর ব্যাপারে স্থানীয় লোকদের পরিশ্রমও কম নয়। সৌদি আরবের তুলনায় জর্দানের অধিবাসীরা অনেক স্বাস্থ্যবান এবং পরিশ্রমী। 'আইনে মূসা' নামে পরিচিত একটা ঝর্ণা থেকে গোটা উপত্যকায় পানি সরবরাহ হয়। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম শেষ জীবনে এখানে অবস্থান করেন। এখানেই হযরত হারুন আলাইহিস সালামেরও ইনতেকাল হয়। উপত্যকার নিকটে একটি পাহাড়ে তাঁকে দাফন করা হয়েছে। তাওরাতে এ পাহাড়কে বলা হয়েছে জাবালে হুর। বর্তমানে এ পাহাড়কে বলা হয় জাবালে হারুন। সেখানে একটা মসজিদও নির্মিত হয়েছে। পাহাড়ে আরোহণ করে দূরবীন দিয়ে কবরের স্থান দেখি এবং দূর থেকেই তাঁর রূহপাকের উপর সালাম পৌঁছাই।

বাতরা (PATRA)

ঐতিহাসিক বাতরাও এই মূসা উপত্যকায় অবস্থিত। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের দু'শো বছর পূর্বে আরবের কিবতীরা এখানে রাজধানী স্থাপন করে। হিন্দুস্তানের ইলোরা এবং অজেন্তার মতো এ বিরান শহরটিও নির্মাণ করা হয়েছিল পাহাড়ের ভেতর। বিগত শতাব্দী পর্যন্ত কেউ জানতো না যে, পাহাড়ের নিচেও কোনো শহর চাপা পড়ে থাকতে পারে। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে পাহাড় খনন করে এ শহর আবিষ্কার করা হয়েছে। ইউরোপ, আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশের পর্যটকরা এ শহরটি দেখার জন্য জর্দান সফর করছে। আমাদের সফরের উদ্দেশ্যের সাথে এর সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু এতে পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করার কারণে কোনো কোনো প্রাচ্যবিদ দাবি করে, মাদায়েনে সালেহ-এর নিদর্শন সামূদ জাতির নিদর্শন নয়। বরং এ হচ্ছে নিবতীদের নিদর্শন। তারা আরও দাবি করে যে, কুরআনে এসব নিদর্শনকে সামূদ জাতির নিদর্শন বলা ভুল। খ্রিস্টানরাও এ দাবি ছড়াবার চেষ্টা করেছে। এনসাইক্লোপেডিয়ায় মাদায়েনে সালেহ-এর নিদর্শনসমূহকে বলা হয়েছে নিবতীদের নিদর্শন। মাদায়েনে সালেহ এর নিদর্শনের সাথে বাতরার নিদর্শনের সামঞ্জস্য বা অসামঞ্জস্য কতোটুকু রয়েছে তা দেখাই আমাদের উদ্দেশ্য। এ থেকে আমরা ধারণা করতে পারবো, প্রাচ্যবিদরা তাদের এ ধারণায় নিছক ভ্রান্তির শিকার হয়েছে, না তারা জেনে শুনেই কুরআনের দাবিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চায়। এ উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটে আমরা তিন-চার ঘন্টা ব্যয় করি বাতরা দেখার জন্য। অবশ্য পর্যটকদের জন্য এখানে ভাড়ায় ঘোড়া পাওয়া যায়। কিন্তু যে উঁচু-নিচু রাস্তা, তাতে ঘোড়ায় চড়ার চেয়ে পায়ে হাঁটাই ভালো।

শহরটির দৈর্ঘ্য তিন-চার মাইল। প্রস্থ কোথাও দশ-পনর গজ পৌঁছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে কয়েক ফুটের বেশি নয়। কোনো কোনো স্থানে তো মাত্র দু'তিন ফুট। মধ্যখানে একটা বিরাট ময়দানও পড়ে। কোথাও সাদা আবার কোথাও লাল

www.pathagar.com

পাহাড় কেটে চমৎকার গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে। কোনো কোনো গৃহ এতো চমৎকার যে, তা আজ থেকে দু'হাজার বছর আগের নির্মিত দেখেও এটা বিশ্বাস হয় না। একটা স্থান সম্পর্কে বলা যায় যে, এখানে নিবতীদের দরবার বসতো। আর এক স্থানে বেশ শানদার হলঘর রয়েছে। এর দু'দিকে রয়েছে ছোট ছোট কক্ষ। এর সামনে লাল রঙ্গের উঁচু খাম্বা এমন সুন্দরভাবে নির্মাণ করা হয়েছে, যা সৌন্দর্য এবং পরিপাট্যে বর্তমান যুগ থেকে কোনো দিক দিয়ে কম নয়। সামূদ জাতি মাদায়েনে সালেহেও পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করেছে। কিন্তু বাতরার নির্মাণ কৌশলের তুলনায় সেগুলোর মূল্যই থাকে না। কোনো কোনো বিষয়ে সামঞ্জস্য অবশ্যই পাওয়া যায়। কিন্তু এর ফলে এ দাবি করা চলে না যে, মাদায়েনে সালেহ-এর গৃহগুলোও নিবতীরাই নির্মাণ করেছে পাহাড় কেটে। এমনিতেই নিবতীরা মাদায়েনে সালেহ-এ গিয়েছে অনেক পরে। এ ছাড়াও বাতরার পাহাড় বা পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ কৌশলের চরম বিকাশ সাধনের পর মাদায়েনে সালেহ-এ এসে তারা এটাকে প্রাথমিক পর্যায়ে কেন রাখবে? এটাতো কোনো যুক্তির কথা নয়।

বাতরা থেকে আত-তাফীলা, আল-মাযার এবং আল-কারাক হয়ে যে পথ আম্মান চলে গেছে, আমরা প্রায় আড়াইটার দিকে সেপথ ধরে বাতরা থেকে রওয়ানা করি। রাস্তাটি তখন নির্মাণাধীন ছিলো। এর নির্মাণ কাজ শেষ হলে আম্মান থেকে সরাসরি আকাবা যাতায়াত সহজ সুগম হবে। বাতরা থেকে রওয়ানা হওয়ার পরই আবার শুরু হয় কাঁচা রাস্তা। এ রাস্তা আমাদেরকে আগের সফরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মাগরিবের পর আমরা আত্-তাফীলা অতিক্রম করছিলাম। হঠাৎ এখানে বিপুল সংখ্যক ইখওয়ান কর্মী আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়ায়। তারা জোর করে আমাদেরকে গাড়ি থেকে নামিয়ে চা-নাস্তা করায়। এখানে পনের-বিশ মিনিট তাদের সাথে আলাপ হয়। প্রায় এশার দিকে আমরা আল মাযার পৌঁছি। এর অদূরে রাস্তার পাশেই রয়েছে সেই ময়দান, মুসলিম এবং রোমক বাহিনীর মধ্যে যেখানে প্রথম মুতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। যায়েদ ইবনে হারিসা (রা.) জাফর তাইয়্যার এবং অন্যান্য বড় বড় সাহাবী এখানেই শহীদ হয়েছিলেন। আল-কারাক এর ইখওয়ানের নেতা এবং কর্মীরা আল-মাযারেই উপস্থিত ছিলেন এবং প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও তারা আমাদের অপেক্ষায় ছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন ডেপুটি কমিশনার, কাযী আলিম, ব্যবসায়ী সহ শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এরা 'আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ' ধ্বনি দিয়ে আমাদের বিপুল অভ্যর্থনা জানায়। এরা প্রথমে আমাদেরকে গাড়ি থেকে নামিয়ে এক স্থানে চা-নাশতার ব্যবস্থা করে। পরে সেখান থেকে ৫-৭টা গাড়ি যোগে অভ্যর্থনা জানিয়ে মিছিলের আকারে আমাদেরকে নিয়ে যায় আল-কারাক। সেখান থেকে আল-কারাকের দূরত্ব আনুমানিক ৭-৮ মাইল।

www.pathagar.com

আল-কারাক

মধ্যম ধরনের একটা সুন্দর শহর আল-কারাক। শহরের প্রধান ব্যবসায়ীর বাসায়- যিনি ইখওয়ানের সদস্য- আমাদের অবস্থানের ব্যবস্থা করেন স্থানীয় ইখওয়ান কর্মী ভাইয়েরা।

লূত জাতির নিবাস

পরদিন ১লা জানুয়ারি ১৯৬০ তারিখে ভোরে আমরা দেখতে যাই মৃত সাগরের পূর্ব তীরের আল্‌লিসান এলাকা। এর কাছেই রয়েছে মৃত সাগরের সে এলাকা যার সম্পর্কে ধারণা করা হয়েছে, লূত জাতির সাদুম এবং অন্যান্য শহর এখানেই পানির নিচে ডুবে গিয়েছিল। এ কারণেই মৃত সাগরের এ অংশকে বলা হয় লূত সাগর। মৃত সাগরের আশ-পাশের গোটা এলাকা দেখে সুস্পষ্ট অনুভূত হয় যে, এক ভয়ংকর আযাব স্থানে স্থানে ভূমি বিদীর্ণ করেছে আর স্থানে স্থানে বিরাট গর্ত হয়ে আছে। কিছু কাল থেকে জর্দান সরকার একদল বিশেষজ্ঞের সহযোগিতায় সাদূম শহর এবং উহার নিদর্শন অনুসন্ধানের চেষ্টায় নিয়োজিত রয়েছে।

মূতা

এখানকার চিত্র গ্রহণ করে আমরা মূতার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। আগেই উল্লেখ করেছি যে, আল-মাযার থেকে দু'তিন মাইল দূরে দক্ষিণে সড়কের নিকটেই মূতা অবস্থিত। পাহাড়ী এলাকাটি সমতল ভূমি থেকে বেশি উঁচু। এখানে মূতা নামে একটা গ্রাম আছে। এ গ্রামেরই একটা বিশাল প্রান্তরে রোমক এবং সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। প্রান্তরের একাংশের নাম আশ-শুহাদা বা মাশহাদ। স্থানীয় লোকেরা জানায়, যুদ্ধে শাহাদাত-প্রাপ্ত অনেক সাহাবায়ে কিরামকে এখানে দাফন করা হয়েছে। মূতায় বর্তমানে যেখানে আল-মাযার শহর গড়ে উঠেছে, সেখানেই অবস্থান নিয়েছিলেন সাহাবায়ে কিরামের বাহিনী। এখানে হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা, হযরত জাফর তাইয়্যাব এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযিয়াল্লাহু আনহুমসহ আরও অনেক সাহাবীর কবর আছে। এগুলোকে কেন্দ্র করেই এখানে আল-মাযার শহর গড়ে উঠেছে। আল-মাযার অর্থ যিয়ারতের স্থান। জানা যায় যে, যুদ্ধে শাহাদাতপ্রাপ্ত যেসব সাহাবায়ে কিরামের লাশ নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে, সেগুলোকে পেছনে নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্থলে দাফন করেছেন। আবার অনেকের লাশ ফেলেই তাদের পিছু হটতে হয়েছে। আমরা এসব মাযার জিয়ারত করি। হযরত জাফর তাইয়্যারের মাযারে একটা সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। নিকটেই রয়েছে যায়েদ ইবনে হারিসা এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার কবর। মূতার যুদ্ধ ক্ষেত্র দেখতে গিয়ে আমাদের এক বিস্ময়কর অবস্থা হয়েছিল। তখন বেশ ঠাণ্ডা ছিলো, একটু একটু বৃষ্টিও হচ্ছিলো।

www.pathagar.com

এরপরও ভেতর থেকে আমরা ঈমানের এমন এক উষ্ণতা অনুভব করছিলাম যা ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন। যারা এ ময়দানে প্রাণ দিয়ে শাহাদাতের হক আদায় করেছিলেন, তাদের জীবনের প্রতি আমাদের মনে ঈর্ষা জাগ্রত হচ্ছিলো। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন আর তারাও সন্তুষ্ট হোন আল্লাহ্‌র প্রতি।

আম্মান

এ দিন ছিলো শুক্রবার। আমরা আল-কারাক ফিরে এসে জুমার নামায আদায় করি। এরপর আম্মানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করি। আম্মানের দূরত্ব এখান থেকে তিন-চার কিলোমিটার। গত রাত থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। আমরা যতোই আম্মানের দিকে এগিয়ে যাই, বৃষ্টির বেগ ততোই বৃদ্ধি পায়। এতো বৃষ্টি সত্ত্বেও আব্দুর রহমান খলীফা ৩০-৪০ জন ইখওয়ান কর্মী নিয়ে প্রায় ১২ মাইল দূর থেকে অবস্থান করেছিলেন আমাদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। বৃষ্টির মধ্যেই তাদের সাথে মুসাফাহা-মুয়ানাকা হয়। পরিচয় করার দরকার ছিলো না। তাঁরা আমাদের চেনেন, আর আমরাও চিনি তাদের। ওস্তাদ খলীফা আবদুর রহমান তো ১৯৫৬ সালে দামেস্কে অনুষ্ঠিত মুতামারে আলমে ইসলামীর সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। তখন সম্মেলন শেষে আমরা আম্মান এলে ইখওয়ানের এসব নেতা-কর্মীদের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ এবং আলাপ হয়।

আম্মানে এসব বন্ধুরা আমাদের থাকার ব্যবস্থা করেন ফান্দাকে বালাস-প্যালেস হোটেলে। ইখওয়ানী নওজোয়ানরা বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে আমাদের জিনিসপত্র হোটেল কক্ষে নিয়ে তোলে। কক্ষে সবকিছু ঠিক ঠাক করে রাখার পর আমরা ড্রাইভার আইয়াদকে ভাড়া পরিশোধ করি এবং অতিরিক্ত দু'শ রিয়াল এনামও দেই। পথ প্রদর্শক আবদানকেও এনাম দেই। এরা উভয়ে পরদিন মায়ানের পথে তবুক রওয়ানা হয়। এদের হাতে আমরা তবুকের আমীর শেখ সালেহ এবং মদীনার আমীর এবং পুলিশের ইনসপেক্টর জেনারেলের নামে ধন্যবাদ পত্র পাঠাই।

পরদিন ২রা জানুয়ারি দুপুরে ওস্তাদ আব্দুর রহমানের বাসায় মাওলানার সম্মানে এক ভোজ সভার আয়োজন করা হয়। এতে শহরের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। মুতামারে আলমে ইসলামীর সাবেক এ্যাসিসট্যান্ট সেক্রেটারি এবং বর্তমানে নাইজিরিয়ায় জর্দানের রাষ্ট্রদূত ওস্তাদ কামেল শরীফ বায়তুল মাকদেস থেকে এসেছিলেন মাওলানার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য। অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তারাও ভোজ সভায় উপস্থিত ছিলেন। ভোজ সভা ছিলো বেশ জম-জমাট। সফরের উদ্দেশ্য ছাড়া ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কেও আলোচনা হয়।

চারটার দিকে আমরা হোটেলে ফিরে আসি। কারণ আম্মান বেতারের একজন প্রতিনিধি সকালেই এসে মাওলানার সাথে বিকেল সাড়ে চারটায় সাক্ষাৎকারের

www.pathagar.com

সময় নির্ধারণ করে যান। নির্ধারিত সময় তিনি পৌছেন এবং মাওলানার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। প্রশ্নোত্তর আকারে সাক্ষাৎকারটি ছিলো নিম্নরূপ ঃ

আম্মান রেডিওর সাথে সাক্ষাৎকার

প্রশ্ন ঃ আপনার বর্তমান সফরের উদ্দেশ্য কি?

উত্তর ঃ কুরআন মজিদ এবং সীরাত গ্রন্থে যেসব ঐতিহাসিক স্থানের উল্লেখ রয়েছে- সে সব ঐতিহাসিক নিদর্শন দেখা এবং বুঝা আমার বর্তমান সফরের লক্ষ্য। বর্তমানে আমি তাফহীমুল কুরআন নামে কুরআন মজীদের একটা তাফসীর লিখছি। এ তাফসীর লেখার প্রস্তুতিকালে আমি অনুভব করি যে, কুরআন শরীফে যে সব স্থান এবং এলাকার উল্লেখ রয়েছে, সেগুলো স্বচক্ষে না দেখে অনেক কিছুই বুঝা যায় না। এ কারণে আমি এ সফর করছি এবং মক্কা, মদীনা, বদর, তায়েফ, তবুক, খায়বর, মাদায়েনে সালেহ এবং মাগায়েরে শুয়াইব ইত্যাদি স্থান দেখে এসেছি। এখান থেকে বায়তুল মাকদেস এবং আল-খলীল যাবো। সেখান থেকে ফিরে এসে দামেস্ক যাওয়ার ইচ্ছা আছে। কায়রো থেকে যাবো সিনাই উপত্যকায়।

প্রশ্ন ঃ আপনার এ তাফসীর কোন্ ভাষায়?

উত্তর ঃ তাফসীর লিখছি উর্দু ভাষায়, কিন্তু আরবি, ইংরেজি এবং অন্যান্য ভাষায়ও তা প্রকাশ করার একান্ত ইচ্ছা রয়েছে আমার। এ পর্যন্ত আরবি ভাষায় সূরা নূর-এর তাফসীর সমাপ্ত হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ আরবি ভাষায় আপনার কয়টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে?

উত্তর ঃ এ পর্যন্ত আরবি ভাষায় আমার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা কুড়িটির বেশি। এগুলোর মধ্যে আল-হিজাব (পর্দা), আর-রিবা (সুদ) এবং মাবাদিউল ইসলাম (ইসলাম পরিচিতি) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রশ্ন ঃ মুতামারে আলমে ইসলামীর একজন সদস্য হিসেবে আপনি কি আমাদেরকে পাকিস্তানে মুতামারের ফলাফল সম্পর্কে অবহিত করবেন?

উত্তর ঃ পাকিস্তানে এর ফলাফল এই দাঁড়িয়েছে যে, ফিলিস্তিন সমস্যা সম্পর্কে পাকিস্তানি জনগণের অনুভূতি জাগ্রত হয়েছে এবং তারা এটাকে অন্যদের নয়, বরং নিজেদের সমস্যাই মনে করে।

প্রশ্ন ঃ ইসরাইলের ইহূদীরা সাম্প্রতিককালে জর্দান নদীর দিক পরিবর্তনের ষড়যন্ত্র করছে। এ স্পষ্ট অন্যায় সম্পর্কে আপনার কি অভিমত?

উত্তর ঃ সকল আরব জনগণের মতো আমি এবং প্রতিটি পাকিস্তানি একে স্পষ্ট অন্যায় মনে করে। আমি ফিলিস্তিনে ইসরাইলের অস্তিত্বকেই অন্যায় মনে করি। জর্দান নদীতে তাদের একবিন্দু অধিকারও থাকতে পারে না।

প্রশ্ন ঃ আরব দেশগুলোর সাথে পাকিস্তানের সম্পর্কের উপর কিছুটা আলোকপাত করবেন কি?

www.pathagar.com

উত্তর ঃ এ সম্পর্কে আমার কাছে কোনো তথ্য নেই। এসব তথ্যের সাথে সরকারের সম্পর্ক। অবশ্য পাকিস্তানের সাধারণ নাগরিকদের সম্পর্কে আমি এটা স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, তারা দেশ, ভাষা এবং বর্ণের ভিত্তিতে জাতীয়তায় বিশ্বাসী নয়। দেশ ও জাতীয়তার ধারণা কখনো তাদের মধ্যে দেখা দেয়নি। তারা মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত গোটা মুসলিম জাহানকে একই দারুল ইসলাম মনে করে, আরব বিশ্বের সকল মুসলমানকে মনে করে একই সমাজের লোক। কোনো মুসলিম সমাজে এর বিপরীত অবস্থা দেখে তারা ভীষণ দুঃখ পায়। মুসলিম জাহানের অন্যান্য দেশেও যদি একই ধারণা বিরাজ করতো!

প্রশ্ন ঃ জর্দানে এটা আপনার দ্বিতীয় দফা আগমন। এবার এখানে কোন্ নতুন বিষয়টি আপনি উপলব্ধি করছেন?

উত্তর ঃ এবার আমি জর্দানের সর্বত্র সামাজিক এবং বস্তুগত উন্নতির লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। বিশেষ করে নতুন নতুন রাস্তা-ঘাট নির্মিত হচ্ছে। এর ফলে ঐতিহাসিক স্থান দেখতে যাতায়াতে বিদেশী পর্যটকদের বেশ সুবিধা হচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ আরব দেশের কোনো দলের সাথে পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর কোনো সম্পর্ক আছে কি? থাকলে তা কোন্ ধরনের?

উত্তর ঃ পাকিস্তানে এখন জামায়াতে ইসলামী নিষিদ্ধ রয়েছে। কারণ বর্তমান সামরিক আইন জারির পর সেখানে সব রাজনৈতিক দল ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। তাই আপনার প্রশ্নের জবাব দেয়া সম্ভব নয়।

রেডিও প্রতিনিধি মাওলানার গোটা সাক্ষাতকার টেপ করে নেয় এবং পরদিন ৩ জানুয়ারি আম্মান বেতারে তা প্রচারিত হয় এবং কোনো কোনো পত্রিকায়ও তা প্রকাশিত হয়।

মাগরিবের পর শুরু হয় মাওলানার সাথে সাক্ষাতপ্রার্থীদের আগমনের ভীড়। এদের মধ্যে ইখওয়ানের নওজোয়ান ছাড়াও ছিলো আম্মানের অনেক সাহিত্যিকও। পাকিস্তান ছাড়াও কাশ্মীর এবং হিন্দুস্তানের মুসলমানদের অবস্থা এরা জিজ্ঞেস করছিলো এবং শুনছিল। কাশ্মীর সম্পর্কে তো এরা কিছু না কিছু জানতো, কিন্তু হিন্দুস্তানের মুসলমানদের সম্পর্কে এরা মোটেই জানতো না। দেড়-দু' ঘণ্টার আলাপে মাওলানা তাদেরকে অবহিত করলে তারা অত্যন্ত বিস্মিত হয়। এদের অনেকেই পাকিস্তানের তরফ থেকে প্রচার-প্রোপাগাণ্ডার ত্রুটির অভিযোগ করে। ইখওয়ানের নওজোয়ানরা ইসলামী আন্দোলন ও তার কর্মপন্থা সম্পর্কেও প্রশ্ন করে।

আরব জাহানের মধ্যে বর্তমানে জর্দানই একমাত্র দেশ, ইখওয়ানুল মুসলেমুন সেখানে প্রকাশ্যে পূর্ণ বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে কাজ করছে। দেশের ছোট বড় সব শহরেই ইখওয়ানের দফতর রয়েছে। পরিশ্রম, নিষ্ঠা এবং পারস্পরিক ভালবাসা এমনিতেই সকল ইখওয়ানের যৌথ পুঁজি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে জর্দানের

www.pathagar.com

ইখওয়ানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এর কারণ, আমি যতদূর বুঝতে পেরেছি এই যে, এদের মুরাকিব ওস্তাদ আব্দুর রহমান খলীফা নিজেও একজন পরিশ্রমী এবং অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্যক্তি। আর সবচেয়ে বড় কথা এই যে, তিনি নিজেকে নেতার চেয়েও কর্মী মনে করেন বেশি। ইসলামী আন্দোলনের জন্য তিনি একজন নিরলস কর্মীর মতো কাজ করে যাচ্ছেন।

বাদশা হোসাইনের সাথে সাক্ষাৎ

সকাল নটা দশটার দিকে জর্দানের প্রধান বিচারপতি ও শিক্ষামন্ত্রী মুহাম্মদ আমীন শানকীতী মাওলানার সাথে হোটেলে দেখা করতে আসেন এবং বাদশাহ হোসাইনের পক্ষ থেকে সাক্ষাতের জন্য দাওয়াত নামা দিয়ে যান। একটার দিকে আমরা বাদশাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য তার প্রাসাদে যাই। ওস্তাদ আব্দুর রহমান খলীফাও সাথে ছিলেন। সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতে বাদশাহ ইসলাম এবং পাকিস্তান সম্পর্কে আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করেন। মাওলানা বাদশাহকে এক সেট আরবি কিতাব উপহার দেন। সাক্ষাতের আগে সম্ভবত তিনি আম্মানে মাওলানার উপস্থিতি সম্পর্কে জানতেন না। সাক্ষাতের পর তিনি আমাদেরকে শাহী মেহমানখানায় নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। আমরা সরকারি মেহমানখানায় না গিয়ে হোটেলেই ছিলাম। অবশ্য আমাদের হোটেলের যাবতীয় ব্যয় সরকার পরিশোধ করেন।

বায়তুল মাকদেসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা

৪ঠা জানুয়ারি সকালে আমরা বায়তুল মাকদেসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করি। ওস্তাদ আব্দুর রহমান খলীফাও আমাদের সাথে ছিলেন। পথে আস-সাল্‌ত নামক স্থানে প্রায় দু'আড়াইশো জনতা আমাদের অভ্যর্থনা জানায়। তারা আমাদেরকে গাড়ি থেকে নামিয়ে শোভাযাত্রার আকারে শহরে নিয়ে যায়। অত্যন্ত আগ্রহের সাথে তারা সেখানে একটা হলে মিটিংয়েরও আয়োজন করে। অন্তত একদিন সেখানে অবস্থান করার জন্য তারা বারবার অনুরোধ জানায়। অনেক কষ্ট করে তাদেরকে রাজি করাই। তারা মাওলানার কাছে নসীহত করার আবেদন জানালে মাওলানা সংক্ষেপে তাকওয়া এবং ইসলামের পথে অটল-অবিচল থাকার নসীহত করেন। সকলে অত্যন্ত আগ্রহ এবং মনোযোগের সাথে মাওলানার উপদেশ শ্রবণ করে।

ওয়াদীয়ে শুয়াইব

আল-সাল্‌ত থেকে সামনে অগ্রসর হয়ে আমরা ওয়াদীয়ে শুয়াইব দিয়ে অতিক্রম করি। উপত্যকাটি শস্য-শ্যামল। এখানে ঝর্ণা থেকে পানি প্রবাহিত হয় নদীর মতো। এ উপত্যকায় একটি উঁচু স্থানে হযরত শুয়াইব আলাইহিস সালামের মাকবারা বানানো হয়েছে। হযরত শুয়াইব আলাইহিস সালামকে সত্যি সত্যিই এখানে দাফন করা হয়েছে কিনা, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কিন্তু প্রাচীনকাল

www.pathagar.com

থেকে সাধারণ্যে এখানে একটা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, হযরত শুয়াইব আলাইহিস সালামের কাওমের উপর আযাব নাযিল হওয়ার পর তিনি এখানে চলে আসেন। এটা খুব একটা অলৌকিকও নয়। কারণ মাদইয়ান বেশ বড় এলাকা। বর্তমান জর্দানের কাছেই ছিলো এ এলাকাটি। বরং এর উত্তরাঞ্চল তো বর্তমান জর্দানের অন্তর্ভুক্তই। স্বয়ং আকাবাও ছিলো এর একটা গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রস্থল। আমরা গাড়ি থেকে নেমে মাকামে শুয়াইবের (সা) চিত্র গ্রহণ করে সামনে অগ্রসর হই।

জর্দান নদী

ওয়াদীয়ে শুয়াইব থেকে সামনে অগ্রসর হলে শুরু হয় পাহাড়ের উৎরাই। একটু পরে সে স্থান, যেখানে এসে জর্দান নদী মৃত সাগরের সাথে মিলিত হয়েছে। এ স্থানটি সমুদ্রের পৃষ্ঠ থেকে ১৩শ ফুট নিচু। এটাকে জর্দানের সবচেয়ে শস্য-শ্যামল অঞ্চল বলে মনে করা হয়। আমরা যখন আম্মান থেকে রওয়ানা হই তখন বেশ ঠাণ্ডা ছিলো। আমরা শীতের কাপড়-চোপড় পরে নেই। কিন্তু এখানে পৌঁছে আমাদের কোট খুলে রাখতে হয়। ১৯৫৬ সালে আমরা যখন এপথ দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন গ্রীষ্মকাল ছিলো। আম্মান এবং বায়তুল মাকদেসে গরম ছিলো খুব কম। কিন্তু এখানে যখন পৌঁছি, তখন বেশ গরম অনুভূত হয়।

জর্দান নদীকে নদী বলা হলেও তা আমাদের খাল বা ঝর্ণার চেয়েও ছোট। অবশ্য এদেশের জন্য এটা সবচেয়ে বড় নদী। এটা এক বিস্ময়কর নদী। উত্তরে সিরিয়ার পাহাড়ী অঞ্চল থেকে এর শুরু। এরপর একটা ঝিলে প্রবেশ করে সামনে অগ্রসর হয়েছে। সেখান থেকে আরেকটি ঝিলের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে মৃত সাগরে এসে শেষ হয়েছে। পথে ইয়ারমুক, যারকা এবং আরো কয়েকটি নদী- আসলে যা নদী নয়, পাহাড়ী নালী এর সাথে এসে মিশেছে। এ নদী থেকে পানি এসেই মৃত সাগরের পানি সামান্য বৃদ্ধি পায়। মৃত সাগরের সাথে অন্য কোনো নদীর সংযোগ নেই। আর মৃত সাগরও নামমাত্র সাগর আসলে একটা ঝিল। অবশ্য এতে প্রচুর খনিজ দ্রব্য রয়েছে। যে কারণে এর পানি খুবই ভারি। বলা হয়ে থাকে যে, এতে কেউ পড়ে গেলে ডুবেনা।

১৯৪৮ সাল পর্যন্ত জর্দান নদীর পূর্বাঞ্চলকে বলা হতো জর্দান আর পশ্চিমাঞ্চলকে ফিলিস্তিন। কিন্তু বর্তমানে কার্যত কোনো ভূখণ্ড নেই মানচিত্রে। ১৯৪৮ সালে ইংরেজরা ফিলিস্তিনকে এমনভাবে বণ্টন করে যে, এর পশ্চিমাঞ্চল দিয়েছে ইহূদীদেরকে আর পূর্বাঞ্চলের কিছু অংশ দিয়েছে আরবদেরকে। পশ্চিমের যে অংশটি রোম সাগরের গা ঘেঁষে চলে গেছে, তা এমনিতেই অতি শস্য-শ্যামল আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। ইংরেজরা এ মূল্যবান অংশটিই তুলে দিয়েছে ইহূদীদের হাতে। পূর্বাঞ্চলের সে অংশটুকুতে আরবদের থাকতে দেয়া হয়েছিল,

www.pathagar.com

জর্দানের বর্তমান বাদশাহর দাদা শাহ আবদুল্লাহ ১৯৪৮ সালে তা যথারীতি তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। এ কারণে তিনি পূর্ব জর্দানের পরিবর্তে তাঁর রাজ্যের নাম দেন জর্দানের হাশিমী রাজ্য। এদের মানচিত্রেও এখন ফিলিস্তিনকে দেখানো হচ্ছে আল-দায়ফাতুল গারবিয়্যাহ-জর্দান নদীর পশ্চিমাঞ্চল বলে। অবশ্য সিনাই উপত্যকার গাজা এলাকায় সাবেক ফিলিস্তিনের কিছু অংশ মিশরের অধিকারে আছে। মজার ব্যাপার জর্দানের শাহ আবদুল্লাহ ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত আমীর ছিলেন। এরপর তিনি বাদশাহ পদবী গ্রহণ করেন।

আরীহা

জর্দান নদী পার হয়ে আমরা ফিলিস্তিন বা আল-দাফফাতুল গারবিয়্যায় প্রবেশ করি। এখানে সর্বপ্রথম যে শহরটি দেখতে পাই তা হলো আরীহা। এটি অতি প্রাচীন শহর। কথিত আছে, হযরত মূসা (আ)-এর সময়েও শহরটি এমনিভাবে আবাদ ছিলো। গাওর এলাকায় অবস্থিত বলে এলাকাটি খুবই শস্য-শ্যামল। এখানে নানা ফলের বাগান দেখতে পাই। এমনকি এখানকার ফলের দোকানে পাপতিয়াও দেখতে পাই। অথচ আমাদের ধারণা ছিলো, তা বুঝি এখানে পাওয়া যায় না।

ইখওয়ানের মাদরাসা

আরীহার কাছেই আছে ফিলিস্তিনি মুহাজিরদের একটা বিরাট শিবির। ১৯৫৬ সালে আমরা যখন এপথ দিয়ে যাই, তখনও এ শিবিরটি ছিলো বেশ জমজমাট। তখন শিবিরটি ছিলো তাঁবুর, আর বর্তমানে এটি পরিণত হয়েছে ঝুপড়িতে। শিবিরের নিকটেই রয়েছে একটা মাদ্রাসা। ফিলিস্তিনি শহীদদের শিশুদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এ মাদ্রাসাটি পরিচালনা করছে ইখওয়ানুল মুসলেমুন। এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাকে ইখওয়ানের এক গুরুত্বপূর্ণ গঠনমূলক কাজ বলা যায়। এখানে কেবল শহীদদের সন্তানদের ইসলামী শিক্ষাই দেয়া হয় না, বরং মুজাহিদ হিসেবেও তাদের গড়ে তোলা হয়। আমরা ঘন্টা খানেক এ মাদ্রাসায় কাটাই। এ সময় একটা ছোট শিশু জিহাদ সম্পর্কে একটা উদ্দীপনামূলক কবিতা পাঠ করে শুনায়। অন্যান্য শিশুরা বন্দুক চালনার মহড়াও দেখায়। আমরা মাদ্রাসার জন্য ২৫ পাউন্ড দান করি। এসব ক্ষেত্রে পাকিস্তানি পর্যটকদের বৈদেশিক মুদ্রার অপ্রতুলতার জন্য মাথা কুটে মরতে হয়। আমাদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা থাকলে আমরা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ এ মাদ্রাসায় দান করতে পারতাম। আর এখনতো ২৫ পাউন্ড দান করতেও আমাদের হিমশিম খেতে হচ্ছে আর মনে মনে লজ্জিত হতে হচ্ছে যে, মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ আমাদের পাকিস্তানিদের সম্পর্কে কি ধারণা করবেন।

www.pathagar.com

ইখওয়ানের প্রশিক্ষণ শিবির

মাদ্রাসা দেখার পর আমরা মৃত সাগরের তীরে একটা শিবির দেখতে যাই। জর্দান এবং ফিলিস্তিনের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত ৪০/৫০ জন ইখওয়ানের নওজোয়ান ছিলো এ শিবিরে। জানা যায়, এরা মাঝে মাঝে স্থানে স্থানে ৩/৪ দিনের এরকম প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করে। এ সব শিবিরে সমানভাবে ইবাদত এবং জিহাদ বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকে। এভাবে কয়েক দিন জেহাদী জীবনের প্রশিক্ষণ নিয়ে এসব নওজোয়ান গৃহে ফিরে যায়। এ ধরণের প্রশিক্ষণ শিবিরে জর্দানের বিভিন্ন অঞ্চলের নওজোয়ানরা অংশগ্রহণ করে। 'আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ' ধ্বনি দিয়ে এখানে আমাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। এখানে তাদের জীবনচিত্র দেখে আমরা রীতিমত অভিভূত হয়ে পড়ি। আমরা নিজেদের আবেগ সংবরণ করতে পারিনি, পারিনি অশ্রুধারা রোধ করতে। অবস্থাপন্ন পরিবারের শিক্ষিত তরুণরা বিরান প্রান্তরে উন্মুক্ত আকাশের নিচে রাত কাটাচ্ছে ইসলামী জীবনের প্রশিক্ষণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে। এখানেই তাদের নামায এবং দারস ও প্রশিক্ষণের স্থান। একটা উঁচু বাঁশের আগায় উড়ছে ইখওয়ানের পতাকা। পতাকায় খচিত তরবারী ও কুরআন মজীদ দর্শক মনে সৃষ্টি করে বিরাট উদ্দীপনা। শিবিরে নওজোয়ানদের সাথে আমরা এশার নামায আদায় করি। নামায শেষে মাওলানা এদের উদ্দেশ্যে নসীহত এবং দোয়া করেন। অতঃপর আমরা বাইতুল মাকদেসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করি। ওস্তাদ আবদুর রহমান খলীফা এ যাবৎ আমাদের সাথে ছিলেন। তিনি আর আগে যাননি।

আল-কুদসে মুতামারে ইসলামীর সম্বর্ধনা সভা

তিনটা নাগাদ আমরা বাইতুল মাকদেসে পৌঁছি। ওস্তাদ কামেল শরীফ এবং মুতামারে আলমে ইসলামীর অন্যান্য কর্মীরা অধীর আগ্রহে আমাদের প্রতীক্ষায় ছিলেন। আমাদের বিলম্ব দেখে তারা বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। কারণ, বিকেল চারটায় হোটেল যাহরায় মাওলানার সম্মানে এক সম্বর্ধনা সভা। এ সম্বর্ধনা সভায় বাইতুল মাকদেসের কমিশনার, পৌরসভার প্রধান, প্রধান বিচারপতি, সেনাবাহিনীর কমান্ডার, শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। আল-খালীল, নাবলুস এবং অন্যান্য স্থান থেকেও লোকেরা এ সম্বর্ধনা সভায় যোগ দেন। সম্বর্ধনা সভায় ওস্তাদ কামেল শরীফ মাওলানাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে স্বাগত ভাষণ দেন। সম্বর্ধনার জবাবে মাওলানা ফিলিস্তিনসহ আরবদের অন্যান্য সমস্যার ব্যাপারে পাকিস্তানের জনগণের মনোভাব এবং সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

www.pathagar.com

কুদসবাসীদের ধর্মীয় এবং নৈতিক অবস্থা

আমরা মাগরিব এবং এশার নামায বাইতুল মাকদেস মসজিদে আদায় করি। মসজিদে নামাযীদের সংখ্যা নগন্য দেখে আমরা বিস্মিত ও ব্যথিত হয়েছি। আমাদের দেশের একটা সাধারণ মসজিদও এরচেয়ে বেশি মুসল্লী উপস্থিত হয়। যেন স্থানীয় জনগণের মনে বাইতুল মাকদেস মসজিদের কোনো গুরুত্বই আর নেই। মাথার উপর চেপে বসা ইহূদীদের আতংকও যেনো তাদের মনে খোদার ভয় সৃষ্টি করছে না। হাটটা-কাটটা নওজোয়ান আর সুস্থ-সবল ব্যক্তিদের দেখেছি মসজিদের আঙ্গিনায় বসে খোশ গল্পে লিপ্ত, অথচ তখন মসজিদে জামায়াত হচ্ছে। সম্ভবত এ নাফরমানীর শাস্তি দেয়ার জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাদের ঘাড়ে ইহূদীদের চাপিয়ে দিয়েছেন। আশ-পাশের খ্রিষ্টানদের তুলনায়ও এরা অপমান আর লাঞ্ছনার জীবন যাপন করছে।

বাইতুল মাকদেস শহরটি দু'ভাগে বিভক্ত। আধুনিক ধারায় নির্মিত বৃহৎ অংশটি ইহূদীদের দখলে। ক্ষুদ্র এবং প্রাচীন অংশটি যেখানে মুসলমান এবং খ্রিস্টানদের অনেক পবিত্র নিদর্শন রয়েছে- মুসলমানদের দখলে আছে।

মুসলিম অধিকৃত এলাকাটি তিন দিক থেকে ইহূদীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত। মধ্যখানে রয়েছে নো ম্যানস ল্যান্ড, যা কোনো কোনো স্থানে ৫০-৬০ গজ চওড়া। কিন্তু অধিকাংশ স্থান ২০-৩০ গজের বেশি নয়। তাই আরবদের সাথে ইহূদীদের গুলী বিনিময় নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। আরব এলাকায় মুসলমানদের সাথে যেসব খৃষ্টানরা বাস করে, অর্থের জোরে এবং পাশ্চাত্যের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে তারাও দিন দিন মুসলমানদের বাড়ি-ঘর, জায়গা-জমি দখল করে নিচ্ছে। গোটা বায়তুল মাকদেস মুসলিম শূন্য করার পরিকল্পনা তাদের বহু পুরাতন। বর্তমানে এখানে মসজিদে আকসা ছাড়া মুসলমানদের আরো দু'চারটি মসজিদ হয়তো থাকতে পারে, কিন্তু খ্রিষ্টানদের সেখানে রয়েছে বারটি গীর্জা। রাতদিন তীব্র গতিতে চলছে তাদের প্রচার কার্য। বাইতুল মাকদেসের মুসলমানরা নিজেদের চোখেই এসব কিছু দেখছে, বরং বিদেশী পর্যটকদের কাছে এর বর্ণনাও দিচ্ছে। অথচ তাদের ধর্মীয় ও নৈতিক অবস্থার কথাতো আমি আগেই উল্লেখ করেছি। আল্লাহ্ এদের প্রতি রহম করুন!

এখানে এক রাত অবস্থান করে পরদিন ৫ জানুয়ারি আমরা বাইতুল লহম এবং আল-খালীলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য আল-খালীল থেকে এসেছিলেন ইখওয়ানের জনাব মুস্তফা আবদুন নবী।

বাইতুল লাহম

বাইতুল মাকদেসের দক্ষিণে কয়েক মাইল দূরে বাইতুল লহম একটা ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান (খ্রিস্টানরা যাকে বলে বেথেলহাম)। এখানে হযরত ঈসা

www.pathagar.com

আলাইহিস সালামের জন্ম হয়েছিল। বর্তমানে এখানে একটা বিশাল গীর্জা নির্মাণ করা হয়েছে। সারা দুনিয়ার মুসলমান যেমন হজ্ব ও যিয়ারতের জন্য মক্কা মদীনা এসে থাকে, তেমনি সারা বিশ্বের খ্রিস্টানগণ এখানে আসে। আমরা গীর্জার ভেতরে প্রবেশ করে সেই গুহাটি দেখেছি যেখানে হযরত ঈসা (আ)-এর জন্ম হয়েছিল। গুহার কাছেই এক কোণে একখানা পাথর আছে, তাতে একটি ছিদ্রও আছে। আমাদের জানান হয় যে, এখানে ছিলো সেই খেজুর গাছটি, যার সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে যে, ফিরিশতারা হযরত মারইয়াম (আ)-কে বলে, এ খেজুর গাছের ডালে নাড়া দাও, পাকা খেজুর পাবে। আমরা অবাক হচ্ছিলাম এই ভেবে যে, এতো শীতল স্থানে খেজুর গাছ কি করে জন্মায় কিন্তু জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম যে, এখানে কোথাও কোথাও এখনও খেজুর গাছ আছে। আল-খালীল পৌঁছে স্বচক্ষে খেজুর গাছ দেখে আমরা নিশ্চিত হয়েছি। এ গীর্জায় খ্রিস্টানরা শির্কের চরমে পৌঁছেছে। হযরত ঈসা (আ)-এর কথিত জন্মস্থানে তাঁর একটা শৈশবকালের মূর্তি নির্মাণ করে রেখেছে। এর নিকটেই আর একটি পিঙ্গুরায় একটা শিশুর মূর্তি বানিয়ে রাখা হয়েছে। আমাদের সাথে যে খ্রিস্টান গাইড ছিলো, সে এ সব মূর্তিকে আমাদের সামনেই সেজদা করেছে। এ গীর্জায় খ্রিস্টানদের বিভিন্ন ফির্কার পৃথক পৃথক অংশ আছে। আর প্রটেস্টান্টদের একেবারে অচ্ছুৎ-অস্পৃশ্য করে গীর্জার বাইরে আঙ্গিনায় স্থান দেয়া হয়েছে, যেখানে তারা বছরে একবার মাত্র উপাসনা করতে পারে।

আল-খালীল

বাইতুল লহম দেখে আমরা আল-খালীল যাই। বায়তুল মাকদেস থেকে এর দূরত্ব ২০/২১ মাইল। এ শহরের প্রাচীন নাম হাবরুন। চার হাজার বছর আগে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন এখানে আসেন, তখনও শহরটি আবাদ ছিলো। এটা হচ্ছে বিশ্বের প্রাচীনতম শহরগুলোর অন্যতম। এখানে আমরা হযরত ইবরাহীম (আ) এবং তাঁর পরিবারবর্গের কবর যিয়ারত করি। আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের যেসব কবর সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কবর তার অন্যতম। এখানে মূল কবরগুলো একটি গুহার ভেতরে। সেখানে তিনটি পথ আছে, সবগুলোই বন্ধ। গুহার উপরে নির্মিত হয়েছে একটা আলীশান ইমারত। ইমারতের একাংশে মসজিদ আছে গুহার বরাবর উপরে। এখানে হযরত ইবরাহীম, হযরত সারা, হযরত ইসহাক, হযরত ইয়াকুব এবং হযরত ইউসুফ আলাইহিমুস সালামের কবর আছে বলে কথিত। আসল কবর তো ভেতরে। তা দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু উপরে এবং মসজিদের ভেতরে কবরের আকার করে রাখা হয়েছে নিচে কবর বুঝবার জন্য। হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত সারার (আ) কবরতো প্রমাণিত। অন্য কবরগুলো সম্পর্কে নিশ্চিত করে বলা যায় না।

www.pathagar.com

মাকামে লূত (আ)

আমরা এই মসজিদে যোহরের নামায আদায় করে জনাব মুস্তফা আব্দুন নবীর বাসায় খাওয়া দাওয়া সেরে হযরত লুত আলাইহিস সালামের স্থান দেখতে যাই। এই স্থানটি আল-খালীলের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে লূত সাগরের নিকটে অবস্থিত। এখানে একটা পাহাড়ের উপর হযরত লূত আলাইহিস সালামের কবর রয়েছে, যার উপর একটা মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। এখন এ স্থানটিকে বলা হয় আবূ নুয়াইম। প্রাচীনকাল থেকে এখানে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, লূত জাতির ধ্বংসের পর তিনি এখানে চলে আসেন। এটা যুক্তিযুক্ত বলেও মনে হয়। পাহাড়ী এলাকা থেকে সামনেই লূত সাগর দেখা যায়। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে তিনি নিজ এলাকা ছেড়ে এ অঞ্চলে চলে এসে থাকবেন। কারণ, তাঁর চাচা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম নিকটে আল-খালীলেই ছিলেন।

বিবিসি'র জন্য সাক্ষাতকার

মাগরিবের নামাযের পর আল-খালীল থেকে আমরা বায়তুল মাকদেসে ফিরে আসি। এ রাতে জর্দানে বিবিসি'র (British Broadcasting Corporation) প্রতিনিধি আমাদের হোটেলে আসেন এবং আরবি ভাষায় মাওলানার সাক্ষাতকার রেকর্ড করেন। বিবিসি লন্ডনের আরবি অনুষ্ঠানে এক সপ্তাহ পর সাক্ষাতকারটি প্রচারিত হয়। সাক্ষাতকারটি ছিলো নিম্নরূপ ঃ

প্রশ্ন ঃ আপনার জর্দান আগমনের উদ্দেশ্য কি?

উত্তর ঃ আমার এ সফরের উদ্দেশ্য হচ্ছে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের নিদর্শন এবং কুরআন মজীদে যেসব জাতির উল্লেখ রয়েছে, তাদের নিদর্শনসমূহ স্বচক্ষে দেখা। বর্তমানে আমি কুরআন মজীদের একটা তাফসীর লিখছি। এ তাফসীর লেখার প্রস্তুতিকালে আমি অনুভব করি কুরআন মজীদে যেসব স্থানের উল্লেখ রয়েছে, তা স্বচক্ষে না দেখে কুরআন কারীমের অনেক স্থানই ভালভাবে বুঝা যায় না। এজন্যই আমার এ সফর। এ উপলক্ষে আমি মক্কা, তায়েফ, বদর, মদীনা মাদায়েনে সালহ, তবুক এবং মাগায়েরে সালেহ দেখে এসেছি। জর্দান এবং ফিলিস্তিনের নিদর্শনাদি দেখার পর সিনাই উপত্যকায় যাওয়ার ইচ্ছা রয়েছে।

প্রশ্ন ঃ পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে আমরা অনেক শুনে থাকি এবং পড়েও থাকি। এ সম্পর্কে আপনি কি আমাদের কিছু বলবেন?

উত্তর ঃ বর্তমানে পাকিস্তানের সামরিক শাসক জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ করে রেখেছে। একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে কার্যত ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আজ থেকে ১৯ বছর আগে এ জামায়াত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইসলাম যাতে কেবল কিতাবের পাতায় সীমাবদ্ধ না থেকে ইসলামের সকল দিক এবং বিভাগ

www.pathagar.com

যেন বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, এটাই এ জামায়াত প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যের জন্য আমি এখন ব্যক্তিগতভাবে কাজ করছি। আশা করি অন্যরাও ব্যক্তিগত পর্যায়ে কাজ করে থাকবেন।

প্রশ্ন ঃ আরবি ভাষায় আপনার কতটি গ্রন্থ রয়েছে, এ সম্পর্কে আপনি কি আমাদের কিছু বলবেন?

উত্তর ঃ এ পর্যন্ত আরবি ভাষায় আমার কুড়িটির বেশি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে আল-হিজাব, আল-রিবা, মাবাদিউল ইসলাম এবং উসুসুল ইকতিসাদ বাইনাল ইসলাম ওয়ান নাযমিল মুয়াসিরাহ (ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সূরা নূর এর তাফসীর প্রকাশের পথে।

প্রশ্ন ঃ আরব এবং দুনিয়ার অন্যান্য মুসলমানদের সমস্যা সম্পর্কে আপনার কতোটুকু আগ্রহ রয়েছে? বিশেষ করে ফিলিস্তিন সমস্যা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

উত্তর ঃ আমার কাছে আরবদের সমস্যা আর মুসলমানদের সমস্যা ভিন্ন ভিন্ন নয়। আমরা সেগুলোকে মুসলিম জাহানের অভিন্ন সমস্যা বলে মনে করি– তা আরব দেশের সমস্যা হোক, বা পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া কিংবা অন্য কোনো দেশের সমস্যা হোক। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ফিলিস্তিন সমস্যা কেবল আরবদের সমস্যা নয়, বরং তা গোটা মুসলিম জাহানের সমস্যা। ফিলিস্তিন সমস্যাকে আরবদের সমস্যা বলে চিহ্নিত করার অর্থ তাকে দুর্বল করা।

প্রশ্ন ঃ আপনার দেশ পাকিস্তানে আরবি ভাষা কি গতিতে বিস্তৃত হচ্ছে?

উত্তর ঃ আরবি ভাষা কুরআন-সুন্নাহর ভাষা। তাই মুসলমানরা সর্বদা এ ভাষা শেখার উপর গুরুত্ব দিয়ে আসছে। আমাদের দেশে এমন হাজার হাজার মাদ্রাসা আছে, যেগুলোতে আরবি ভাষা, তাফসীর, হাদীস এবং ফিকাহ শিক্ষা দেয়া হয়। এ ছাড়াও আমাদের দেশের স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়েও আরবি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা দিন দিন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাইতুল মাকদাসের নিদর্শন

পরদিন গোটা দিনটাই আমরা কাটিয়েছি বাইতুল মাকদাসের নিদর্শন দেখার কাজে। মসজিদে সাখরাহ এবং মসজিদ আকসার বিস্তারিত নিরীক্ষণ করার মাধ্যমে এ কাজ শুরু হয়। বাইতুল মাকদাসের ওয়াক্‌ফ প্রধান জনাব হাসান আবুল ওয়াফা এ ব্যাপারে আমাদের বিরাট সাহায্য করেন। তিনি আমাদের সাথে দিয়েছেন মসজিদে সাখরার মেরামত কাজে নিয়োজিত একজন ইঞ্জিনিয়ারকে। তিনি আমাদের তন্নতন্ন করে মসজিদে সাখরা দেখান। ইঞ্জিনিয়ার জানান, এ মেরামত কাজ কয়েক বছর ধরে চলবে এবং এতে মোট আনুমানিক ব্যয় ধরা

www.pathagar.com

হয়েছে ৫ লক্ষ পাউন্ড। এরপর আমরা মসজিদে আকসা দেখতে যাই, যেখানে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে মামলা চলেছিল। খ্রিস্টানরা এখানে এক বিরাট গীর্জা নির্মাণ করেছে। গীর্জার অভ্যন্তরে যেখানে পুন্তস পিলাতিসের আদালত ছিলো তা এখনও বর্তমান আছে একটু নিচু স্থান হিসেবে। রোমকদের শাসনকাল থেকে এখানে একখানা পাথর আছে। এ স্থানটি দেখার পর আমরা যেই পথে অগ্রসর হই সে স্থান সম্পর্কে কথিত আছে যে, আদালত থেকে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্তির পর হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ফাঁসি কাষ্ঠ কাঁধে নিয়ে ফাঁসির নির্দিষ্ট স্থানের দিকে যান। কথিত আছে যে, এ পথে যাওয়ার সময় হযরত ঈসা (আ) ১২টি স্থানে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নেন। এসব জায়গায় খ্রিস্টানদের নানা উপদল গির্জা নির্মাণ করে রেখেছে। এ পথে আমরা আল-কিয়ামা গির্জায় যাই। খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুযায়ী এখানে হযরত ঈসা (আ) শূলীবিদ্ধ হন এবং তাঁকে দাফন করা হয়। অবশ্য আমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী এখানে তাঁর আকৃতির অপর এক ব্যক্তিকে শূলীবিদ্ধ করা হয়, হযরত ঈসাকে (আ) আল্লাহ পাক উঠিয়ে নেন। এখানে নির্মিত বিশাল গির্জা খ্রিষ্টান জগতের কিবলার মর্যাদায় অভিষিক্ত। এখানেও খ্রিষ্টানদের বিভিন্ন দল উপদলের জন্য পৃথক পৃথক স্থান নির্দিষ্ট রয়েছে। এসব স্থানে তারা পৃথক পৃথকভাবে উপাসনা করে। এর নিকটেই রয়েছে সেই মসজিদ, বাইতুল মাকদাস বিজয়কালে হযরত উমর (রা.) যেখানে নামায আদায় করেছিলেন। খ্রিস্টান জগৎ আজও একথা অকপটে স্বীকার করে যে, বাইতুল মাকদাস বিজয়ের পর উমর (রা.) এ গির্জায় এলে পাদ্রীরা তাকে সেখানেই নামায আদায় করতে অনুরোধ জানালে তিনি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এই বলে ঃ "আমি এখানে নামায আদায় করলে কোনো সময় মুসলমানরা এ গির্জাকে মসজিদে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করতে পারে।" এ কারণে তিনি গির্জার বাইরে এসে এক স্থানে নামায আদায় করেন। সেখানে বর্তমানে মসজিদে উমর নির্মিত হয়েছে। ক্রুসেডের লুট-পাট কালে খ্রিষ্টানরা এ অনুগ্রহের প্রতিদান দিয়েছে আর ইংরেজ এবং মার্কিনীরা ফিলিস্তিনে এর যে প্রতিদান দিচ্ছে তা সকলের সামনেই রয়েছে! এ গির্জার ব্যাপারে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন কাল থেকে একটি মুসলিম পরিবারের হাতে রয়েছে এর চাবি। কারণ, খ্রিস্টানদের নানা দল-উপদল এ গির্জার চাবি কার হাতে থাকবে, এ ব্যাপারে একমত হতে পারেনি। অবশেষে তারা সকলে একমত হয়ে এ দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে একটি মুসলিম পরিবারের হাতে। উত্তরাধিকার সূত্রে এ পরিবারটি এখনও এই চাবি সংরক্ষণ করে আসছে। পরিপূর্ণ ইনসাফের সাথে এ পরিবারটি সকল দলের জন্য দরজা খোলে, বন্ধ করে, কারো প্রতি অবিচার যে করা হয়নি তার সাক্ষ্যও মেলে তাদেরই কাছ থেকে।

www.pathagar.com

ফিলিস্তিন জাদুঘর

বাইতুল মাকদাস এমন এক শহর, যার প্রতিটি ইটের রয়েছে একটা ইতিহাস। বিস্তারিতভাবে এর সকল নিদর্শন দেখার এতো সময় আমাদের ছিলো না। উপরে উল্লেখিত নিদর্শন দেখার কাজেই লেগে যায় আমাদের একটা দিন।

৭ জানুয়ারির অর্ধ দিন ব্যয় হয় ফিলিস্তিন জাদুঘর দেখার কাজে। এ পুণ্যভূমির সুপ্রাচীনকাল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত সকল নিদর্শনই রক্ষিত আছে এখানে। ১৯৪৭ সালে লুত সাগরের নিকট 'খিরবত কামরান' নামক স্থান থেকে উদ্ধারকৃত প্রাচীন শীলালিপিটিও এখানে আছে। এ শীলালিপিটি খ্রিস্টপূর্ব ও পরবর্তী একশত বছর কালের। এটি আবিস্কারের ফলে খ্রিষ্টান জগতে হৈ-চৈ পড়ে গেছে। এর পাঠোদ্ধার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন একজন বিশেষজ্ঞ। এতে যদি এমন কিছু উপাদান পাওয়া যায়, যা বর্তমান খ্রিষ্টানদের শিকড় কেটে দেয় এই চিন্তা করে খ্রিষ্টান জগৎ অস্থির।

আম্মান প্রত্যাবর্তন

এ দিন বিকেল নাগাদ আমরা আম্মান ফিরে আসি। ফিরে আসি একটা নতুন পথে। জর্দান সরকার সম্প্রতি এ রাস্তাটি নির্মাণ করেছেন আম্মানের সাথে ফিলিস্তিনের অন্যান্য শহরের সরাসরি যোগাযোগের জন্য। এ রাস্তাটি নির্মাণের ফলে আম্মানের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু বাইতুল মাকদাসের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। ইহূদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর এ অঞ্চলে বাইতুল মাকদাসের গুরুত্ব ছিলো দামেস্ক এবং বৈরুতের পর সবচেয়ে বেশি। আগে এখানে রেলওয়ে স্টেশনও ছিলো। দামেস্ক এবং কায়রোর সাথে ট্রেন যোগাযোগও ছিলো। এ ছাড়াও ছিলো সড়ক যোগাযোগ। ইহূদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর এটা কেবল মুসলিম অধিকৃত ফিলিস্তিনের কেন্দ্রীয় শহর হিসেবে বর্তমান ছিলো। কিন্তু নতুন সড়কটি নির্মাণের ফলে এ গুরুত্বও শেষ হয়ে গেছে। ফলে বাইতুল মাকদাসের জনসংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে আর আম্মানের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাইতুল মাকদাস যেন আপন-পর সকলেরই অবহেলার শিকার হয়ে চলেছে। আমরা আম্মান ফিরে এলে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের ভীড় আরও বৃদ্ধি পায়।

আম্মানের ইসলামিক কলেজ

৮ জানুয়ারি সকালে আমরা আম্মান ইসলামিক কলেজ দেখতে যাই। ছাত্রদের আধুনিক শিক্ষার সাথে সাথে ইসলামী শিক্ষার ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে স্থানীয় ইখওয়ান কর্মী এবং অপরাপর ইসলামপ্রিয় ব্যক্তিরা এ কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এক বিরাট এবং সফল কলেজ এটি। এর ছাত্র সংখ্যা অন্যান্য কলেজের তুলনায় বেশি বৈ কম নয়। কলেজের মাঝখানে একটা সুন্দর মসজিদও নির্মাণ করা

www.pathagar.com

হয়েছে। তখন কলেজ বন্ধ ছিলো। আমরা বিভিন্ন কক্ষ ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম, দেখছিলাম এর সুন্দর ব্যবস্থাপনা। সবশেষে ইখওয়ানের বন্ধুরা আমাদের একটা কক্ষে নিয়ে যায়, যেখানে ছাত্রদের চিত্রাংকন শিক্ষা দেয়া হয়। এখানে দেওয়ালে হযরত উমর, হযরত আলী এবং অপরাপর সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের কল্পিত ছবি লটকান ছিলো। এ ছবিগুলো ছাত্রদের নিজেদের হাতে আঁকা। এ ছবিগুলো দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছিলাম যে, আরবের আলিম সমাজ ছবিকে জায়েয বলে অভিহিত করে যে ফিতনা সৃষ্টি করেছেন, ইখওয়ানের মতো নিষ্ঠাবান এবং ইসলামী আন্দোলনের পতাকাবাহীরাও তা থেকে বাঁচতে পারেনি। ব্যাপারটি সাহাবায়ে কেরামের কল্পিত ছবি পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে। যারা আমাদের সাথে ছিলেন, মাওলানা তাদের খুবই লজ্জা দেন এবং বলেন, এখন কেবল মহানবী (স.)-এর সত্ত্বাই আপনাদের চিত্রাংকন শিল্প থেকে রক্ষিত আছে। বিষয়টি যদি এভাবে চলতে থাকে তবে একদিন আপনারা এ সীমাও অতিক্রম করে যাবেন, তাতে আর বিস্মিত হওয়ার কি থাকতে পারে? মিসর, সিরিয়া এবং জর্দানকে লক্ষ্য করেই মাওলানা এ উক্তি করেছেন। ইরান এবং ইরাকে তো এ সীমা কবেই অতিক্রম করা হয়েছে। ১৯৫৬ সালে আমরা যখন ইরান হয়ে আসছিলাম, তখন তেহরানের ঘরে ঘরে, হোটেলে দফতরে এক দিকে হযরত আলী (রা.) আর অন্য দিকে ইরানের বাদশাহর ছবি লটকানো দেখেছি। কোনো কোনো দফতরে তো রাসূলুল্লাহ (স.) এবং হযরত ফাতিমা (রা.)-এর কল্পিত ছবিও দেখেছি। জানিনা, অতঃপর আর কোন্ সীমা বাকী রয়েছে যা অতিক্রম করার পর বলা যাবে যে, ছবি মোবাহ্ করার ফিতনা এখানে এসে শেষ হয়েছে। অবশ্য মাওলানার কথায় এরা খুবই লজ্জিত হয়েছে এবং ছবিকে মোবাহ বলা যে একটা বিরাট ফিতনা, তা তাঁরাও স্বীকার করেছেন। কিন্তু ফিতনা থেকে নিজেদের এবং অন্যদের বিরত রাখার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে কি-না, তা বলা যায় না।

ওস্তাদ ইউসুফ আল আযম

এদিন ছিলো শুক্রবার। ওস্তাদ আযম যে মসজিদে জুমার নামায পড়ান, আমরা সেই মসজিদেই জুমার নামায আদায় করি। আগেও উল্লেখ করেছি যে, জর্দানে খ্রিষ্টান মিশনারীদের তৎপরতাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ফিতনা। তাঁর খোতবার বিষয়বস্তু ছিলো এটাই। ওস্তাদ ইউসুফ আযম একজন হৃদয়বান এবং উদ্দীপ্ত যুবক এবং উঁচুস্তরের বক্তা। আযহারের শিক্ষাপ্রাপ্ত এ তরুণ ইসলামিক কলেজের শিক্ষক। দাওয়াতের কাজে তাঁকে ওস্তাদ আব্দুর রহমান খলীফার দক্ষিণ হস্ত বলা যায়। জর্দানে খ্রিষ্টানদের প্রভাব-প্রতিপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে তার জুমার খোতবা ছিলো বিস্ময়কর এবং সাহসিকতাপূর্ণ। সত্যি বলতে কি, জর্দানে ইখওয়ানুল

www.pathagar.com

মুসলেমুনই একমাত্র সুসংগঠিত দল যারা খ্রিষ্টান মিশনারীদের তৎপরতার মোকাবিলা করতে পারে এবং করছেও।

ইখওয়ানের সাপ্তাহিক বৈঠক

জুমার পর আমরা ইখওয়ানের দফতরে যাই। জানতে পারলাম, প্রতি শুক্রবার কোনো দাওয়াতী কর্মসূচি নিয়ে তারা এভাবে বৈঠকে মিলিত হয়। বৈঠকে ৪০-৫০ জন যুবক উপস্থিত ছিলেন। তারা মাওলানার নিকট তাদের উদ্দেশ্যে নসীহত করার আবেদন জানান। মাওলানা তাদেরকে তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাওয়ার নসীহত করেন। চৌধুরী সাহেবও নিজেকে সংবরণ করতে পারেননি। তিনিও ইংরেজিতে তার আনন্দ মিশ্রিত আবেগ ব্যক্ত করেন ইখওয়ান এবং তাদের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে। তার বক্তব্যের শুভ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। বৈঠকে আলজিরিয়া সরকারের প্রতিনিধি ওস্তাদ আবদুর রহমানও উপস্থিত ছিলেন। আলজিরিয়ার আজাদী সংগ্রাম সম্পর্কে তিনিও মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

আল-যারকায় দাওয়াত

এরপর আমরা আলযারকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। আম্মান থেকে ৫ মাইল দূরে দামেস্কগামী সড়কে এটি এক গুরুত্বপূর্ণ শহর। ইখওয়ান কর্মী আলহাজ খলিল হাইমুর এখানে মাওলানার সম্মানে এক ভোজের আয়োজন করেন। এতে ইখওয়ান কর্মীরা ছাড়াও আম্মান এবং আলযারকার বিপুল সংখ্যক আলিমও উপস্থিত ছিলেন। ১৯৫৬ সালে জর্দানে আরব জাতীয়তাবাদের যে তেজ দেখেছি, এবার কিন্তু তা অনুভূত হয়নি। তাই এবার এখানকার জনগণকে লক্ষ্য করেছি তারা কাশ্মীর এবং অন্যান্য সমস্যার ব্যাপারে পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতিশীল। খাওয়ার আগে এবং পরে আলোচনাকালে মাওলানা কাশ্মীর সমস্যা ছাড়াও হিন্দুস্তানে মুসলমানদের দুর্দশার করুণ চিত্র তুলে ধরেন। উপস্থিত অনেকের কাছেই ছিলো এসব নতুন তথ্য। আলজিরিয়ার প্রতিনিধি ওস্তাদ আবদুর রহমান এজন্য বিশেষভাবে পাকিস্তানের দুর্বল প্রচারণার অভিযোগ করেন।

মাগরিব নাগাদ আমরা আম্মান ফিরে আসি। পরদিন যেহেতু আমাদের আম্মান ত্যাগ করার কথা তাই আজ বিকেলে বিদায়ী সাক্ষাত প্রার্থীদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায়। মাওলানার সাথে বিদায়ী সাক্ষাতকারের জন্য এতো বেশি লোক আসছিল যে, আমাদের হোটেল কক্ষে স্থান সংকুলান হচ্ছিলো না। আগন্তকদের ভীড়ের পরিপ্রেক্ষিতে ওস্তাদ ইউসুফ আযম এক পর্যায়ে এ নির্দেশও দিয়েছিলেন যে, দশ দশজন যুবক এক সঙ্গে আসবে এবং কিছু সময় অবস্থান করে বিদায় নেবে। ভবিষ্যতে যাতে কর্মীদের প্রশিক্ষণে কাজে লাগানো যেতে পারে, এ উদ্দেশ্যে এখানে মাওলানার একটি সংক্ষিপ্ত উপদেশ এবং কিছু বক্তব্য টেপ রেকর্ড করা হয়।

www.pathagar.com

সরকারি দাওয়াত

পরদিন ৯ জানুয়ারি আমাদের আম্মান ছেড়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু হঠাৎ সকালে খবর পেলাম, মাওলানার সম্মানে একটা পার্টির আয়োজন করার নির্দেশ দিয়েছেন বাদশা হোসাইন। তাই আমাদের সফর একদিন মুলতবী করতে হয়। সরকারের পক্ষ থেকে শেখ মুহাম্মদ আমীন শানকীতী নাদীল বাদশাহ হোসাইন এর পক্ষ থেকে পার্টির আয়োজন করেন যোহরের পর। জর্দানের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এতে উপস্থিত ছিলেন। দীর্ঘক্ষণ ধরে বিভিন্ন বিষয়ে চিত্তাকর্ষক আলোচনা চলে। মাওলানা উপস্থিত সুধীমণ্ডলীর সামনে পাকিস্তান এবং হিন্দুস্তানের মুসলমানদের সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপন করেন। এখানেও মাওলানা হিন্দুস্তানের মুসলমানদের করুণ অবস্থাকে ইসরাইলে আরবদের করুণ অবস্থার সাথে তুলনা করেন। ইসরাইলে আরবদের অবস্থা সম্পর্কে জর্দানের অধিবাসীদের চেয়ে বেশি কে অবগত আছে। তাই এদের উপর এ উদাহরণের যে প্রভাব পড়তে পারে, তা স্পষ্ট।

আসহাবে কাহাফ-এর গুহা

পরদিন ১০ই জানুয়ারি সকালে আমরা সেই গুহাটি দেখেছি, যার সম্পর্কে স্থানীয় কিংবদন্তি এই যে, আসহাবে কাহাফ এর ঘটনা এখানে ঘটেছিল। গুহাটি আম্মানের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রায় ১২ কিলোমিটার (৭ মাইল) দূরে অবস্থিত। এর নিকটের গ্রামটির নাম রাকীব, আঞ্চলিক ভাষায় জর্দানীরা যার উচ্চারণ করে 'রজীব' বলে। এরা দাবী করে যে, মূলত শব্দটি হচ্ছে রাকীম– "ইন্না আসহাবাল কাহ্‌ফি ওয়ার রাকীম"। রকীম বা রজীব শব্দটি 'রাকীম' শব্দেরই অপভ্রংশ। এ গুহার ভিতরে এতো অন্ধকার যে, উঁকি মেরে কিছুই দেখতে পাইনি আমরা। গুহার উপরে এবং আশ-পাশের স্থানে প্রাচীন কালের পাথুরে ইমারতের নিদর্শন বর্তমান রয়েছে। আর এর দরজাও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এমনভাবে রয়েছে যে, সূর্য উদয় হলে গুহাকে আড়াল করে রাখে।

কুরআন মজীদে আসহাবে কাহাফ এর গুহার যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা যেন এ গুহা সম্পর্কে পুরোপুরি খাটে। কিন্তু স্থানীয় কিংবদন্তি ছাড়া শিলালিপি আকারে সেখানে কিছু বর্তমান নেই, আর জর্দান সরকারের পুরাকীর্তি বিভাগও এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নেয়নি। তাই সত্যি সত্যি আসহাবে কাহাফ এর গুহা এখানে কিনা তা নিশ্চিত করে বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

ইরবাদ

এ দিন আমরা জর্দান ও সিরিয়া সীমান্তবর্তী ইরবাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। এখানে বিরাট জনতা ইখওয়ান কর্মীরা ছিলেন যার অগ্রভাগে- আমাদের সম্বর্ধনা

www.pathagar.com

জানায় এবং আমাদের সেখানে পৌঁছা মাত্রই স্থানীয় একটি স্কুলে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে ইরবাদের কমিশনার, বিচারক, সেনা ও পুলিশ কর্মকর্তা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। বাদশাহ হোসাইন এবং জর্দান সরকারের পক্ষ থেকে স্বাগত ভাষণ দেন কমিশনার। ইখওয়ানের স্থানীয় শাখার দায়িত্বশীল ওস্তাদ মাশহুদ হাসান মাইমুর মাওলানার ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর বহুমুখী কর্মতৎপরতার পরিচয় তুলে ধরেন। মাওলানা তাঁর প্রায় দশ মিনিটের আরবি বক্তৃতায় বাদশাহ হোসাইন ও জর্দান জাতির শুকরিয়া আদায় করেন এবং তাদের সমস্যার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের সহানুভূতির কথা উল্লেখ করেন।

সাহাবীদের কবর যিয়ারত

পরদিন ১১ জানুয়ারি আমরা যেসব স্থান দেখতে যাই, সেখানে হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল, হযরত আবূ উবাইদা ইবনুল জাররাহ, হযরত শুরাহবীল ইবনে হাসনাহ এবং হযরত যিরার ইবনে আসওয়ার রাযিয়াল্লাহু আনহুমের কবর রয়েছে। এসব কবর দেখার জন্য আমাদের ইরবাদ থেকে প্রায় ৫০ মাইল সফর করতে হয় বাইতুল মাকদেসের দিকে। আমরা যে পথে যাই, পাহাড় অতিক্রম করে তা প্রথম হযরত মুয়ায (রা.)-এর কবরে পৌঁছেছে। আর সেখান থেকে জর্দান নদীর পূর্ব তীর ধরে চলে গেছে বাইতুল মাকদাসের দিকে। জর্দান নদীর পশ্চিম তীর ইসরাইলী অধিকারে রয়েছে। আর পূর্ব তীরে সড়কের পাশে রয়েছে মুসলমানদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থান। এখানে রয়েছে এক ঐতিহাসিক স্থান, হযরত উমর (রা.)-এর সময়ে যেখানে সংঘটিত হয়েছিল প্রসিদ্ধ যুদ্ধ। এ সড়কের কয়েক মাইল দূরে রয়েছে অপরাপর সাহাবীদের কবর।

ইয়ারমুক ময়দান

এসব মাযার যিয়ারত শেষে আমরা ইরবাদ ফিরে আসি। কিছুক্ষণ এখানে অবস্থান করে অপর একটি নির্মাণাধীন সড়কে আমরা রওয়ানা হই ইয়ারমুক যুদ্ধ ক্ষেত্র দেখার জন্য। এ স্থানটি ইরবাদ থেকে কয়েক মাইল দূরে উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। মূল ময়দানটি সিরীয় সীমান্তে অবস্থিত। জর্দান সীমান্তের পাহাড়ে দাঁড়িয়ে তা ভালভাবে দেখা যায়। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে এটি দেখি, সেখানে ইয়ারমুক নদী আমাদের এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রের মধ্যখানে ব্যবধান হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। আমরা স্বচক্ষে ময়দানটি দেখছিলাম, কিন্তু এর পরও এতোটা সৌভাগ্যের কথা আমরা বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না। আমাদের বিশ্বাস হচ্ছিলো না যে, আমরা এমন এক ময়দানের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, যেখানে এক দিকে হযরত খালিদ ইবনে অলীদ, হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ প্রমুখ সাহাবীর নেতৃত্বে চল্লিশ হাজার মুসলিম বাহিনী আর অপর দিকে ইয়ারমুক নদীর তীরে যেখানে আমরা

www.pathagar.com

এখন দাঁড়িয়ে আছি– সমবেত হয়েছিল প্রায় দু'লক্ষ রোমক বাহিনী। এখানে হযরত খালিদ বীরত্ব ও রণ-কৌশলের এমন এক নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিলেন, যা শুনে গোটা রোমজগৎ কেঁপে উঠে। এই সেই ঐতিহাসিক স্থান, যে সম্পর্কে আমরা ইসলামের ইতিহাসে পড়ে থাকি যে, মহাবীর খালিদের নেতৃত্বে রোমকদের বিরুদ্ধে বীর বিক্রমে যুদ্ধ চলছিল, এমন সময় তাঁর কাছে খলিফা উমর (রা.)-এর চিঠি এলো যে, তাঁকে পদচ্যুত করে হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহকে (রা.) মুসলিম বাহিনীর সিপাহসালার নিযুক্ত করা হয়েছে।

খলীফার পক্ষ থেকে পদচ্যুতির এ পত্র মহাবীর খালিদের মনে এতোটুকু পরিবর্তন আনেনি। তিনি সমান বীর বিক্রমে যুদ্ধ করছিলেন। পদচ্যুতির পরও তাঁর মধ্যে কোনো পরিবর্তন না দেখে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাবে বলেছিলেন– আমি তো উমরের জন্য যুদ্ধ করছি না, যুদ্ধ করছি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য।

এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী এমন বিজয় লাভ করে, যা সিরিয়া বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। এ বিজয়ের খবর শুনে রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস হেমসে এ প্রসিদ্ধ বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেন ঃ "সালামুন আলাইকে ইয়া সুরিয়া, লা-লিকায়া বাদাহু"–সিরিয়া, তোমাকে জানাই শেষ সালাম। অতঃপর তোমার সাথে আর হবেনা মিলন।' রোমকদের এক লক্ষ বিশ হাজার পদাতিক বাহিনী এ ইয়ারমুক নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েই প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল।

সত্যি বটে, এ ময়দানটি স্বচক্ষে না দেখে ইয়ারমুক যুদ্ধের সত্যিকার অবস্থা অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

যোহরের পর আমরা ইয়ারমুক থেকে ইরবাদ ফিরে আসি। এদিন দুপুরে পৌরসভার মেয়র (রঈসুল বালাদিয়্যাহ) আমাদের জন্য এক ভোজ সভার আয়োজন করেন। শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও এতে উপস্থিত ছিলেন। #

www.pathagar.com

১৪

সিরিয়া ও মিসর

১১-২৮ জানুয়ারি ১৯৬০

১১ জানুয়ারি আসর পড়ে আমরা দামেস্কের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করি। জর্দান এবং সিরিয়া সীমান্তে আমাদের কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি। শুল্ক কর্তৃপক্ষ আমাদের সাথে অত্যন্ত ভদ্রোচিত ব্যবহার করেন। সীমান্তে আমাদের গাড়িও বদল করতে হয়নি, বরং যে গাড়ি নিয়ে আমরা ইরবাদ থেকে এসেছিলাম, সে গাড়ি নিয়েই দামেস্ক পৌঁছি।

দামেস্ক

সীমান্ত থেকে দামেস্কের দূরত্ব ৫১ মাইল। এশা নাগাদ আমরা দামেস্কে পৌঁছি। আমাদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য শহরের বাইরেই অবস্থান করছিলেন শরীয়া কলেজের প্রিন্সিপাল ওস্তাদ মুহাম্মদ মুবারক, শরীয়া কলেজের অধ্যাপক ওস্তাদ মুনতাসির আল-কাত্তানী, ইরাকের নির্বাসিত ইখওয়ান নেতা ওস্তাদ মুহাম্মদ মাহমুদ সাওয়াফ এবং আরও অনেকে। ডঃ মুস্তফা সাব্বায়ী তখন অসুস্থ ছিলেন, তাই আসতে পারেননি। অবশ্য তিনি তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েছিলেন তাঁর ভাইকে।

দামেস্কে খুব বেশি অবস্থানের কর্মসূচি আমাদের ছিলো না। বরং যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব কায়রো এবং সিনাই উপত্যকায় যাওয়াই ছিলো আমাদের ইচ্ছা। কিন্তু এরপরও বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধে এখানে আমাদের তিন দিন– ১২ থেকে ১৪ জানুয়ারি অবস্থান করতে হয়। এসময় অনেকেই মাওলানার সাথে সাক্ষাত করতে আসেন। কলেজের ছাত্ররাও আসে। কিন্তু ১৯৫৬ সালে যে উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে তারা এসেছিল, তা এখন আর নেই। ছাত্ররা বিভিন্ন বিষয়ে মাওলানাকে প্রশ্ন করে, কিন্তু অতি সতর্কতার সাথে এবং রাজনৈতিক বিষয় এড়িয়ে।

দামেস্কে অবস্থানকালে মুখে তালা দেয়ার যে পরিবেশ আমরা লক্ষ্য করেছি, তা পরবর্তীকালে কায়রোর পরিবেশ থেকেও নিকৃষ্ট ছিলো। কায়রোর ছাত্ররা আসছিল অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে আর সকল বিষয়ে এমনকি আরব জাতীয়তাবাদ সম্পর্কেও প্রশ্ন করেছিল। এ বিষয়ে পরে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো। কিন্তু দামেস্কে বুদ্ধিজীবী এবং ছাত্রদের সাথে আলোচনা কালে আমরা সুস্পষ্ট

www.pathagar.com

অনুভব করি যে, কয়েক বছর আগে আরব জাতীয়তাবাদের যে ভূত তাদের ঘাড়ে চেপে বসেছিল, সিরিয়ার গণতন্ত্রমনা জনগণ এখন তা টের পাচ্ছে এবং ধীরে ধীরে তার সুফল অনুভব করতে শুরু করেছে। আমরা এটারও উপলব্ধি করেছি যে, কমিউনিস্টদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তারা মিসরের সাথে ঐক্য স্থাপন করলেও খুব সম্ভব তা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। মিসরীয়দের তুলনায় নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ এবং সুখীসমৃদ্ধ মনে করার ধারণা তাদের আলোচনা থেকেই স্পষ্ট হচ্ছিলো।

দামেস্কে তিন দিন অবস্থান কালে ওস্তাদ মুহাম্মদ মুবারক, ওস্তাদ মুস্তাফা সাব্বায়ী, শেখ বাহজাহ আল-বাইতার এবং অন্যান্য বন্ধুরা মাওলানার সম্মানে ভোজ সভার আয়োজন করেন। এসব ভোজ সভায় শরীয়া কলেজ, দামেস্কের বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য কলেজের অনেক শিক্ষকের সাথেও আমাদের দেখা হয়েছে। শেখ বাহজাহ আল-বাইতারের দেয়া ভোজ সভায় সিরিয়ার মুফতী শেখ আবুল ইয়াসির আবেদীন এবং দামেস্কের অন্যান্য বড় বড় আলিমের সাথেও সাক্ষাত হয়েছে। ওস্তাদ আলী তানতাবী এবং পাকিস্তানে সাবেক সৌদি রাষ্ট্রদূত সাইয়েদ আবদুল হামীদ আল-খতীব* কয়েকবার মাওলানার সাথে হোটেলে সাক্ষাত করতে এসেছেন।

কায়রোর পথে রওয়ানা

১৫ জানুয়ারি সকাল ৮টায় আমরা বিমান যোগে কায়রো রওয়ানা হই। দামেস্কের আশ-পাশে ১৫/২০ মাইল পর্যন্ত চারিদিকে কেবল বাগান আর বাগান। প্রাচীনকাল থেকেই সিরিয়াবাসীরা এজন্য গর্বিত। সিরিয়ার খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক ওস্তাদ কুরদ আলী মরহুম তো এর প্রশংসায় কয়েক শো পৃষ্ঠার গ্রন্থও প্রকাশ করেছিলেন। বিমান থেকে এ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে সত্যি সত্যিই আমাদেরকে রীতিমতো মুগ্ধ হতে হয়েছে। এরপর শুরু হয়েছে লেবাননের পাহাড়ী এলাকা। কোনো কোনো পাহাড়তো রীতিমতো বরফে ঢাকা ছিলো, যেন বরফের পাগড়ি পরে আছে আর কি। আর কোনো কোনোটি দেখাচ্ছিলো সবুজ-শ্যামল বৃক্ষরাজীতে ভরা। কিছুক্ষণ পর বৈরুতের উপর দিয়ে রোম সাগর অতিক্রম করি। এরপর শুরু হয়, মিসরীয় এলাকা, যেখানে নীল-নদ রোম সাগরে মিলিত হওয়ার আগে কয়েকটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে। ভৌগলিক পরিভাষায় যাকে বলা হয় সায়ীদে মিসর– মিসরের সৌভাগ্য। এখানে চারিদিক সবুজ বাগান আর ক্ষেত খামার ছাড়া অন্য কিছু চোখে পড়েনি। বিমান থেকে তো আমাদের মনে হয়েছে, এর সৌন্দর্য দামেস্কের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের চেয়ে কম নয়। নীল নদের উভয় তীরে একটু একটু দূরে দেখা যাচ্ছিল ঘন বসতি। এদিক দিয়ে দামেস্ক থেকে কায়রো

* তাঁর ছেলে ফুয়াদ আবদুল হামিদ আল খতীব বাংলাদেশে সৌদি আরবের প্রথম রাষ্ট্রদূত ছিলেন। –সম্পাদক

www.pathagar.com

পর্যন্ত সফর ছিলো বেশ উপভোগ্য। কিন্তু আমরা যখন কায়রোর নিকটে পৌঁছি, তখন এমন এক ধুলি-ঝড় শুরু হয় যে, আর কিছুই দেখা যাচ্ছিলো না। এর ফলে কায়রো বিমান বন্দর পর্যন্ত পৌঁছতে এবং সেখানে অবতরণ করতেও বেশ অসুবিধা হয়। বিমান থেকে বিমান বন্দর ভবনের দূরত্ব বড়জোর এক ফার্লং। এটুকু দূরত্ব অতিক্রম করতে যে অসুবিধা হয়েছে, তা ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন। আমাদের মাথায়-মুখে যেন রীতিমতো কংকর পড়ছিল আর শিশুদের চিৎকারতো কিয়ামতের দৃশ্যের অবতারণা করছিল।

কায়রোয়

চেকিং ইত্যাদি শেষ করে আমরা বিমান-বন্দরের বাইরে এসে দেখি আমাদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য পাকিস্তান দূতাবাস থেকে একজন এবং আলজিরিয়ার আল্লামা মুহাম্মদ বশীর ইবরাহিমী অপেক্ষা করছেন। কায়রোয় আমরা একেবারেই নবাগত। এরা দু'জন বিমান বন্দরে উপস্থিত না থাকলে কি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হতো বলা মুশকিল। এদের সাথে আমরা শহরে পৌঁছি এবং তাদের পরামর্শক্রমে গ্রান্ড হোটেলে উঠি।

সাক্ষাত ও ভাববিনিময়

কায়রো থেকে সিনাই পর্বতে যাওয়াই ছিলো আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু সিনাই সামরিক এলাকা। সেখানে যাওয়ার জন্য অনেক আনুষ্ঠানিক পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। আর এসব পর্যায় অতিক্রম করার জন্য ১৫ থেকে ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত আমাদের কাটাতে হয় কায়রো। প্রথম দিন তো আমাদের মনে হয়েছিল, এখানে বুঝি আমাদের চেনা-জানার কেউ নেই। কিন্তু বিকাল পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারলাম, আমাদের বন্ধু আর মাওলানার বই পড়া যুবকদের সংখ্যা কায়রোয় কম নয়। দৈনিক আল-ইয়াওম এবং দৈনিক আল-আহরাম পত্রিকায় মাওলানার কায়রো উপস্থিতির খবর প্রকাশিত হয়। এবার যায় কোথায়। খবর পেয়েই ভক্তরা দলে দলে ছুটে আসে হোটেল অভিমুখে। প্রতিদিন দলে দলে এতো লোক আসছিল যে, সকাল থেকে রাত বারটা পর্যন্ত দম ফেলবারও সুযোগ ছিলো না। আগন্তুকদের মধ্যে আলিম, অধ্যাপক, আল-আযহার এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের সংখ্যাই ছিলো বেশি। বিশেষ করে প্রতিদিন আসরের সময় একদল ছাত্র হোটেলে উপস্থিত হতো। রাত ১১টা-১২টায় তাদের উঠে যেতে না বলা পর্যন্ত তারা যাওয়ার নামও নিতো না। আমাদের দেশের ছাত্রদের মতো কোনো রকম প্রশ্নই ছাড়তো না। এরা সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন করছিল আরব জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে। মাওলানাও কারো নামোল্লেখ না করে খোলাখুলি জবাব দিতেন। এ প্রশ্ন তোলার সাহস দামেস্কের ছাত্রদের খুব কমই হয়েছে। তাই আমাদের ধারণা হয়েছে যে, এখানে মানুষের মুখ খোলার কিছু না কিছু স্বাধীনতা

www.pathagar.com

এখনো আছে। কিন্তু সিরিয়বাসীদের এক বিশেষ কর্মসূচির অধীনে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা চলছে।

পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতের দাওয়াত

১৬ জানুয়ারি মাগরিবের নামাযের পর আমরা পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত খাজা শাহাবদ্দীনের সাথে সাক্ষাতের জন্য তার বাসভবন পাকিস্তান হাউসে যাই। পাকিস্তান দূতাবাসের সাংস্কৃতিক কর্মকর্তা আবদুল হামীদ বাজওয়া আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য হোটেলে এসেছিলেন। খাজা সাহেব দীর্ঘক্ষণ মাওলানার স্বাস্থ্য এবং সফর সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন। আরব দেশে কাজ করার জন্য মাওলানা তাকে বেশ মূল্যবান পরামর্শ দেন এবং তিনি সে অনুযায়ী কাজ করার ওয়াদাও করেন। ১৮ জানুয়ারি বিকেলে খাজা সাহেব মাওলানার সম্মানে চায়ের দাওয়াত দেন। এতে সৌদি আরবের সাবেক এবং বর্তমান রাষ্ট্রদূত আল-আযহারের সাবেক রেক্টর আবদুর রহমান তাজসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

আল্লামা বশীর ইবরাহিমীর দাওয়াত

এদিন রাতে আল্লামা মুহাম্মদ বশীর ইবরাহিমী মাওলানার সম্মানে এক ভোজের আয়োজন করেন। এতে মিসর, আলজিরিয়া, এবং মরক্কোর অনেক আলিম এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে বিশিষ্ট মুজাহিদে ইসলাম আমীর মুহাম্মদ আবদুল করীমের ছোট ভাই (মরক্কোয় মিসরের রাষ্ট্রদূত) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে কাইয়্যেদ সাবিক আহমদ শিরবাদী এবং মুহাম্মদ আল-গাযালী প্রমুখের সাথেও আমাদের দেখা হয়।

আলজিরিয়া সরকারের কর্মচারিদের সাথে সাক্ষাত

তখন আলজিরিয়া সরকারের দফতর ছিলো কায়রোয় যখন দেশটি পরাধীন ছিলো। আমাদের সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা ছিলো। কিন্তু জানতে পারলাম যে, বর্তমানে সেখানে কোনো মন্ত্রী নেই। তাই আমরা যাইনি। কিন্তু মাওলানার কায়রোয় অবস্থানের কথা জানতে পেরে দফতরের কর্মচারিরা হোটেলে এসে মাওলানার সাথে দেখা করেন। তাদের কাছে জানতে পারলাম, আলজিরিয়ায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে মাওলানার প্রচুর আরবি কিতাব সেখানে পৌঁছেছে। মাওলানার এসব বই পড়ে অনেকেই প্রভাবিত হয়েছে। মাওলানা তাদের উপদেশ দিয়ে বলেন, আপনারা এ ব্যাপারে বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন যাতে আলজিরিয়ার জনগণকে ফরাসী ঔপনিবেশ থেকে মুক্তিলাভের পর আবার নিজেদের হাত থেকে মুক্তি লাভের সংগ্রাম করতে না হয়। (অনেক মুসলিম দেশেরই এ তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে। দুঃখের বিষয়, আজাদী লাভের পর আলজিরিয়ায়ও এ সত্য বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে। -সম্পাদক)

www.pathagar.com

পিরামিড এবং কায়রো মিউজিয়াম

এ সময় আমরা মিসরের পিরামিড আবু হাওল এবং কায়রো মিউজিয়াম দেখতে যাই। এগুলো এমন জিনিস যা স্বচক্ষে না দেখে বুঝা মুশকিল। এগুলো দেখে সত্যি সত্যি মানুষকে অবাক হতে হয়। কায়রো মিউজিয়ামে সবচেয়ে বড় দর্শনীয় যে জিনিসটি, তা হচ্ছে প্রাচীন রাজা-বাদশাদের মৃতদেহ। তিন-চার হাজার বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও অদ্যাবধি তা অবিকল অবস্থায় আছে। এমনকি তাদের চেহারার আদল এবং মাথার চুলও বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। এগুলোর মধ্যে ফিরাউনের লাশও রয়েছে, মূসা (আ)-এর সময় যে ফিরাউন নীল নদে ডুবে মরেছিল। এ মিউজিয়ামে হাজার হাজার বছরের প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা চোখের সামনে ভেসে উঠে। বিশ্বের অপর কোনো দেশের সভ্যতার নিদর্শন এতো সুষ্ঠু-সুন্দরভাবে সংরক্ষিত আছে বলে মনে হয় না।

আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়

১৯ জানুয়ারি সকালে আমরা জনাব আবদুল হামীদ বাজুওয়াহ্‌র সাথে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে যাই। শায়খুল আযহার শেখ মুহাম্মদ মাহমুদ শালতুত এবং ভাইস চ্যান্সেলর ডা. মুহাম্মদ আলবাহীর সাথে আমরা সাক্ষাত করি। শায়খুল আযহার পূর্বেই মাওলানার কিতাব পড়েছিলেন। তাই দূর থেকে তিনি মাওলানাকে অভিনন্দন জানান। দুঃখের বিষয়, তিনি তখন পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তাই কোনো বিষয়ে তার সাথে মাওলানার বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। ফেরার সময় তিনি আমাদেরকে অত্যন্ত মহব্বতের সাথে তাঁর লিখিত গ্রন্থাবলী উপহার দেন।

এরপর আমরা আযহারের লাইব্রেরিও দেখি। 'মাজাল্লতুল আযহার' (আযহার ম্যাগাজিন) দফতরেও যাই। এর সম্পাদক ওস্তাদ আহমদ হাসান যুবাতের সাথেও দেখা হয়। তিনি তাঁর নিজস্ব পত্রিকা পুনঃ প্রকাশেরও আশা রাখেন।

আনসারুস সুন্নাহ

আমরা বিকেলে জমিয়তে আনসারুস সুন্নাহর অফিসে যাই। রিয়াদে শেখ আব্দুর রায্‌যাক আফীফী এবং অন্যান্য আলিমের সাথে আমরা ওয়াদা করেছিলাম, মিসর পৌঁছলে আনসারুস সুন্নাহর দফতরে যাবো। আমি আগেও উল্লেখ করেছি, আনসারুস সুন্নাহ মিসরে আহলে হাদীসদের সংগঠন। নিজেদের অভিমত প্রকাশে এরা বেশ উল্লেখযোগ্য কাজ করছে। 'আল-হুদান নব বী' নামে তারা একটা মাসিক মুখপত্রও প্রকাশ করে। এ সংগঠনের সভাপতি শেখ আব্দুর রায্‌যাক আফীফী। ইনি স্থায়ীভাবে রিয়াদে থাকেন। সংগঠনের সেক্রেটারি এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা দফতরে ছিলেন। তারা অতি আন্তরিকতার সাথে মাওলানাকে

www.pathagar.com

অভ্যর্থনা জানান এবং তাদের প্রকাশিত গ্রন্থাদি দেখান। এশার সময় হলে তারা মাওলানাকে ইমাম করে তার সাথে নামায আদায় করেন।

কায়রো রেডিও প্রতিনিধির সাথে সাক্ষাতকার

১৯ জানুয়ারি সকালে কায়রোর রেডিও প্রতিনিধি হোটেলে আসেন এবং মাওলানার নিম্নোক্ত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন-

প্রশ্নঃ শুনেছি, অধুনা আপনি কুরআনুল করীমের একটি তাফসীর লিখছেন। কোন্ ভাষায় এ তাফসীর লিখছেন এবং কোন্ লক্ষ্য সামনে রেখে তা লিখছেন?

উত্তর ঃ গত কয়েক বছর থেকে আমি কুরআনুল কারীমের একটি তাফসীর লিখছি। এ তাফসীর লেখায় যে মূল লক্ষ্যটি আমার সামনে রয়েছে তা হচ্ছে আধুনিক শিক্ষিত সমাজকে কুরআন মজীদের মূল বক্তব্য ভালভাবে অনুধাবন করানো এবং তাদের মনে যেসব সন্দেহ সংশয় দেখা দেয়, তা দূর করা। আমি এ তাফসীর লিখছি উর্দু ভাষায়। আরবি, ইংরেজি এবং অন্যান্য ভাষায় এর তরজমা প্রকাশ করার চেষ্টা হচ্ছে। সূরা নূর-এর আরবি তরজমার কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং দামেস্ক থেকে তা প্রকাশের পথে। ইংরেজি তরজমার কাজও শুরু হয়েছে। সিন্ধী এবং বাংলায়ও এর কিছু কিছু অংশ প্রকাশিত হয়েছে।

প্রশ্নঃ আরবি ভাষায় আপনার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা কতো এবং কি কি?

উত্তর ঃ আমার অধিকাংশ গ্রন্থই উর্দুতে। আরবিতে ২০টির বেশি বই প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে আল-হিজাব, আল-রিবা, মাবাদিউল ইসলাম এবং উসুসল ইকতিসাদ-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রশ্ন ঃ পাকিস্তানে কি আরবি মাদ্রাসা আছে? এগুলো সম্পর্কে আপনি কি কিছু বলবেন?

উত্তর ঃ পাকিস্তানে এবং হিন্দুস্তানে হাজার হাজার মাদ্রাসা রয়েছে। এ সকল মাদ্রাসায় আরবি ভাষা এবং কুরআন মজীদ, হাদীস ফিক্হ এবং অন্যান্য ইসলামী বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়। ইংরেজি ঔপনিবেশিক শাসনামলে স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যখন আরবি এবং ইসলামী শিক্ষা বাদ দেয়া হয়, তখন মুসলমানরা নিজ ব্যয়ে এসব মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে আরবি ভাষা এবং ইসলামী তাহযীব জীবন্ত রাখার জন্য। মাদ্রাসাগুলো এখনও এভাবেই চলছে। উপমহাদেশের হাজার হাজার লোক এসব মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত।

প্রশ্নঃ দীরসান্ত কাতরীন যাওয়ার জন্য আপনি মিসর সফরে এসেছেন। সেখান থেকে অপর কোনো দেশে যাওয়ার ইচ্ছা আছে কি?

উত্তর ঃ কায়রোতেই আমার সফর প্রায় শেষ। আমি আগামীকাল 'দীরসান্ত কাতরীন' যাচ্ছি। সেখান থেকে ফিরে এসে দামেস্ক এবং কুয়েত হয়ে দেশে ফিরে যেতে চাই। অন্য কোনো দেশ সফর করার ইচ্ছা আমার নেই।

সাক্ষাতকারটি ঐদিন রাতেই কায়রো বেতারে প্রচারিত হয়।

www.pathagar.com

আরো কয়েকজনের সাথে দেখা-সাক্ষাত

এখানে অবস্থান কালে অন্য যাদের সাথে আমাদের সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ওস্তাদ মুহিব্বুদ্দীন আল খতীব, ওস্তাদ মাহমুদ আহমদ শাকের, শেখ আবু যোহরা, ওস্তাদ মোস্তফা যারকা, ওস্তাদ মালেক ইবনে নাবী, ওস্তাদ মুহাম্মদ কুতুব এবং আহমদ সাইফুল ইসলামের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আরব জাহানের যে গুটি কয়েক ব্যক্তিত্বকে নিয়ে আরব জাহান গর্ব করতে পারে, ওস্তাদ মুহিব্বুদ্দীন খতীব তাঁদের অন্যতম। ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণায় তিনি অথরিটি বলে স্বীকৃত। তিনি কেবল লেখনী দিয়েই সংস্কারের চেষ্টা করছেন না, বরং তিনি নিজে জিহাদে কার্যত অংশ নিচ্ছেন। শিয়া এবং কাদিয়ানী সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর যে ব্যাপক পড়াশুনা রয়েছে, তা গোটা আরব জাহানে আর কারো নেই। তাঁর সাপ্তাহিক পত্রিকা আল-ফাতাহ্-এর মাধ্যমেই শেখ হাসানুল বান্না শহীদ তাঁর দাওয়াতের সূচনা করেন এবং তাঁর পরামর্শক্রমেই মিসরে ইখওয়ানুল মুসলেমুন প্রতিষ্ঠা করেন। মরহুম মাওলানা মাসউদ আলম নদবী, ডক্টর মুস্তফা সাব্বায়ী এবং আরও অনেক ইসলামপ্রিয় সাহিত্যিকের সাহিত্য সাধনার হাতেখড়ি হয়েছে সাপ্তাহিক আল-ফাতাহ এর মাধ্যমে। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত মিসরে মাওলানা মওদূদীর যে সব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল, তা হয়েছিল তাঁরই উদ্যোগে এবং তাঁরই প্রেস থেকে। কোনো কোনো বইয়ের তিনি মূল্যবান ভূমিকাও লিখেছিলেন। শেখ মুহাম্মদ মাহমুদ শালতূত জামে আযহারের রেক্টর নিযুক্ত হওয়ার পুর্ব পর্যন্ত তিনিই ছিলেন আল-আযহার ম্যাগাজিনের সম্পাদক। কিন্তু শেখ শালতূত আল-আযহারের রেক্টর নিযুক্ত হলে সম্পাদকের পদে তিনি ইস্তেফা দেন। কারণ দু'জনের মানসিকতা এবং কর্মধারায় রয়েছে যথেষ্ট বৈপরিত্য। বহু মতের মিলনের জন্য শেখ শালতূত গর্ববোধ করেন এবং তিনি ইসলামী দলগুলোর ঐক্যের তীব্র সমর্থক। এ উদ্দেশ্যে তিনি দারুত তাক্‌রীব বাইনাল মাযহাবিল ইসলামিয়্যা নামে একটা সংগঠনও গড়ে তুলেছেন। অপরদিকে ওস্তাদ খতীব শিয়াদের ঘোর বিরোধী। তিনি বলেন, দারুত তাকরীব হচ্ছে শিয়া ফিকাহ্‌কে সুন্নীদের মধ্যে জনপ্রিয় করার একটা কৌশল মাত্র। তিনি আরও মনে করেন, অন্তত সাহাবায়ে কিরামকে গাল-মন্দ দেয়া থেকে বিরত থাকার পূর্ব পর্যন্ত শিয়াদের সাথে কোনো ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। একদিন বিকেলে আমরা তাঁর কাছে যাই। তিনি দীর্ঘক্ষণ অতীত দিনের স্মৃতি রোমন্থন করেন, ওস্তাদ হাসানুল বান্না শহীদ এবং তাঁর আন্দোলন সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেন। তিনি মাওলানাকে এযাবৎকার কীর্তির জন্য মোবারকবাদ জানান। আর ভবিষ্যতে জিহাদে অটল-অবিচল থাকার জন্য দোয়া করেন। বর্তমানে তাঁর বয়স ৭০/৭৫ বছর। এখনও নীরবে আল মাতবাআতুল সালফিয়্যা প্রেসে কাজ করে যাচ্ছেন। বেশ কয়েক বছর থেকেই

www.pathagar.com

তাঁর পত্রিকা আল-ফাতাহ বন্ধ রয়েছে। অন্য কোনো পত্রিকায়ও চাকুরী করছেন না। তাঁর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় কিছু কিতাব নিয়ে আমরা হোটেলে ফিরে আসি।

ওস্তাদ মাহমুদ আহমেদ শাকের শেখ আহমদ মুহাম্মদ শাকিরের ছোট ভাই। তাঁর আসল বিষয় সাহিত্য হলেও বর্তমানে বড় ভাইয়ের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করায় ব্যস্ত। অধুনা তিনি ইসলাম সম্পর্কেও ব্যাপক পড়াশুনা করছেন। তাঁর সাথে দেখা করার জন্য আমরা তাঁর বাসায় যাই। আলোচনা কালে জানতে পারি, বর্তমানে তিনি তাফসীরে তাবারী সম্পাদনা করছেন এবং 'দারুল মাআরিফ' এর উদ্যোগে এর ১৫টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো তিনি আমাদের উপহারও দেন। আলোচনা ইসলামী আন্দোলন পর্যায়ে গড়িয়ে এলে তিনি অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেন, সংশোধনের একমাত্র উপায় হচ্ছে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি। আমরা তাঁকে বুঝাবার চেষ্টা করি যে, এটা সংস্কার সংশোধনের একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হতে পারে, কিন্তু একমাত্র মাধ্যম নয়। অবশ্য তিনি তাঁর মতে অটল থাকেন, আর আমরা আমাদের মতে। তাঁর সাথে আলোচনা এখানেই সমাপ্ত হয়ে যায়।

শেখ আবু যোহরা এবং ওস্তাদ মুস্তফা যারকার পরিচয় দেয়ার দরকার করে না। ১৯৫৭/৫৮ সালে লাহোর কলোকোয়ামে এদের বক্তৃতা শুনেছেন বা পড়েছেন, এমন লোক তো এদের ভালভাবেই জানেন। শেখ আবু যোহরার বেশ কিছু গ্রন্থ যেমন ইমাম আবূ-হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ইমাম ইবনে তাইমিয়ার প্রথম জীবনী গ্রন্থতো পাকিস্তানের কোনো কোনো প্রকাশক বিনা অনুমতিতেই প্রকাশ করেছেন। এমনিতেই মিসরীয়রা খোশমেজাজ হাসিমুখ। শেখ আবু যোহরার মধ্যে এ গুণটি আরও বেশি পরিস্ফুট। মাওলানার কায়রো উপস্থিতির খবর পেয়েই তিনি আমাদের হোটেলে চলে আসেন এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে মাওলানার সাথে আলাপ করেন ফিকাহর সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে। লাহোর কলোকোয়াম ব্যর্থ হওয়ার পর করাচিতে অনুষ্ঠিত গোপন কলোকোয়ামের কার্যবিবরণী তিনি অনেক মজা করে বর্ণনা করছিলেন। এ নিয়ে তিনি দামেস্কের মাসিক 'হাযারাতুল ইসলামে' বিস্তারিত লিখেছেন। তাই এখানে আর আলোচনা করার দরকার নেই।

ওস্তাদ মালেক ইবনে-নাবী সম্পর্কে আমরা এ প্রথমবার শুনি এবং কায়রোয় তার সাথে সাক্ষাত ও পরিচয় হয়। আসলে তিনি আল জিরিয়ার অধিবাসী। কিন্তু বেশ কিছুকাল তিনি কাটিয়েছেন ফ্রান্সে। তাই পাশ্চাত্য সভ্যতার দোষত্রুটি এবং অশুভ পরিণাম সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত। এ সম্পর্কে মুসলমানদের সতর্ক করার জন্য তিনি কিছু বইও লিখেছেন। তিনি লিখেন ফরাসী ভাষায়। পরে সেগুলো আরবিতে তরজমা করা হয়। যতো সহজে ফরাসী বলতে পারেন, আরবি ততো সহজে পারেন না। দামেস্কের এবং কায়রোয় অনেকের মুখে আমরা তাঁর কিতাবের

www.pathagar.com

তারীফ শুনেছি। এ জন্য কায়রো থেকে আসার আগে আমরা এসব কিতাব কিনেছিও। মাওলানার সাথে তাঁর আলোচনা থেকে আমাদের ধারণা হয়েছে তিনি নিষ্ঠাবান এবং হৃদয়বান ব্যক্তি।

ওস্তাদ মুহাম্মদ কুতুব ওস্তাদ সাইয়্যেদ কুতুব শহীদের ছোট ভাই। বয়সে তাঁর চেয়ে ১২ বছরের ছোট। তার হাতেগড়া একজন ইসলামী সাহিত্যিকও। তাঁর কাছে জানতে পেলাম, ওস্তাদ সাইয়্যেদ কুতুব এখনও জেলে আছেন। তাঁর স্বাস্থ্য খুবই খারাপ হয়ে পড়েছে। অথচ মিসরীয় সরকারের প্রচারণার ফলে একথা ছড়িয়ে পড়েছে যে, তিনি জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন। সত্যিই প্রোপাগান্ডায় মিসর সরকারের জুড়ি নেই। শেখ হাসান-হুদাইবী সম্পর্কে জানতে পেলাম তিনি এখনও গৃহে অন্তরীণ আছেন। আহমদ সাইফুল ইসলাম শেখ হাসানুল বান্না শহীদের পুত্র। ২৫/৩০ বছরের যুবক। অনেক ঝুকি নিয়েও মাওলানার সাথে সাক্ষাতের জন্য দু'বার হোটেলে আসেন। তাঁকে দেখে তাঁর পিতার চেহারা আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তাঁর দিকে তাকিয়ে আমরা চোখের পানি সংবরণ করতে পারিনি। তাঁর নিজের এবং পরিবারের খোঁজ-খবর নেই। আহমদ সাইফুল ইসলাম আইন কলেজ এবং আর্টস কলেজে পড়া-লেখা সমাপ্ত করে বর্তমানে কায়রোয় ওকালতি করছেন।

বন্ধুদের সহযোগিতায় আমরা মিসরের অন্যান্য মুসলমান ভাইদের সম্পর্কেও জানতে পারি। মিসর সরকারের জোর প্রচারণার ফলে জনগণ হয় এদের ভুলে গেছে, অথবা স্মরণ থাকলেও তাদের নাম মুখে নিতে সাহস পায় না। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার যুবক এদের বাণী বক্ষে ধারণ করে অনুকূল পরিবেশের প্রতীক্ষায় রয়েছে। এদের হাজার হাজার লোক এখনও কারাগারে রয়েছে। আর যারা বাইরে আছে, তাদেরকে অর্থনৈতিক দিক থেকে অস্থির রাখার চেষ্টা চলছে। যেখানে এদের কেন্দ্রীয় দফতর ছিলো, একদিন সে পথে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল আমাদের। বর্তমানে সেখানে পুলিশের দফতর বসানো হয়েছে।

মিসর ঃ পাশ্চাত্য ও ফিরাউনী সংস্কৃতির লীলাভূমি

সিরিয়া ও জর্দানে পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং নারী স্বাধীনতার যে চিত্র আমরা দেখতে পেয়েছি, ১৯৫৬ সালে আরব জাহান সফর শেষে মাওলানা তা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, পাঠকবর্গের তা স্মরণ আছে আশা করি। কিন্তু মিসরে পাশ্চাত্য সভ্যতার সর্বগ্রাসী সয়লাব এবং নারী স্বাধীনতার যে চিত্র আমরা দেখতে পেলাম তা এ সব দেশ থেকেও মারাত্মক। কায়রো পৌঁছার আগে আমরা তা কেবল কল্পনাই করতে পারতাম। দামেস্ক এবং আম্মানে অন্তত নেকাব নামে একটা কিছু ছিলো। যদিও তাকে বোরকা বা নেকাব বলা পর্দার অবমাননা বৈ কিছুই নয়।

www.pathagar.com

কিন্তু কায়রোয় তাও অনুপস্থিত। যতোদূর মনে পড়ে, কায়রোর রাস্তায় নেকাব বা বোরকা পরিহিতা একজন নারীও আমাদের চোখে পড়েনি; স্কার্ট ছাড়া তাদের পরনে অন্য কোনো পোশাক ছিলো না। পুরুষদের অবস্থাও ছিলো অনুরূপ। আধুনিক শিক্ষিত এমন কোনো লোক দেখিনি, যার পরনে স্যুট ছাড়া অন্য কোনো পোশাক ছিলো, বা যার চেহারায় ছিলো কয়েক গাছি দাঁড়ি। অবশ্য আলিম সমাজের মধ্যে দেশী এবং পাশ্চাত্য উভয় ধরণের পোশাক প্রচলিত আছে। তাদের মাথায় থাকে তুর্কী টুপি এবং তার উপর থাকে মখমলের একখানা পাতলা কাপড়, যাকে এরা বলে পাগড়ি যা তারা সুন্নাত মনে করে ব্যবহার করেন। কিন্তু এদের চেহারায়ও দাঁড়ি অনুপস্থিত।

কায়রো এক বিরাট শহর, যার জনসংখ্যা বলা হয় ৩১ লক্ষ। এ শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় পাঁচ-ছয় তলার নিচে কোনো ভবন নেই। আমরা যে হোটেলে অবস্থান করি, তা ছিলো নয় তলা। আমাদের কক্ষ ছিলো অষ্টম তলায়। মূলত মুহাম্মদ আলী পাশার শাসনামল থেকে মিসরের শাসনকর্তারা মিসরকে পাশ্চাত্য শহরের অনুকরণে গড়ে তোলার চেষ্টা করে আসছেন। তাই সেখানে অধিকাংশ রাস্তার মোড়ে দেখা যায়- ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের প্রতিকৃতি। রেলওয়ে স্টেশনের সামনেই স্থাপিত হয়েছে দ্বিতীয় ফেরাউন রেমেসীসের ১০-১২ গজ লম্বা প্রতিকৃতি। স্মর্তব্য, এ দ্বিতীয় রেমেসীস হচ্ছে সেই ফিরাউন যার সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, সে বনী ইসরাইলের সন্তানদের হত্যার নির্দেশ দিতো।

মিসর সরকার এই ফিরাউনকে প্রথম এবং প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুন নাসেরকে দ্বিতীয় জাতীয় হিরো এবং বিদেশী ঔপনিবেশ থেকে মুক্তিদাতা বলে মনে করে। এদের মতে দ্বিতীয় রেমেসীসের পর জামাল আবদুন নাসের পর্যন্ত এ দীর্ঘ সময়টি ছিলো যেন বিদেশী ঔপনিবেশের যুগ। পাঠকবর্গ একটু চিন্তা করে দেখুন, এ বিপ্লব দর্শনের আঘাত কোথায় গিয়ে ঠেকে। কেবল এটুকুই নয়, বরং আপনি কায়রোর অনেক দফতর এবং নবনির্মিত প্রাসাদের দেয়ালে দেয়ালে দেখতে পাবেন ফিরাউনী চিত্রকর্ম এবং ছবি শোভিত হয়েছে। বর্তমান মিসর সরকার এ ফিরাউনী সংস্কৃতির জন্য গর্বিত। এ ফিরাউনী সংস্কৃতিকেই তারা জাতীয় সংস্কৃতি মনে করে। কেবল নিজের দেশেই নয়, বরং পাশ্চাত্য দেশেও তা প্রদর্শন করা হয়। আরব জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে মিসর সরকার নিষ্ঠাবান নয়। এ হচ্ছে নিছক রাজনৈতিক শ্লোগান, অন্যান্য আরব দেশ থেকে ফায়দা হাসিল করা এবং তাদেরকে নিজেদের নেতৃত্ব স্বীকার করবার জন্যই এ শ্লোগান আবিষ্কার করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে কখনো কখনো ইসলামকেও ব্যবহার করা হয়। এটা বিশেষ শ্রেণী ছাড়া মিসরের সাধারণ অধিবাসীরা তেমনি মুসলমান, যেমনি মুসলমান পাকিস্তান এবং অন্যান্য দেশের সাধারণ নাগরিকরা। আরব জাতীয়তাবাদের

www.pathagar.com

শ্লোগানকে এরা রাজনৈতিক শ্লোগানের চেয়ে বেশি কিছু মনে করে না। এরা মনে-প্রাণে তা সমর্থনও করে না। একদিন আমরা ট্যাক্সী যোগে কোথাও যাচ্ছিলাম এবং আরব জাতীতাবাদ সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। ট্যাক্সী ড্রাইভার আমাদের কথাবার্তা বুঝতে না পারলেও এতোটুকু বুঝতে পেরেছিল যে, আমরা আরব জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে আলোচনা করছি। আমাদের আলোচনার রেশ ধরে সে আরব জাতীয়তাবাদ নিয়ে বেশ উপহাস করে এবং বলে, 'আমরা মুসলমান, মুসলিম ছাড়া অন্য কিছু নই।' এ থেকে মিসরের সাধারণ নাগরিকদের মানসিকতা ভালভাবে বুঝা যায়। নীতিগত দিক থেকেও বিবেচনা করলে মিসরবাসীদের হয় ফিরাউনের অনুসারী হতে হবে, নয়তো ইসলামের অনুসারী। বাস্তবে হয়েছেও তাই। মিসরের একটা বিশেষ শ্রেণী ফিরাউনের অনুসারী আর সাধারণ অধিবাসীরা ইসলামের অনুসারী। লেবানন এবং মিসরের আরব খ্রিষ্টানরা হচ্ছে আরব জাতীয়তাবাদের আসল উদগাতা। উপমহাদেশের কোনো কোনো দেশে সে উদ্দেশ্যে হিন্দু-মুসলিম এক জাতিত্বের শ্লোগান দেয়া হয় বা যে উদ্দেশ্যে কাদিয়ানীরা নিজেদেরকে মুসলিম জাতিরই একটা ফির্কা বলে জাহির করার চেষ্টা করে, এদের উদ্দেশ্য ঠিক তাই।

সিনাইর উদ্দেশ্যে যাত্রা

২০ জানুয়ারি বিকেলে আমরা সিনাইয়ের উদ্দেশ্যে সুয়েজের পথে কায়রো ত্যাগ করি। কায়রো থেকে এর দূরত্ব ১২৫ মাইল। অত্যন্ত চমৎকার রাস্তা। কায়রো থেকে বের হতেই আমরা একটা শস্য-শ্যামল প্রান্তরে পৌঁছি। ছোট বেলায় ভূগোলে পড়েছিলাম, মিসর নীল নদের দান। এখানে এসে এর তাৎপর্য ভালভাবে বুঝতে পেরেছি। নীল নদ এবং এর শাখা সমূহের বদৌলতেই মিসরে যাবতীয় চাষাবাদ হয়ে থাকে। অবশিষ্ট এলাকা লিবিয়া এবং হিজাযের মতো কেবল মরু প্রান্তর। মদীনা থেকে আকাবা যেতে আমাদের যে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, পাকা রাস্তা না হলে কায়রো থেকে সুয়েজ পৌঁছতে আমাদের ঠিক তেমনি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হতো। মাত্র ২ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে আমরা ১২৫ মাইল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে সুয়েজ পৌঁছি। সুয়েজে আমরা একটা হোটেলে অবস্থান করি। মিসর থেকে জাবালে তূর বা জাবালে মূসাগামী ট্যাক্সী এখানেই পাওয়া যায়। এক ট্যাক্সী ড্রাইভারের সাথে আমরা ঠিক করি যে, সে আমাদের জাবালে তূর-তূর পাহাড়ে নিয়ে যাবে এবং সেখানে ২ দিন অবস্থানের পর আমাদের নিয়ে আসবে। এজন্য ভাড়া নেবে ৩৫ পাউন্ড। সুয়েজে আমরা জানতে পারি যে, দীর সান্ট কাটরীনে রান্না করার ব্যবস্থা আছে ঠিকই, কিন্তু এ জন্য সমস্ত উপকরণ এখান থেকেই কিনে নিতে হবে। তাই আমরা বাজার থেকে বেশি করে রুটি, ডিম এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করে নেই।

www.pathagar.com

পরদিন ২১ জানুয়ারি সকাল সাড়ে নয়টায় আমরা সুয়েজ থেকে রওয়ানা হই। সুয়েজ খালের উপর কোনো পুল নেই। খালে জাহাজ না থাকলে একটা বড় নৌকায় করে গাড়িগুলো পার করা হয়। জাহাজ অতিক্রম করার সময় কোনো গাড়ি সেখানে পৌঁছলে অপেক্ষা করতে হয়। আমরা যখন সেখানে পৌঁছি, তখন খাল দিয়ে জাহাজ যাচ্ছিলো। তাই আমাদের এখানে দীর্ঘ ৪ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে। বেলা ১টা নাগাদ আমরা সুয়েজ খাল অতিক্রম করি। এরপরই শুরু হয় মূল সিনাই সফর।

সিনাই উপত্যকায়

বর্তমানে সিনাই সামরিক এলাকা। তাই সেখানে প্রবেশ করার জন্য মাহকামাতুল হদূদ- সীমান্ত বিভাগের পূর্ব অনুমতি নেয়া অপরিহার্য। কিন্তু এখানে এসে আমরা বিস্মিত হই এই দেখে যে, এজন্য আগে অনুমতি নিতে হয় দীর সান্ট কাটরীন-এর কাছ থেকে, যার দফতর কায়রোয়। মিসর সরকার যেন জাবালে মূসা এবং অন্যান্য নিদর্শনকে কার্যত খ্রিষ্টানদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। এদের অনুমতি ছাড়া কেউ সেখানে যেতে পারেনা। পরে আমাদের এ সন্দেহ সত্যে পরিণত হতে দেখেছি। দীর সান্ট-এ পৌঁছে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, মুসলমানরা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের নিদর্শনগুলো একেবারেই হাতছাড়া করে খ্রিষ্টানদের হাতে তুলে দিয়েছে।

সুয়েজ থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে উয়ুনে (কূপ) মূসা নামে একটা স্থান আছে। মিসর ত্যাগের সময় হযরত মূসা (আ) এখানে প্রথম অবস্থান করেন। এ স্থানটি এখনও এ নামেই খ্যাত। এখানে অনেকগুলো ফোয়ারা আছে। তাই এলাকাটি অত্যন্ত উর্বর। কেউ কেউ বলেন, এখানে ১২টি ফোয়ারা আছে। অবশ্য বর্তমানে ৭টি ফোয়ারা থেকে পানি বের হয়।

উয়ুনে মূসা থেকে কিছুটা সামনে অগ্রসর হলে এক স্থানে নাম না জানা সৈন্যদের স্মৃতি ফলক রয়েছে। জানা যায় যে, ১৯৫৬ সালের যুদ্ধে ইহূদীরা এ পর্যন্ত এসে গিয়েছিল। এরপর হাম্মামে ফিরাউন নামে পরিচিত একটা স্থান রয়েছে। রাস্তা থেকে একটু দূরে সমুদ্রের নিকটে এ স্থানটি অবস্থিত। এরপর রয়েছে ওয়াদীয়ে গারবাদাল, তাওরাতে যার নাম বলা হয়েছে হীম। এ উপত্যকায়ও অনেক ফোয়ারা রয়েছে। এরপর পড়ে আবূ যানীমা বন্দর, সুয়েজ থেকে এর দূরত্ব ১৪৬ কিলোমিটার। রাস্তায় স্থানে স্থানে আমরা পেট্রোল খনি দেখতে পাই। আবূ যানীমার কাছে পেট্রোল কোম্পানীর দফতরও রয়েছে। আবূ যানীমার অদূরেই রয়েছে ম্যাঙ্গানিজের খনি। এখানে একটা কারখানাও রয়েছে। প্রাচীনকালে মিসরের শাসকরা, যাদেরকে বলা হতো ফিরাউন, এখান থেকে ফীরোজা নামে

www.pathagar.com

এক প্রকার মূল্যবান পাথর উত্তোলন করতো। এখনও এখানে ফীরোজা পাওয়া যায়। প্রায় তিন হাজার বছরের প্রাচীন ফীরোজাও পাওয়া যায় এখানে।

আবূ যানীমা থেকে কয়েক মাইল পর্যন্ত রাস্তাটা চলে গেছে সমুদ্রের গা ঘেঁষে। বাম দিকে চোখে পড়ে কখনো সমতল ভূমি, আবার কখনো পাহাড়। পথে কোথাও উন্নত পাকা সড়ক, আবার কোথাও একেবারে কাঁচা রাস্তা। জানা যায়, আগে এখানে পাকা রাস্তা ছিলো। স্থানে স্থানে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে কাঁচা সড়কে পরিণত হয়েছে।

ফারানের খেজুর বাগান

আবূ যানীমা থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার সামনে গেলে সিনাই তূর এর পথ পৃথক হয়ে যায়। দীর সান্ট কাটরীন-এর জন্য এখান থেকে ফারান উপত্যকার পথ ধরতে হয়। এখানে রাস্তার কোনো চিহ্নও নেই। কেবল গাড়ির চিহ্ন খুঁজে আন্দাজ অনুমান করে পথ চলতে হয়। দু'রাস্তার মিলন স্থান থেকে ৫২ কিলোমিটার পথ চলার পর আমরা ফারানের সবুজ খেজুর বাগানে পৌঁছি। এখানে পর্যাপ্ত পানি রয়েছে। তাই সৃষ্টি হয়েছে অনেক বাগান। খেজুর, আঙ্গুর, আঞ্জীর এবং যয়তুন বৃক্ষ দেখতে পাওয়া যায় এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে। এখানকার খেজুর বাগান দীর্ঘ তিন মাইল এলাকা জুড়ে রয়েছে। তাওরাতে এর নাম দেয়া হয়েছে রেফিদিম। এখানে খ্রিস্টানদের একটা গির্জা রয়েছে, যার সম্পর্ক রয়েছে সেন্ট কাটরীন গির্জার সাথে। যারা সেন্ট কাটরীন গির্জায় যায়, এখানে তাদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়। এখানে স্থায়ীভাবে একজন পাদ্রী থাকেন। আমরা প্রায় পৌনে সাতটায় এখানে পৌঁছি। এখানে পাদ্রীর সাথে আমাদের কথা হয়, তিনি গ্রীসের চীউস দ্বীপের অধিবাসী। কিন্তু তার জন্ম মিসরে। তাই আরবী বলেন। ইংরেজিও জানেন। তিনি কফী দিয়ে আমাদের আপ্যায়ন করেন।

সেন্ট ক্যাট্রীন গির্জা

ফারানের খেজুর বাগান থেকে সেন্ট ক্যাট্রীন গির্জার দূরত্ব ৬৭ কিলোমিটার। রাত পৌনে নটায় আমরা পৌঁছি। এটা একটা বিরাট খানকা। এর যে অংশে ব্রাইটিং বুশ– হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যেখানে ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে আগুন দেখতে পেয়েছিলেন– তা স্মৃতি হিসেবে সংরক্ষিত রয়েছে। কন্সট্যানটাইনের শাসনামলে এটি নির্মিত হয়েছে। বর্তমানে জুতা না খুলে কেউ এখানে প্রবেশ করতে পারে না। অবশ্য অন্য খানকাগুলো নির্মাণ করেছে জেস্টিনিয়াম। এর চারি পাশে রয়েছে পাথরের নির্মিত উঁচু পাঁচীল। বর্তমান গির্জাটি প্রাচীন ভিত্তির উপর নির্মিত হলেও সময় সময় এতে অনেক সংস্কার সংশোধন করা হয়েছে। গির্জার নিজস্ব পাওয়ার হাউস রয়েছে, যেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়। গীর্জার কক্ষ এবং বারান্দা অতি চমৎকার। পর্যটকদের অবস্থানের জন্য এখানে চমৎকার ব্যবস্থা আছে। তাদের

www.pathagar.com

রান্না-বান্না করে দেয়ার জন্য কর্মচারি রয়েছে। বাবুর্চিখানা, ডাইনিং হল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সব কিছুর ব্যবস্থা রয়েছে। অবশ্য খাদ্যদ্রব্য যেহেতু এখানে কমই পাওয়া যায়, তাই পর্যটকদের এসব সঙ্গে করে নিয়ে আসতে হয়। স্থানীয় কর্মচারিরা তা পাক করে দেয়। এখানে একজন জনসংযোগ অফিসারও আছেন পর্যটকদের অভ্যর্থনা জানান এবং দর্শনীয় স্থান দেখার কাজে সবরকম সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য। রাতে আমরা এখানে নিজেরা খানা পাকিয়ে খাই এবং ঘুমিয়ে পড়ি।

শাইনিং বুশ

পরদিন ১২ জানুয়ারি সকালে গির্জার গণসংযোগ অফিসার আমাদের গির্জা ঘুরে দেখান। বাইজেনটাইন শাসনামলের ছবি এখনও এমন অবস্থায় আছে, যা দেখে এটি অতি সাম্প্রতিককালের বলে দর্শকের ভ্রম হবে। আসবাবপত্র এবং দরজার কোনো কোনো অংশ জ্যাস্টিনাম-এর যুগ থেকে এখনও একই অবস্থায় বর্তমান রয়েছে। গির্জার পেছনেই রয়েছে শাইনিং বুশ– যেখানে হযরত মূসা (আ) আগুন লক্ষ্য করেছিলেন। কুসতিন তীন এখানে একটা স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ করে। বিশেষ যে স্থানটিতে হযরত মূসা আগুন লক্ষ্য করেন, সেখানে একটা ছোট গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে স্থানটি নির্দিষ্ট করার জন্যে। আমাদের বলা হয় যে, এ স্থানটির পেছনে কয়েক ফুট দূরে আঙ্গিনায় রয়েছে যে বৃক্ষটি, সেখান থেকে আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মূসা (আ)-এর সাথে কথা বলেছিলেন। এ বৃক্ষ সম্পর্কে পাদ্রী নেকো ফোরাস আমাদের জানান, যুগ যুগ ধরে বৃক্ষটি মূল থেকে বার বার পয়দা হয়, পুরাতন হয়ে মরে যায়, আবার সে মূল তাজা হয়ে কাণ্ড ও শাখা বের হয়। সুলতান সলীম এখানে গির্জার কাছে একটা মসজিদ নির্মাণ করেন, বর্তমানে যা গির্জা কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। এলাকাটি একটা মুসলিম সরকারের অধীনে হলেও এখানে মসজিদের জন্য কোনো ইমাম-মুয়ায্যিনের ব্যবস্থা নেই, নেই এখানে নামায-জামায়াতের কোনো ব্যবস্থা। অথচ গির্জার অনেক কর্মীরাই মুসলমান। গির্জার অভ্যন্তরে পাদ্রীদের জন্য নির্মিত একটা প্রাচীন ডাইনিং হল রয়েছে। এখানে একটা টেবিল আছে জাষ্টিনিয়ানের সময়ের। আর একটা ক্রুশভারদের সময়ের। ক্রুশেভারদের সময়ে শাসকরা তাদের যেসব চিত্র নির্মাণ করেছিল, এ ডাইনিং হলে এখনও তা অবিকল বর্তমান রয়েছে। তার একটু রংও পরিবর্তন হয়নি।

লাইব্রেরি ও মিউজিয়াম

এ গির্জাটি একটি গ্রীক অর্থডক্স উপদলের হাতে। এর অভ্যন্তরে রয়েছে একটা বিশাল লাইব্রেরি এবং একটা ছোট মিউজিয়াম। এ মিউজিয়ামে রয়েছে

www.pathagar.com

জাস্টিনিয়ান-এর যুগ থেকে নিয়ে বর্তমান কাল পর্যন্ত সকল আর্কবিশপের মুকুট, যষ্ঠি, তাদের ক্রুশ এবং অন্যান্য জিনিস। এ ছাড়াও সেখানে বাইজেনটাইন যুগের অনেক ছবিও আছে। এগুলোর রং এবং আদলেও কোনো পরিবর্তন হয়নি। লাইব্রেরিতে রয়েছে প্রাচীন এবং আধুনিক গ্রন্থের বিপুল সমাবেশ। গ্রীক, হিব্রু, সুরিয়ানী, কিবতী, হাবশী, ফার্সী এবং রুশ ভাষার অনেক পাণ্ডুলিপি এতে আছে, যা অন্য কোথাও নেই। এখানে তাওরাতের চতুর্থ শতাব্দীর একটা কপিও ছিলো, কিন্তু জনৈক রুশ প্রফেসর তা নিয়ে যায় এবং রুশ জার-এর নিকট বিক্রয় করে দেয়। রুশ জার মূল কপি নিজের কাছে রেখে ফটোকপি ফেরৎ পাঠায় লাইব্রেরিতে।

নর কংকাল ও মাথার খুলী

গির্জার নিকটে একটা ছোট বাগান আছে। এ বাগানের মধ্যেই রয়েছে এর নিজস্ব কবরস্তান। আমরা দেখে বিস্মিত হই, এখানে অনেক নরকংকাল এবং মাথার খুলি সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। পাদ্রী নিকো ফোরাস জানান, ষষ্ঠ শতাব্দীতে এ গির্জাটি প্রতিষ্ঠার সময় থেকে এগুলো সংরক্ষণ করে আসা হচ্ছে। আজ পর্যন্ত এখানে যতো আর্কবিশপ এবং পাদ্রী মারা গেছে এগুলো তাদেরই মাথার খুলী আর হাঁড়-গোড়। অবশ্য আর্ক বিশপদের হাঁড়-গোড় আর মাথার খুলী আলাদা করে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এগুলো কেন রাখা হয়েছে জিজ্ঞেস করা হলে পাদ্রী নিকো ফোরাস জানায়, আমাদের কাছে মৃতদেহ দাফন করার কোনো স্থান ছিলো না। একটা ক্ষুদ্র স্থান দেখিয়ে তিনি বলেন, এখানে বড়জোর চারটা মৃত দেহ দাফন করা যায়। পাদ্রী নিকো ফোরাস আরও জানান, কোনো আর্ক বিশপ বা পাদ্রী মারা গেলে তাকে এখানেই দাফন করা হতো এবং সাত বছর পর তার হাঁড়-গোড় এবং খুলী তুলে নিয়ে লাইব্রেরিতে রাখা হতো।

জাবালে মূসায়

গির্জাটি দেখা শেষ করে তিনটি উট নিয়ে আমরা সাড়ে নটার দিকে রওয়ানা হই জাবালে মূসার উদ্দেশ্যে। চার ভাগের তিনভাগ চড়াই অতিক্রম করি এসব উঠের পিঠে আরোহণ করে। উটের পিঠে যাওয়ার রাস্তা আর একটু প্রশস্ত করলে অনায়াসে গাড়ি নিয়ে যাওয়া যায়।

এরপর পায়ে হেঁটে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে হয়। উপরে উঠতে গিয়ে রীতিমতো হাঁপিয়ে উঠতে হয়। কোথাও কোথাও সিঁড়ির পরিবর্তে পাথর রাখা হয়েছে। এগুলো সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা হলে এতো কষ্ট হতো না। কোথাও কোথাও তিন ফুট পর্যন্ত বরফ জমে আছে। আবার কোথাও বরফ গলে পড়ছিল। স্থানে স্থানে বিশ্রাম নিয়ে বেলা ১২টা নাগাদ আমরা পাহাড়ের শীর্ষদেশে আরোহণ করি। এখানে একটা ক্ষুদ্র মাঠের মতো আছে। একটা গীর্জা আর একটা মসজিদও

www.pathagar.com

নির্মাণ করা হয়েছে এখানে। পাথরের নির্মিত বেশ সুন্দর পরিপাটি। মর্মর পাথরের নির্মিত মেঝে বেশ তকতকে ঝকঝকে। দেখেই মনে হয়, নিয়মিত ঝাড়ামোছা করা হয়, সাপ্তাহিক উপাসনাও হয় নিয়মিত। কিন্তু দেখে আমাদের লজ্জা হয় যে গির্জার পাশেই মসজিদ নামে যে কক্ষটি রয়েছে, তার অবস্থা অতি করুণ। এর ভেতরে কোনো ফরাশ নেই। দরজাও ভাঙ্গা। দেখে মনে হয় দু'এক বছরের মধ্যে কেউ এর দেখাশুনা করেনি। এদিন ছিলো শুক্রবার। আমরা নিকটের একটা ঝর্ণা থেকে পানি নিয়ে অযু করি। জোহরের নামায আদায় করি। প্রায় এক ঘণ্টা অবস্থান করে একটার দিকে আমরা সেখান থেকে নামতে শুরু করি। কিছু দূর সিঁড়ি দিয়ে নেমে পরে অন্য পথ ধরি। প্রায় পাঁচশো ফুট নিচে নামার পর আমরা সেই স্থানে পৌঁছি, হযরত ইল্‌য়াস আলাইহিস সালাম সামেরীদের থেকে পলায়ন করে যেখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এ পর্যন্ত নামার পথ তেমন একটা কষ্টকর ছিলো না। কিন্তু এর পরের পথটা ছিলো বেশ কষ্টকর। নামমাত্র সিঁড়ি ছিলো বটে, কিন্তু একে সিঁড়ি বলা চলে না, স্থানে স্থানে কেবল পাথর সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। প্রায় তিনটার দিকে আমরা নিচে নামতে সক্ষম হই। জানা যায়, এখানে সিঁড়ির সংখ্যা ৩ হাজার চারশ'।

সামেরীর গোবাছুর

২৩ জানুয়ারি ভোরে আমরা কায়রোর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। রাস্তায় দীর থেকে একমাইল দূরে একটা ছোট পাহাড়ের টিলায় হযরত হারূন আলাইহিস সালামের অবস্থান পড়ে। যে উপত্যকা থেকে বাছুর বানিয়ে এসেছিল সামেরী, এ পাহাড়ী টিলাটা সেখানে অবস্থিত। বনী ইসরাইল এ বাছুরটির পূজা শুরু করে। হযরত মূসা (আ) তূর পাহাড় থেকে ফিরে এসে সেখানে হযরত হারূন (আ)-কে পাকড়াও করেছিলেন। সম্ভবত এটি সে স্থান। দীর থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে একটি উপত্যকায় হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের কবর রয়েছে। গ্রামবাসীরা এখানে প্রতি বছর বিরাট সমাবেশ করে। তারা এখানে কোরবানীও করে। হারূন (আ)-এর কবরেও এ ধরনের সমাবেশ হয়। স্থানীয় কিংবদন্তি অনুযায়ী কাওমে সামূদের উপর আযাব নাযিল হলে তিনি হিজরত করে এখানে চলে আসেন।

পুনরায় কায়রোয়

বিকেল সাড়ে ছটায় আমরা কায়রোয় ফিরে আসি। ২৪ জানুয়ারি থেকে আবার শুরু হয় সাক্ষাতের পালা, তা চলে ২৫ জানুয়ারি বিকাল পর্যন্ত। এখানে অবসর সময়টি আমরা ব্যয় করতাম কিতাব ক্রয়ে। ২৪ জানুয়ারি দুপুর মাওলানার নিকট আল-আযহারের রেক্টর খবর পাঠান, আমার সাথে দেখা না করে কায়রো ত্যাগ

www.pathagar.com

করবেন না। তাই তাঁর সাথে দেখা করার জন্য রাতে আমরা তাঁর বাসায় যাই। অত্যন্ত ভালোবাসা এবং আন্তরিকতার সাথে তিনি মাওলানার জন্য দোয়া করছিলেন এবং ইসলামের জন্য তাঁর খিদমতের কথা স্মরণ করছিলেন। মাওলানার সাথে মিলিত হওয়ার জন্য বারবার গর্ব ও আনন্দ প্রকাশ করছিলেন। তাঁর কথাবার্তা এতোটা আবেগে ভরা ছিলো যে, মনে হচ্ছিল, তিনি যেন প্রাণ খুলে কথা বলছিলেন। তিনি বলছিলেন, মাওলানার তকলীফ না হলে আমি সারারাত আপনার সাথে বসে কথা বলতাম। অন্য মেহমানদেরকে তো চা পান করায় তাঁর সাগরিদগণ, কিন্তু অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি নিজে মাওলানাকে চা পান করান।

কায়রো থেকে ফিরে আসার সময় শেখ আবূ যোহরা, মুস্তফা মাহমূদ শাকের এবং অন্যান্য লেখকগণ মাওলানাকে তাঁদের প্রকাশিত এক সেট করে বই উপহার দেন। মুহাম্মদ কুতুব তাঁর লেখা গ্রন্থ ছাড়া সাইয়্যেদ কুতুবের এক সেট গ্রন্থও উপহার দেন। শেখ হাসানুল বান্না শহীদের পুত্র সাইফুল ইসলামও তাঁর পিতার কিতাব এক সেট গ্রন্থ উপহার দেন।

আবার দামেস্ক

২৫ জানুয়ারি রাত সাড়ে আটটায় বিমান যোগে রওয়ানা হয়ে সাড়ে ১০ টায় দামেস্ক পৌঁছি। ওস্তাদ মুহাম্মদ মোবারক, ওস্তাদ মুহাম্মদ মুনতাসির আল-কাত্তানী এবং অন্যান্য বন্ধুরা বিমান বন্দরে উপস্থিত ছিলেন।

এবার দামেস্কে আমরা ছিলাম মাত্র দু'দিন। এ সময় দেখা-সাক্ষাত এবং দাওয়াতের কাজ চলে। ২৬ জানুয়ারি দুপুরে সাইয়্যেদ আব্দুল হামীদ আল খতীব এবং ২৭ জানুয়ারি দুপুরে ওস্তাদ আদদান সালেম- দামেস্কে মাওলানার আরবি গ্রন্থ প্রকাশক- মাওলানার সম্মানে ভোজ সভার আয়োজন করেন। এ সময় আমরা কিছু প্রয়োজনীয় কিতাবও ক্রয় করি। দেখা-সাক্ষাত, কিতাবপত্র ক্রয় এবং জিনিস-পত্র গুছানোর কাজে আমাদের এতই ব্যস্ত থাকতে হয় যে, জামে উমবী এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক নিদর্শনাদি দেখার কোনো সুযোগই হয়নি। অবশ্য ১৯৫৬ সালের সফরকালে আমরা এসব নিদর্শন দেখেছিলাম ভালোভাবেই। ২৮ জানুয়ারি সকাল পৌনে সাতটায় আমরা দামেস্ক থেকে বিমান যোগে কুয়েত রওয়ানা হই। দামেস্ক বিমান বন্দরে বন্ধুরা আমাদের বিদায় জানায়। #

www.pathagar.com

১৫

কুয়েত

২৮ জানুয়ারি থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬০

পারস্য উপ-সাগরের পশ্চিম তীরে ইরাক এবং সৌদী আরবের মধ্যস্থলে একটা ক্ষুদ্র আরব রাষ্ট্র কুয়েত। এর ইতিহাস খুব পুরাতন নয়। হিজরী ১১১০ সালের দিকে এ রাষ্ট্রের পত্তন হয় এবং তখন থেকে আলে সাবাহ-এর বংশ এ রাষ্ট্রটি শাসন করে আসছেন। বাহ্‌রাইনের শাসক পরিবার আলে খলীফার ন্যায় এরাও কাতার থেকে এখানে এসে বসতি স্থাপন করেন। তাই কাতারের আলেসানী এবং বাহরাইনের আলে খলীফার সাথে এদের সম্পর্ক গভীর এবং নিকটতম। নাজ্‌দ ও হিজাযের শাসক পরিবার আলে সউদ তো নিজেদের আলে সাবাহ এর নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ মনে করেন। কারণ, হায়েল এর আলে রাশীদ পরিবার যখন আলে সউদকে রিয়াদ থেকে বেদখল করে দেন তখন এরা কুয়েত এসে আশ্রয় নেন এবং বেশ কিছুকাল আলে সাবাহ্‌র মেহমান ছিলেন। বর্তমান বাদশাহ সউদের পিতা আবদুল আযীয ইবনে আবদুর রহমান ১৯০২ সালে গুটি কতেক সাথী নিয়ে রিয়াদ পুন দখল করা পর্যন্ত কুয়েতের আশ্রয়েই ছিলেন। বাদশাহ সউদের জন্মও হয়েছে কুয়েতে সেই রাতে, যে রাতে তাঁর পিতা রিয়াদ অধিকার করেন। এ কারণে আলে-সউদের লোকেরা আলে সাবাহ-এর এ অনুগ্রহ স্মরণ করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত আলে সাবাহ ছিলো উসমানীয় সাম্রাজ্যের ওফাদার ও অনুগত। এ সময় উসমানীয় সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে বসরার গভর্নরই কুয়েত দেখাশুনা করতেন। কিন্তু পরে ইরাক এবং অন্যান্য আরব দেশ উসমানীয় সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে গেলে কুয়েতও বসরার তত্ত্বাবধান মুক্ত হয়। পরে ইংরেজরা যখন হিন্দুস্তান এবং ইরাকের মধ্যস্থলের পথটি নিরাপদ করে নেয়, তখন তারা কুয়েতের তত্ত্বাবধানের ভারও গ্রহণ করে। তখন কুয়েতের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কোনো গুরুত্ব ছিলো না। কুয়েত ছিলো তখন একটা ক্ষুদ্র জনপদ। পারস্য উপ-সাগর থেকে মৎস্য বা মুক্তা আহরণ করেই তখন কুয়েতের জনগণ সাধারণত জীবিকা নির্বাহ করতো। কিন্তু ১৮/১৯ বছর আগে পেট্রোল আবিষ্কারের পর এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ইংরেজ এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য জাতির দৃষ্টিতে এদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় সকল আরব দেশের চেয়ে বেশি। কারণ, কুয়েতে রয়েছে

www.pathagar.com

পেট্রোলের বিরাট খনি। কার্যত ছ'টি ইংরেজ এবং মার্কিন কোম্পানী এখান থেকে এতো পেট্রোল উত্তোলন করছে যা সৌদী আরব, ইরাক, ইরান- এদের সকলের চেয়ে বেশি। এটি সারা বিশ্ব বিশেষ করে আরব দেশগুলোর চোখ খুলে দিয়েছে, তাদেরকে করেছে বিস্মিত। এখন যে কোনো আরবদেশ কুয়েতকে সোনার পাখি মনে করে লোলুপ দৃষ্টি ফেলছে সেদিকে। আর কিছু না করতে পারলে অন্তত ঋণের জন্য ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে অগ্রসর হয় কুয়েতের দিকে। ইরাকতো কুয়েতকে তার দেশের অংশ বলেই দাবি করছে। কাতার এবং বাহরাইনকে তো কুয়েত এতোটা সাহায্য করছে যেমনটি করে থাকে ধনাঢ্য ও দানশীল বড় ভাই ছোট ভাইকে। কয়েক বছর পূর্ব পর্যন্তও কুয়েত ছিলো বাহরাইনের মতোই ইংরেজদের অধীন। এখনতো এরা সবদিক থেকে স্বায়ত্বশাসন অর্জন করে নিয়েছে। এখন তাদের নিজেদের মুদ্রা এবং ডাক টিকিট চালু হয়েছে। আরব লীগের সদস্য ছাড়াও কুয়েত এখন জাতিসংঘেরও সদস্য। অবশ্য প্রয়োজন দেখা দিলে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসা এখনও কর্তব্য মনে করে ইংরেজরা।

কুয়েতের যেসব বন্ধুরা মাওলানাকে বারবার কুয়েত আসার দাওয়াত দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে হাজী আব্দুর রায্যাক সালেহ এবং ওস্তাদ আব্দুল্লাহ আলীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরা স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং গোটা কুয়েতে এদের প্রভাব-প্রতিপত্তি রয়েছে। কয়েক বছর আগেও এখানে 'জমিয়াতুল ইরশাদ' নামে একটা সংস্কার সংস্থা ছিলো। হাজী আবদুর রায্যাক সালেহ ছিলেন এর সভাপতি। বর্তমানে রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সংগঠনটি নেই বটে, কিন্তু এদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলো চালু আছে এবং সংস্কার কাজও চলছে।

আমরা সকাল সাড়ে সাতটায় দামেস্ক থেকে রওয়ানা হয়ে সাড়ে ১০টায় কুয়েত পৌঁছি। কুয়েতের নিজস্ব বিমানটি বেশ চমৎকার এবং আরামদায়ক। ওস্তাদ আবদুল্লাহ আলী, হাজী গোলাম মাসুম, আছাদ আশরাফ সহ অনেক পাকিস্তানি বন্ধু বিমান বন্দরে উপস্থিত ছিলেন অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য। এ সময় বাইতুল মাকদাসে মুতামারে আলমে ইসলামীর অধিবেশন চলছিল। এতে যোগদানের জন্য হাজী আবদুর রায্যাক সালেহ বাইতুল মাকদাসে গিয়েছিলেন। পরদিন তিনি ফিরে আসেন।

এসব বন্ধুরা রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে আমাদের অবস্থানের ব্যবস্থা করেন। অন্যত্র অবস্থান করলে সরকারি বা বেসরকারি ব্যক্তিদের সাক্ষাতের জন্য আসতে অসুবিধা হবে মনে করে হয়তো এখানে আমাদের অবস্থানের ব্যবস্থা করেছেন তাঁরা।

কুয়েতে কোনো ইসলামী বা ঐতিহাসিক নিদর্শন নেই। সেকারণে আমাদের এখানে আসার বা অবস্থান করারও দরকার ছিলনা। অবশ্য বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধে আমরা এখানে ৮ দিন অবস্থান করি। এ সময় আমরা প্রয়োজনীয়

www.pathagar.com

কেনা-কাটা করি, ইসলামপ্রিয় ব্যবসায়ী এবং ইখওয়ানী বন্ধুদের সাথে দেখা করি।

২৯ জানুয়ারি দুপুরে ওস্তাদ আবদুল্লাহ আলীর বাসায় আমাদের দাওয়াত ছিলো। এতে প্রায় ৪০ জন ইখওয়ানী বন্ধুও উপস্থিত ছিলেন। খাওয়া শেষে এরা ইসলামী আন্দোলনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে মাওলানাকে প্রশ্ন করেন এবং তিনি তাদের প্রশ্নের জবাব দেন।

আসরের নামাযের পর আমরা শেখ ইউছুফ আল-কানায়ীর সাথে দেখা করতে যাই। মরহুম মাওলানা মাসউদ আলম নদবীও 'আরব দেশে কয়েক মাস' গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, ইনি কুয়েতের একমাত্র মুহাক্কিক আলিম। ইনি ওস্তাদ আবদুল্লাহ আলীর চাচা। বার্ধক্য এবং রোগ-ব্যাধিতে বর্তমানে প্রায় অক্ষম।

পরদিন ৩০ জানুয়ারি দুপুরে আমাদের দাওয়াত ছিলো আব্দুল্লাহ আকীলের বাসায়। এখানেও বিপুল সংখ্যক যুবক উপস্থিত ছিলো এবং ছিলো প্রশ্ন-উত্তরের পালা। মাওলানা তাদের প্রশ্নের জবাব দেন। আবদুল্লাহ আকীল মূলত ইরাকের যুবাইর-এর অধিবাসী। ইখওয়ানের সাথে সম্পর্কের কারণে আবদুল করীম কাসেম ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তাকে ইরাক ছাড়তে হয়। তিনি আযহাবের শিক্ষা এবং শেখ হাসানুল বান্নার দীক্ষাপ্রাপ্ত। মাওলানা মাসউদ আলম নদবী মরহুম 'আরব দেশে কয়েক মাস' গ্রন্থে বসরায় তাঁর সাথে আলাপের কথা উল্লেখ করেছেন বারবার। বর্তমানে কুয়েতের শরীয়া আদালতে কাজ করছেন। ৩১ জানুয়ারি কুয়েতের কাযী আমাদেরকে তাঁর বাসায় দাওয়াত করেন। এখানেও ছিলো প্রশ্নোত্তর পর্ব।

আমাদের জিনিসপত্র যেহেতু অনেক হয়ে গেছে। তাই সিদ্ধান্ত হয় যে, আমি এসব জিনিসপত্র নিয়ে সমুদ্র জাহাজে সফর করবো, আর মাওলানা এবং চৌধুরী সাহেব বিমান যোগে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমি ১ ফেব্রুয়ারি জাহাজ যোগে রওয়ানা হয়ে ৮ ফেব্রুয়ারি করাচি এবং ৯ ফেব্রুয়ারি লাহোর পৌঁছি। মাওলানা এবং চৌধুরী সাহেব ৪ ফেব্রুয়ারি রাতে বিমান যোগে রওয়ানা হয়ে ৫ ফেব্রুয়ারি ভোরে করাচি পৌঁছেন। মাওলানা পরদিন ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোর পৌঁছেন।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যার অনুগ্রহে সম্পন্ন হয় ভালো কাজ।

– সমাপ্ত –

www.pathagar.com

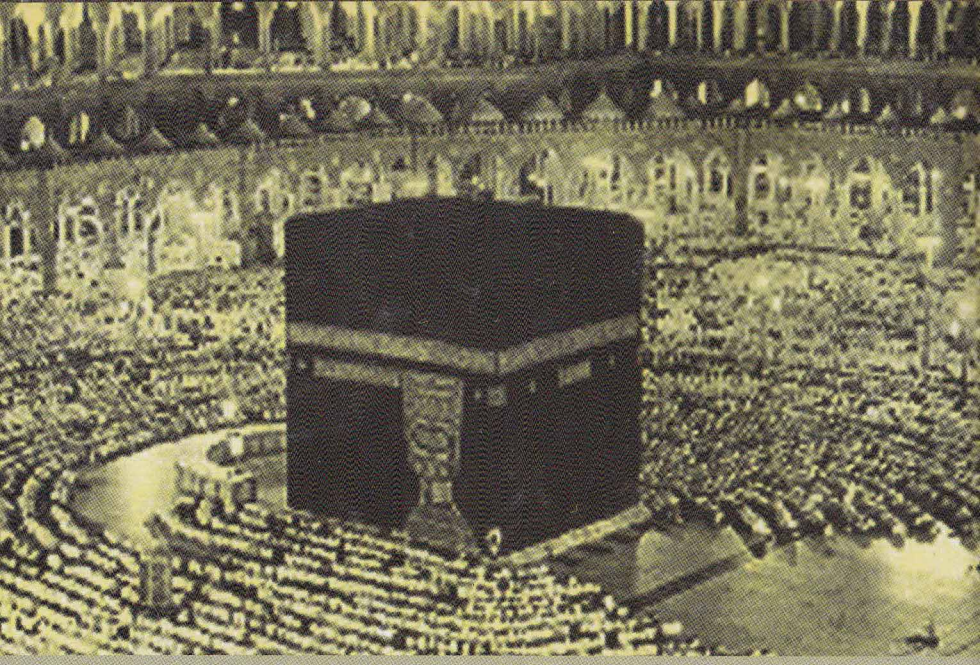

শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট
মগবাজার,ঢাকা-১২১৭, ফোনঃ ৮৩১১২৯২